গৌতম-অশোক দুজনেই এখন জমি ফিরে পাওয়ার লড়াইতে

মোর্চা ভাঙলেও হরকা হড়কে পড়বেন না তো!

ডুয়ার্স হয়ে বিহারে অস্ত্র গোয়েন্দাদের টনক নাড়াল

বাঘ সংরক্ষণের অজুহাতে বক্সায় উপেক্ষিত ইকো পর্যটন

এখন ডুয়ার্স

অক্টোবর ২০১৫। ২০ টাকা

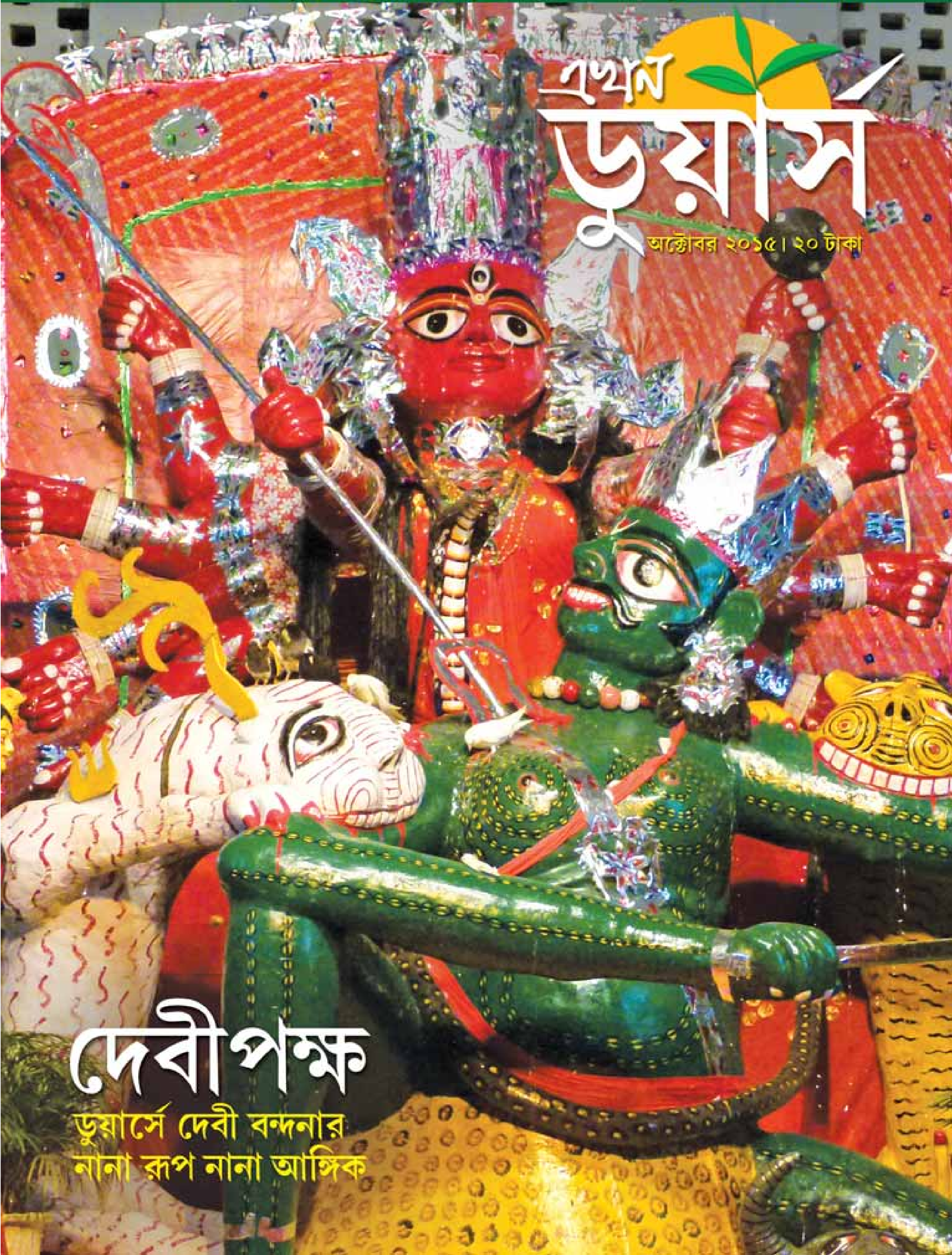

দেবীপক্ষ

ডুয়ার্সে দেবী বন্দনার নানা রূপ নানা আঙ্গিক

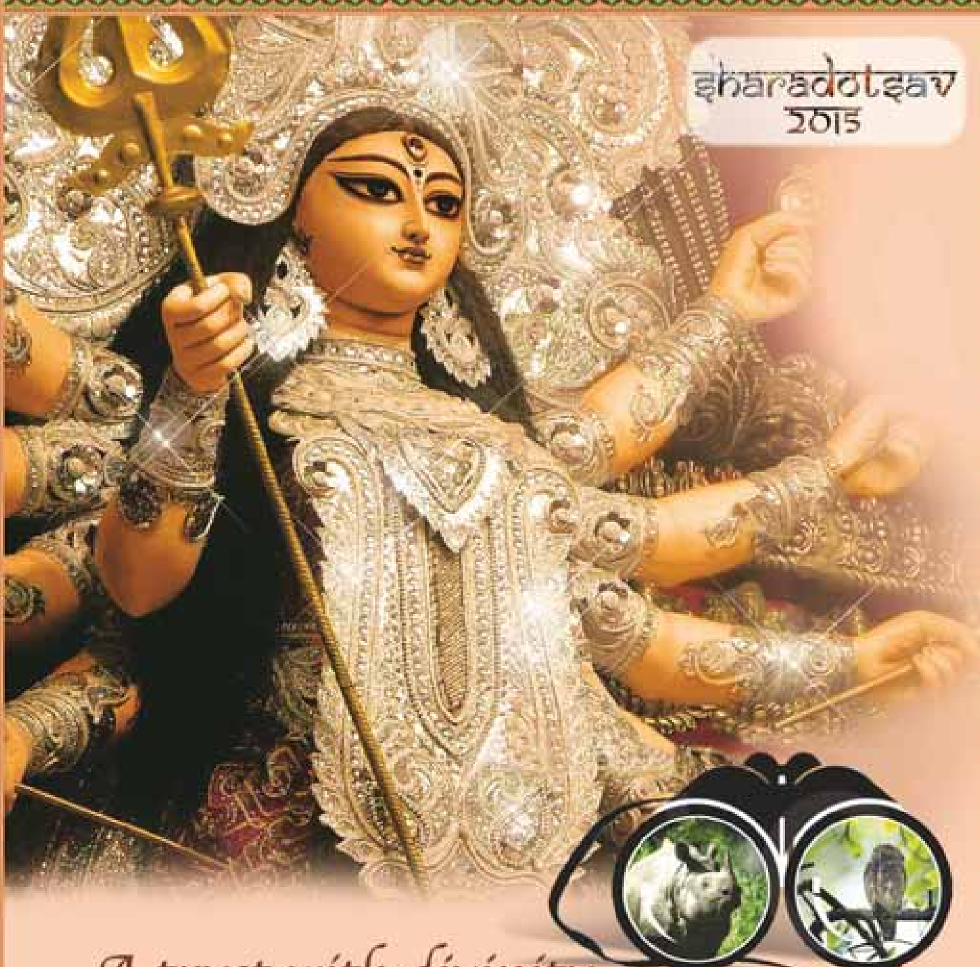

A tryst with divinity with the touch of nature

North Bengal Puja Package I
22 October 2015 | 08:00 a.m. to 07:00 p.m.
Teesta Paryatak Abas - visit important pujas of Jalpaiguri - Jaldapara Tourist Lodge - drive through Chilapata Forest - Cooch Behar Rajbari Puja - Jalpaiguri
Includes packed Breakfast & Lunch

North Bengal Puja Package II
20 October 2015 | 08:00 a.m. to 07:00 p.m.
Teesta Paryatak Abas - visit important pujas of Jalpaiguri & Malbazar - visit Medhla Watch Tower - Jalpaiguri
Includes packed Breakfast & Lunch

North Bengal Puja Package III
20 & 22 October 2015 | 08:00 a.m. to 07:00 p.m.
Mainak Tourist Lodge, Siliguri - visit important Pujas of Siliguri & Malbazar - visit Medhla Watch Tower - Siliguri
Includes packed Breakfast & Lunch

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA

West Bengal Tourism Development Corporation Ltd.
DEPARTMENT OF TOURISM, GOVT OF WEST BENGAL
Tourism Centre, Kolkata, Tel: (033) 2248 8271/ 2243 6440
Email: tourismcentrekolkata@gmail.com
Tourism Centre, Siliguri, Tel: (0353) 2511974/79, 9733008785
Email: tc_slg@yahoo.com
Online booking: www.wbtdc.gov.in, www.wbtourism.gov.in
facebook.com\tourismwb twitter.com\TourismBengal

আগামী প্রজন্মের স্বার্থেই প্রয়োজন বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ

বিশাল ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ রাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গ। এর উত্তরাঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র, জলবায়ুর তারতম্য ও মাটির বিভিন্নতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ যার মাঝে ছড়িয়ে আছে বর্ণময় বৃক্ষলতা, গুল্ম আর বন্যপ্রাণী। এই অরণ্যময় পরিবেশকে জীবন্ত করেছে বিরল প্রজাতির লালপান্ডা, বৃহৎ কাঠবিড়াল, অসংখ্য পাখি ও বিচিত্র সরীসৃপ। তৃণভূমির জঙ্গলকে আরও সমৃদ্ধ করেছে একশৃঙ্গী গন্ডার, গাউর (বাইসন) বৃহত্তম স্থলচর প্রাণী হস্তী, নানা জাতের হরিণ, চিতাবাঘসহ নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণীকূল। এ সবেরই সমাহার ঘটেছে বন্যপ্রাণ বিভাগ, উত্তর মন্ডলের অন্তর্গত গরুমারা, ন্যাওড়াভ্যালি, সিংহলীলা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান এবং চাপড়ামাড়ি, মহানন্দা ও সিনচল অভয়ারণ্যে। পাশাপাশি লাটাগুড়িসহ কয়েকটি প্রকৃতিবীক্ষণকেন্দ্র, দার্জিলিঙের মিউজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃতির নানা অবদান সম্পর্কে মানুষের অদম্য জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানকে পরিশীলিত করছে।

মানুষের অন্তহীন চাহিদা, অর্থলিপ্সা এবং ক্রমবর্ধমান চাপে আজ বনকূল ধ্বংসের সম্মুখীন— তার প্রভাব প্রাকৃতিক নিয়মেই বন্যপ্রাণী ও পক্ষীকূলের উপর নেমে এসেছে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশ, কৃষিক্ষেত্রের বিস্তার, শিল্প সম্প্রসারণ ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজ সংকুচিত হয়ে চলেছে বনাঞ্চল। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও মানবজাতির স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আমাদের সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার প্রয়োজনে। আসুন সবাই মিলে শপথ নিই আগামী প্রজন্মের স্বার্থেই প্রকৃতির এই অফুরন্ত সম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার।

বনপাল
বন্যপ্রাণ উত্তর মন্ডল
জলপাইগুড়ি

জনস্বার্থে প্রচারিত

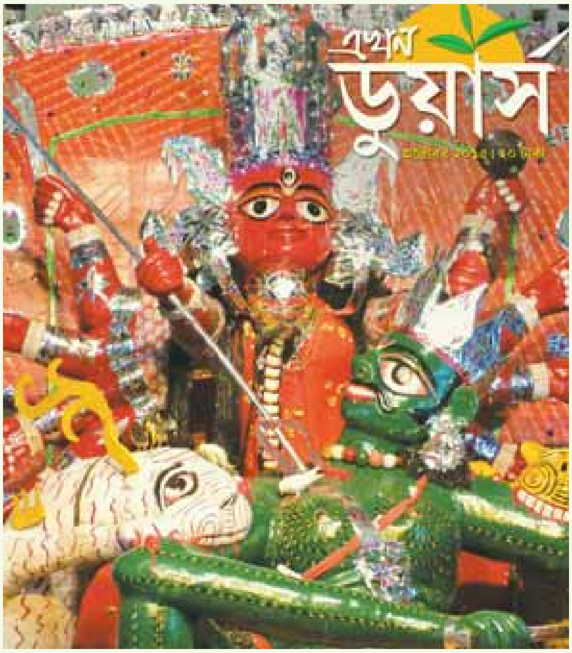

ভুটান পাহাড় মেঘ সাজাল উত্তুরে সব চূড়ায়
নীল-সাদাতে নকশিকাঁথা, বর্ষা এবার ফুরায়
বৃষ্টি দিল সবুজ পাতা এক্কেবারে ধুয়ে
বাজল আলোর বেণু এবার ডুয়ার্সটাকে ছুঁয়ে!

বনের দিকে সাফারি-কার, উছলে পড়া হাসি
তন্বী নদীর পাশে এখন সাদা কাশের রাশি
শারদ-আলো বসল এসে ন্যাওড়া নদীর পাশে
বনের পাখি বনের পশু রোদ মেখে নেয় ঘাসে!

চা-বাগিচার রূপ খুলেছে শরৎ-আলো মেখে
সেও হেসেছে বুকের মধ্যে কান্না পুষে রেখে
হাত তুলে নেন চতুর মালিক, চলছে বাঁচার লড়াই
তাদের কষ্ট একটু যদি সবাই মিলে সরাই?

পথগুলো যায় কাশের বনে, শিউলিতলার দিকে
জমিয়ে রাখা কষ্টগুলো হোক না এবার ফিকে
দেবীবাড়ির ঢাক বেজেছে, বুকের ভেতর সানাই
এসো এবার কুশল জানি, শুভেচ্ছাটাও জানাই!

ছন্দে অমিত কুমার দে । ছবিতে প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৫

এই সংখ্যায়

ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসা অনিশ্চিতই থেকে যাবে?		৬
অশোক-গৌতম দু'জনেরই এবার লড়াই আসলে জমি ফিরে পাওয়ার		১০
তৃণমূলের ঝুলিতে হরকা, হরকার ঝুলিতে কতটা জুটবে পাহাড়ি আবেগ?		১২
বিহারে আধুনিক অস্ত্র ঢুকছে ডুয়ার্স হয়ে?		১৪
ডুয়ার্সের দেবী বন্দনা নানা রূপে দশভুজা		১৬
জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি		২১
স্মৃতির ভেলায় ভেসে ওঠে চা বাগানের দুর্গোৎসব		২৪
ডুয়ার্সের পুজোর পুরনো দিনগুলি		২৯
আজকের দেবী চালিত ডুয়ার্স		৩২
হরিমালিকের দুর্গাপুজো		৩৭
বাঘের ঘুম ভেঙে যাবে		৪০
অনুপম দৃষ্টান্ত		৪৭
ধারাবাহিক	ছিটমহলের ছেঁড়া-কথা	৩৮
	সোনালি চা-বাগান শ্রমিক সমবায় আন্দোলন	৪৮
	তরাই উৎরাই	৫২
	বসন্তপথ	৬৩
গল্প	প্রাপ্তিযোগ	৫৫
	ছিল যে পরানের অন্ধকারে	৫৮
	লাজমতি	৬২
ডুয়ার্সের ডিশ	ভানুনগরে নেপালি ভোজে	৭৪
পুজোয় সুস্থ থাকার কিছু ডাক্তারি পরামর্শ		৭৮

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super deluxe (non AC)	Rs 600	800
Deluxe AC	Rs 900	1100
Super Deluxe AC	Rs 990	1200
VIP Deluxe AC	Rs1600	1600
Suite	Rs 3000	3000
Extra PAX (Non AC)	Rs 100	-
Extra PAX (AC)	Rs 200	-

NB tax As per Applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয় বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বিপণন দপ্তর বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ৮৩/৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯, **ইমেল** ekhonduars@yahoo.com

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

শারদীয়া অভিনন্দন

রাজ ঐতিহ্যের শহর কোচবিহার সেজে উঠছে উৎসবের আগমনে।
মানুষের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণ করার জন্য
মা দশভুজার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা জানাই।
প্রত্যেকের আগামী দিনগুলি হয়ে উঠুক সুন্দর আনন্দময়।

সভাধিপতি
কোচবিহার জেলা পরিষদ

ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসা অনিশ্চিতই থেকে যাবে?

'সরকারি উদ্যোগ ছাড়া কোনও পর্যটন কেন্দ্র সফলভাবে গড়ে তোলা যায় না। আমাদের দেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে এর চাইতে বড় সত্য আর কিছু নেই। অর্থাৎ আমাদের কেন্দ্রে বলুন বা রাজ্যে, পর্যটন মন্ত্রীর দায়িত্বের কেউ না কেউ থাকলেও তার গুরুত্ব কখনই সেভাবে দেওয়া হয় না। স্বভাবতই পর্যটন বিকাশে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ পর্যন্ত কোনও সুনিশ্চিত গাইডলাইন গড়ে ওঠেনি। অথচ কর্মহীনতা, শিল্পে বন্ধ্যাত্ব, উগ্রবাদী কার্যকলাপ, অরণ্য ধ্বংস, চোরাশিকার এসবেরই সমাধান সূত্র হতে পারত পর্যটন, রাজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা তো আছেই। এরপরেও পর্যটনকে গুরুত্ব না দেওয়ার অর্থ ধরেই নিতে হবে নেতারা আদপেই এসব সমস্যার সমাধান চান না।'

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ইংরেজি নিবন্ধের খানিকটা অংশ বাংলা ভাষান্তর করতে গিয়ে অনুভব করলাম এই কথাগুলি অনেকটাই প্রযোজ্য আমার ডুয়ার্সের ক্ষেত্রেও। প্রত্যেকবার দেখেছি বর্ষা শেষ হলে জঙ্গল খোলে আর পর্যটন ব্যবসায়ীরা আশায় দিন গুনতে থাকেন এবার নিশ্চয়ই টুরিস্টের ভিড় উপচে পড়বে— দু'টো পয়সার মুখ দেখা যাবে! না হলে ধারদেনায় যে ঘটি-বাটি বিক্রি করার জোগাড়। যারা ডুয়ার্সের স্থানীয় মানুষ তাদের না হয় অভাবের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার অভ্যাস আছে। কিন্তু কলকাতার যে ব্যবসায়ী প্রকৃতির প্রেমে পড়ে গিয়ে বহু টাকা লোন করে জমি কিনে রিসর্ট বানিয়ে বসে আছেন তাঁর অবস্থা কে ভাবে? আজ এনসেফেলাইটিস তো কাল বন্যা ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসা তো প্রায় প্রত্যেক বছরই কোনও না তোনও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে কাটায়। তার উপর জঙ্গলে প্রবেশ ও সাফারির খরচ বহুমাত্রায় বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে ডুয়ার্স বেড়ানোর আনন্দ।

আসলে দার্জিলিং পাহাড়ে একটা সময় ক্রমাগত অশান্তি টুরিস্টকে ডুয়ার্সমুখী করেছিল। গোরুমারা ন্যাশনাল পার্কে বন্যপ্রাণ দপ্তরের ইকো টুরিজম উদ্যোগ সেই টুরিস্টকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। আচমকা পর্যটক স্রোতে দ্রুত গড়ে উঠেছিল একের পর এক রিসর্ট। এর মধ্যে বেশ কিছু রিসর্টে পৌঁছবার রাস্তাটুকুও ঠিকঠাক তৈরি হয়নি। কিংবা টুরিস্টদের জন্য ন্যূনতম পরিষেবাটুকুও নেই। অর্থাৎ সেখানে জমির দাম বেড়ে হয়ে গেল পঞ্চাশগুণ। পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসতেই পর্যটকরা ডুয়ার্সকে কাঁচকলা দেখিয়ে ছুটতে শুরু করল দার্জিলিংয়ের পথে। কিংবা লাভা-লোলেগাঁও। পর্যটকের ভিড়ে ফের জেগে উঠল পাহাড়। আর টুরিস্টের খেয়ালের উপর ভরসা করে, গুটিকয় প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকের উপর ভরসা করে শুকিয়ে মরতে লাগল ডুয়ার্স।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ফিরতে হত না যদি সেসময় ডুয়ার্সমুখী স্রোতকে ধরে রাখার জন্য তখনই সরকারি উদ্যোগ নেক্ষ্ ওয়া হত পর্যটক বন্দর পরিষেবা চালু করে সাধ্যের মধ্যে ডুয়ার্সের পর্যটনকে বেঁধে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। সে সময় ধারণা পোষণ করতেন পর্যটনের কর্তাব্যক্তিরা, আজও তার অন্যথা হয়নি। কেবল কাজ করবার ধরনটা পালটেছে। আজও পর্যটনের বিকাশ মানে নদী বা কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে মুখ করে গুটিকতক সুন্দর দেখতে কটেজ। স্থায়ী পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে গেলে যেমন প্রয়োজন পরিকাঠামো-পরিষেবা, তেমনই জরুরি প্রকৃতি পাঠের পর্যটনের উপর ভীষণ ভীষণ জোর দেওয়া।

পর্যটন দপ্তর ডুয়ার্সের তিন প্রধান জঙ্গলেই তাদের নিজস্ব পর্যটক আবাস চালু করে দিয়েছে এবং সেগুলি যথেষ্ট উচ্চমানের নিঃসন্দেহে। বনদপ্তরও তাদের সবক'টি লজকে এক বা একাধিক ছাতার তলায় নিয়ে এসেছে। সর্বত্রই চালু হয়ে গেছে অনলাইন বুকিং। কিন্তু প্রশ্ন হল এখানেই কি তাদের দায়িত্ব শেষ! যে সিংহভাগ পর্যটক এবার পর্যটন বা বনবিভাগের লজে বুকিং পেল না তাদের

মধ্যে পরের বারের জন্য আকাঙ্খা তৈরি করার লক্ষ্যে কিছু কি করা উচিত নয়? ছাত্রছাত্রী বা তরুণ-তরুণীদের একটা বিশাল অংশ দলবেঁধে বেড়াতে যাওয়ার উৎসাহী। দমনপুরের বনময়ূরীর মতো অবহেলায় প্রায় বন্ধ হয়ে লজগুলিতে তাদের জন্য সস্তায় ব্যবস্থা করা যায় না? গোটা ডুয়ার্সে যে এখনও পর্যন্ত একটিও ইয়ুথ হোস্টেল নেই সেটা লক্ষ্য করেছেন কেউ? রায়মাটাং-লেপচাখা-তোদেতাংতা-লংকাপাড়ায় টেন্ট বসানোর কথা এর আগে কাগজে বহুবার চোখে পড়েছে কিন্তু টেন্টের খবর এযাবৎ কিছু নেই।

কিন্তু টেন্টের আগেও আসে যাতায়াত ব্যবস্থার কথা। নিউজলপাইগুড়ি, মাল, হাসিমারা, আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে নানা গন্তব্যে পৌঁছতে সুমো জাতীয় গাড়ি ভাড়া করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বাস পরিষেবা অত্যন্ত সীমিত, বলাই বাহুল্য। এখনও ডুয়ার্সের পর্যটক ট্রেন থেকে নেমেই লাটাগুড়ি-মূর্তি-চালসা-ঝালং কিংবা মাদারি-জয়ন্তী-চিলাপাতা যাওয়ার বাস পাওয়া যায় এ সত্য কল্পনাতেও আনতে পারেন না। অথচ আনাটা কি খুব কঠিন? নিয়মিত ও পর্যাপ্ত বাস পরিষেবা থাকলে ডুয়ার্সের পর্যটক সমাবেশে চিত্রটা যে পালটে যেত তাতে কারও কোনও সন্দেহ আছে কি? উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারত নিঃসন্দেহে।

ঠিক তেমনিই কারও কোনও সন্দেহ নেই, পরিকাঠামোর অভাবেই ডুয়ার্সের পর্যটন প্রত্যেকবার অনিশ্চিত থেকে যাবে। লাটাগুড়ি-মাদারিহাট-জয়ন্তী চিলাপাতার অবস্থা একইরকম থেকে যাবে বছরের পর বছর। বাইরের বেসরকারি উদ্যোগও যে ততদিন আসবে না তাও বলাই বাহুল্য। যেমন যথেষ্ট প্রশংসনীয় উদ্যোগ হলেও গাজলডোবার মেগা প্রোজেক্টের আশানুরূপ সাড়া মেলেনি এই কারণেই। গাজলডোবায় ছুটি কাটাতে এসে টুরিস্ট থাকবে এক বা দু'রাত, বাকি দিনগুলিতে পাহাড়ে কাটানোর বিকল্প তো সেই ডুয়ার্স— অতএব সেখানকার পরিকাঠামো ঠিক না থাকলে গাজলডোবার ব্যবসাই বা বাড়বে কী করে! পর্যটন দপ্তরের তাই বোধহয় গাজলডোবার আগে ডুয়ার্সের পরিকাঠামো ঠিকঠাক করা উচিত!

গোটা ডুয়ার্সে যে এখনও পর্যন্ত একটিও ইয়ুথ হোস্টেল নেই সেটা লক্ষ্য করেছেন কেউ? রায়মাটাং-লেপচাখা-তোদে তাংতা- লংকাপাড়ায় টেন্ট বসানোর কথা এর আগে কাগজে বহুবার চোখে পড়েছে কিন্তু টেন্টের খবর এযাবৎ কিছু নেই।

পর্যটন দপ্তরের মাথায় যাঁরা বসে আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের চাইতে অনেক অনেক বেশি বুদ্ধি ধরেন। কিন্তু তাঁদের বলি, লক্ষ্য কোটি ব্যয়ে টুরিস্ট লজ বানিয়ে সেখানে বছরের মাত্র তিনমাস টুরিস্টের ভিড় জমিয়ে আর যাই হোক আখেরে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটে না। বছরভর টুরিস্টের ভিড় জমাতে টানতে

যেবার এনসেফেলাইটিস নিয়ে মিডিয়ার মাত্রাহীন প্রচারে ডুয়ার্সের পর্যটন ডকে ওঠার জোগাড় হয়েছিল, সেদিন এদেরকে কিন্তু প্রতিবাদে সরব হতে দেখা যায়নি। চাঁদা তুলে কলকাতায় বা অন্য রাজ্যের শহরে গিয়ে ডুয়ার্স নিয়ে রোড শো করার প্ল্যান হয়েছিল কোনওদিন?

হবে তরুণ প্রজন্মকে। আর একটি সত্যি হল পর্যটককে যদি জঙ্গলের ছমছমে পাহাড়ি পথে না হাঁটানো যায় কিংবা উন্মুক্ত ঝোরায় চান না করানো যায় তবে কেবল সবজি পুরি, জঙ্গল সাফারি, দিশি মুরগির কারি দিয়ে পর্যটককে বারবার ডুয়ার্সে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

জিপসিতে চাপিয়ে জঙ্গল সাফারির পরিমাণ বাড়লে বন্যপ্রাণের চলাফেরা বিঘ্নিত হয়, ক্ষতি হয় পরিবেশের, সেটা বরং একটু দুর্মূল্যই থাক, ক্ষতি নেই। কিন্তু কখনও চা-বাগানের পাতা তোলার প্রতিযোগিতায় কখনও বা ক্রসকানট্রি দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামিয়ে পর্যটককে নেশা ধরাতে হবে— ডুয়ার্সের নেশা। দু'দিনের ফাঁক পেলেই সে চলে আসবে এখানে। বাসে-সাইকেলে-পায়ে হেঁটে সে দেখতে শিখবে, ভালবাসতে শিখবে ডুয়ার্সকে। তার আগে প্রয়োজন ন্যূনতম পরিকাঠামো। আর তা না হলে ক্রনিক রুগীর মতো কখনও একটু ভাল, কখনও খারাপ অবস্থাতেই থেকে যেতে হবে বরাবর।

দৈনিক সংবাদপত্রের উত্তরবঙ্গ সংস্করণে মাঝে মধ্যেই ডুয়ার্সের ইকো টুরিজম নিয়ে নানা খবর ছাপা হয় (যে খবর আদৌ পৌঁছয় না দক্ষিণে বা কলকাতার পর্যটকদের কাছে)। সেখানে ভারী ভারী বিবৃতি ছাপা হয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের নানা সংস্থা-সমিতির কর্তাব্যক্তিদের। দু'একবার দেখা গেছে তাঁদেরকে মন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসতে। পর্যটন ব্যবসায় স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই এইসব সংস্থার সৃষ্টি বলে সবাই জানে। অথচ কাগজে বিবৃতির বাইরে এদের কাজকর্ম আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। যেবার এনসেফেলাইটিস নিয়ে মিডিয়ার মাত্রাহীন প্রচারে ডুয়ার্সের পর্যটন ডকে ওঠার জোগাড় হয়েছিল, সেদিন এদেরকে কিন্তু প্রতিবাদে সরব হতে দেখা যায়নি। চাঁদা তুলে কিংবা উত্তরবঙ্গ মন্ত্রীর সাহায্য নিয়ে কলকাতায় বা অন্য রাজ্যের শহরে গিয়ে ডুয়ার্স নিয়ে রোড শো করার প্ল্যান হয়েছিল কোনওদিন? সিনেমা-শুটিং করতে আসা প্রযোজকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ফান্ড তৈরির ভাবনা এসেছিল কারও মাথায়? কোনও রিসর্ট মালিক বা ট্রাভেল এজেন্সি এইসব সংস্থার নাম লেখালেও এদের উপর ভরসা কোনওদিন জন্মাবে বলে মনে হয়? অথচ সরকারি পরিকাঠামো বা পরিষেবা চালুর দাবি আদায়ে সোচ্চার হতে হবে এইসব সংস্থাগুলিকেই। কারণ মরিয়া হয়ে পথে না নামলে ভবিষ্যৎ যে সুখের হবে না তা নিশ্চয়ই আলাদা করে বলে দিতে হবে না।

মা নেমে আসছেন মাটিতে, মানুষের জন্য

জলপাইগুড়ি পৌরসভার আহ্বান

পুজো তো দোর গোড়ায় এখন। শহর লাগোয়া তিস্তার চর ছেয়ে গিয়েছে কাশের বনে। রঙিন নৌকোগুলি নীল আকাশে টাঙান সাদা মেঘের চাঁদোয়ার নিচে বয়ে যাচ্ছে সেই বনের দিকে। পুজো কমিটির সদস্যদের তৎপরতা তুঙ্গে। পুজোর দিনগুলিতে আনন্দে মেতে ওঠার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন পুরবাসী। রাজবাড়ির মন্দিরে তৈরি হচ্ছে মায়ের মূর্তি।

আর তৈরি হচ্ছি আমরা। জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রতিনিধি, কর্মীরা। পুজো মানেই মানুষের ঢল। তার আগে শহরের প্রতিটি রাস্তাকে বেশি উপযুক্ত করে তুলতে হবে আমাদের। পরিচ্ছন্ন করে তুলতে হবে পুর এলাকার প্রতিটি কোণ। পুজো উদ্যোক্তাদের আয়োজন যাতে সুষ্ঠু হয়, সে জন্য বাড়িয়ে রাখতে হবে সহযোগিতার হাত। বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে ঘাট।

মা নেমে আসছেন মাটিতে, মানুষের জন্য। আমরা তাঁকে বরণ করার জন্য দিন গুনছি। পুরসভার পক্ষ থেকে রয়েছি সদা জাগ্রত। এবার পুজোয় মা আসবেন এক নতুন জলপাইগুড়ি শহরে। দেখবেন সার্থক পুর পরিষেবার চেহারা। আর পুরবাসী পুজোর দিনগুলিতে শহরের মন্ডপে মন্ডপে বেড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করবেন উন্নয়নের চিহ্নগুলি। আর এই ভেবে আনন্দিত হবেন যে, মা-মাটি-মানুষের হাতে পুরসভার দায়িত্ব তুলে দিয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্র ভুল করেন নি।

তাই এবারের শারদোৎসব শহরের প্রতিটি বিন্দুতে স্থাপিত থাকবে এক অদৃশ্য মঙ্গল ঘট। শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই পুরসভায় এর আগে আর কেউ এমন সর্ব মঙ্গলময় ঘট স্থাপন করতে পারেনি। কিন্তু আমরা পেরেছি।

কারণ, আমরা মা-মাটি-মানুষের দর্শনে বিশ্বাসী। আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাশফুলের সাদা আর আকাশের নীল এনে ঢেলে দিয়েছেন দীর্ঘ কালের বঞ্চিত এই পুরসভায়। আমাদের কর্মবীণায় দিবারাত্র তাই ধ্বনিত হচ্ছে শরতের ললিত রাগিনী। সেই আলাপ ছড়িয়ে পড়েছে পুর এলাকার ২৫টি ওয়ার্ডে।

আলোর বেণু আজ সত্যিই বাজছে জলপাইগুড়ি শহরে। এই বেণু আপনারা যোগ্য হাতে তুলে দিয়েছেন বলেই এত সুর বাজছে। প্রতিটি ছন্দে মূর্ত হয়ে উঠছে মায়ের মমতা, মাটির গন্ধ আর মানুষের বার্তা। আর পুর এলাকার আকাশ বাতাস মুখরিত হচ্ছে এই সংগীতে—

মা-মাটি-মানুষ পেতেছে তোমার যোগ্য আসনখানি।
এসে বসো মাগো! তুমি দশভুজা! আমাদের গিরিরানি।।

অশোক-গৌতম দু'জনেরই এবার লড়াই আসলে জমি ফিরে পাওয়ার

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে নির্বাচনী যুদ্ধের শঙ্খধ্বনির সংকেত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গিয়েছে সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সৈন্যসমাবেশের মতো মহারণের প্রস্তুতি। তবে এই আধুনিক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কেউ বলার নেই— 'যেখানে ধর্ম, সেখানে জয়।' কারণ, বেদব্যাসের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পাণ্ডবপক্ষের জয় আর কুরুকুলের পরাজয়ের পর কেউ আর নিজেদের কুরুবংশের গৌরবের দাবি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে চায় না। কিন্তু আজকের কুরুক্ষেত্রের অপর নাম 'গণতন্ত্রে বধ্যভূমি'। এখানে যে জয়ী হয়, সে-ই পাণ্ডব। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে আজ দুই সেনাপতি। এক সেনাপতি রাজ্যের প্রাক্তন নগরোন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে ঊরুভঙ্গ হয়ে গদি থেকে মাটিতে পড়ে এতদিন শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন। শিলিগুড়ি পুর নির্বাচনের সাফল্যের বিশল্যকরণীর স্পর্শে ভাঙা মাজাকে জোড়া লাগিয়ে এই নির্বাচনের সেনাপতি হওয়ার ভূমিকায় এবার সাধারণের রথে চেপে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। অন্য দিকে, লোকসভা ও শিলিগুড়ি পুরসভা নির্বাচনে ভূপতিত উত্তরবঙ্গের উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেব নিজেকে ফের পাণ্ডবপ্রমাণে মরিয়া।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচন এই রাজ্যের অন্য জেলা পরিষদের নির্বাচন থেকে আলাদা। নামে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ হলেও এর অবস্থান রাজ্যের জেলা পরিষদের মতো। দার্জিলিং জেলার ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানের বিবেচনায় সরকারিভাবে ঘোষিত না হলেও, শিলিগুড়ি মহকুমা যেন অঘোষিত জেলার ভূমিকা পালন করে। পঞ্চায়েত আইনে প্রতিটি জেলায় একটি করেই জেলা পরিষদ থাকবে। মহকুমা পরিষদের প্রশাসন থাকবে জেলা পরিষদের অধীন। শিলিগুড়ির মহকুমা পরিষদ সেই পঞ্চায়েত বিধি অনুসারে জেলা পরিষদের নামে অভিহিত করা যায়নি। তবে বিধানসভার সিদ্ধান্ত অনুসারেই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে দার্জিলিং জেলা পরিষদ থেকে

পৃথক করে তাকে জেলা পরিষদের মতোই ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। এর পদাধিকারীকে সভাপতির পরিবর্তে সভাধিপতি এবং পদমর্যাদায় একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, যা পেয়ে থাকেন কেবল জেলা সভাধিপতিই।

দার্জিলিং জেলার ৪টি মহকুমা— দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং শিলিগুড়ি। এই ৪টি মহকুমা নিয়ে ১৯৭৮ সালে দার্জিলিং জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে দার্জিলিং জেলা পরিষদের শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত এলাকাগুলি নিয়ে গঠিত হয়েছিল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।

অপরটি ফাঁসিদাওয়া ব্লক ও খড়িবাড়ি ব্লক। এগুলির অধীনে ছিল প্রথমে ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত, পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২২টি পঞ্চায়েত। শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামাঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন জেলা তথা রাজ্যের কৃষক-নেতা অনিল সাহা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেট নিয়ে উত্তরবঙ্গে জীবিকার সন্ধানে এসে প্রথমে বিড়ি শ্রমিক হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। চাকরি পান ডাক বিভাগে। দলের নির্দেশে সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করে এই জেলায় কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে জেলা কৃষক সংগঠনের সম্পাদক হন। পরে দার্জিলিং জেলা পরিষদের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জেলা পরিষদের অন্যতম কর্মকর্তা রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৯ সালে দার্জিলিং জেলা পরিষদ থেকে পৃথক করে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নামে জেলা পরিষদের সমমর্যাদায় পরিষদটি গঠন করা হয়েছিল। দার্জিলিং জেলা পরিষদের পদাধিকারী অনিল সাহাকে এর সভাধিপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়। তার পরে অবশ্য নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে নির্বাচিত সভাধিপতি হন। ২০০৪ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এই পদটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে জিতেছেন এবং একই দায়িত্বে আসীন ছিলেন।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কৃষক এলাকায় অনিলবাবুর সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু সে সময় উত্তরবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলে পরিচিত রাজ্যের নগরোন্নয়ন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যর সঙ্গে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তাঁর 'মধুর' সম্পর্কের কথা দলীয় অন্দরমহলের প্রাচীর টপকে বাইরেও উপচে পড়ছিল। এমনকি তাঁর বাড়িতে যে গভীর রাতে বামফ্রন্টের শাসনকালেই আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল, সেটাও যে সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রকাশ তা ভাবারও কারণ আছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, শিলিগুড়ি মহকুমার সভাধিপতির পদটিকে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের প্রেক্ষাপটে আছে ওই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রভাব। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হলে অনিলবাবুকে সরানো যাবে। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান মেয়র অশোক ভট্টাচার্য চিরকালই শহরে রাজনীতি করে এসেছেন। নির্বাচিত হয়েছেন বিপুল ভোটে

শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। এই কেন্দ্রটির ভোটাররাও শহুরে ভোটার। আর মন্ত্রী হওয়ার পর শহরের ভোটারদের সঙ্গে সেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখার তাগিদেই গ্রামের মানুষের উঠোনে বা মাটির বারান্দায় বসে তাদের হৃদয়ের স্পন্দন নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করা তো তখন প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা।

অশোক ভট্টাচার্য তাঁর মন্ত্রিত্বকাল দীর্ঘায়িত করার জন্য সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের সঙ্গে যত বেশি পরিচিত হয়েছেন, ততই মাটির মানুষ তাঁকে দূর থেকে দেখতে শুরু করেছিল। মন্ত্রী হলে যে আর কমরেড নন তখন মাননীয় মন্ত্রীসাহেব। সাধারণ মানুষের পিঠে একদিন যে আত্মীয়তার হাত স্পর্শ করত, সে হাত এখন ফিতে কাটার কাঁচি। সাজানো উদ্বোধন মঞ্চে আমলা ও সমাজের কেউকেটো পরিবৃত হয়ে মাইকে ভাষণ। তারপরই নিরাপত্তাবাহিনী পরিবৃত্ত হয়ে লাল বাতিওয়ালা গাড়ির গদির সিটে গা এলিয়ে দেওয়া। সামনে পাইলট কার। মোগল সম্রাটরা রাজপথে বেরোলে যেমন গা শিহরিত করা সাইরেন বাজিয়ে প্রজাদের ‘তফাত যাও’ শাসানিতে রাজপথ প্রজাশূন্য রাখা হত, গণতান্ত্রিক দেশের মন্ত্রীরাও রাজপথে বেরলে এভাবে রাস্তা শূন্য রাখা হয়।

অশোকবাবুকে যখন বলা হত উত্তরবাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তখন কিন্তু তিনি খেয়াল করেননি, তাঁর নিজের জেলাতেই তাঁর মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে। জেলার চারটি মহকুমার মধ্যে তিনটি শুধু তাঁর হাতছাড়াই নয়, সেখানে বলতে গেলে তাঁর প্রবেশই নিষিদ্ধ। বলতে গেলে লোকমুখে উত্তরবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলে প্রচারিত হলেও তাঁর রাজত্বের সীমা সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল শিলিগুড়ি শহরের কয়েকটি ওয়ার্ড নিয়ে দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত। তারপর তো ২০১১ সালের নির্বাচনে দেখা গেল, শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রটিও তাঁর কাছ থেকে চলে গেল।

বিগত শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচনে একজন নির্দল সদস্য এবং চারজন কংগ্রেস ও দু'জন বিজেপি সদস্যর সমর্থনের উপর দাঁড়িয়ে এক সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল গঠন। আসলে এই নির্বাচনী ফলাফলকে বলা যেতে পারে এখানকার তৃণমূল নেতৃত্বের রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতা ও কদর্য গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দান। বিগত পৌরসভা গঠনের আগে থেকেই শিলিগুড়ির নির্বাচকমণ্ডলীকে মন থেকে মুছে তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা মেয়র হবার স্বপ্নকে মনে মনে বহন করে, নিজেদের শক্তিকেই ফোলানো বেলুনের মতো হাজির করতে গিয়ে, পৌরসভা গঠনকেই মাসের পর মাস পিছিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর ক্ষোভ। সে দিন শিলিগুড়ির মানুষ যে কোনও নেতার ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিল তা নয়। রাজ্যে বামফ্রন্টের পরিবর্তনের জন্য মানুষ একদিন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। শিলিগুড়ির ভোটদাতারাও শিলিগুড়ি পুর প্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্নভাবে বামফ্রন্টের দাম্ভিক উপস্থিতি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস জোটকে ভোট দিয়ে তাদের ক্ষমতায় এনেছিল। মুশকিল হল, এই জোটের নেতারা সকলেই ভাবতে শুরু করলেন যে, তাঁরই জন্য তিনি ও অন্যরা ভোট পেয়েছেন। তাই তাঁরই অধিকার মেয়র পদের চেয়ারটিতে। ক্ষমতার এই কদর্য কাড়াকাড়ির জন্য পুর সংগঠন নির্মাণ কয়েক মাস পিছিয়ে ছিল। তারপর পুরসভা গঠিত হলেও একের প্রতি অন্যের এই ক্ষমতার লড়াইয়ে বলতে গেলে পুরসভার কাজ প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল।

অশোকবাবু দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। বিগত নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নির্বাচনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে বিচ্ছিন্নতার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা যাবে এবং অতীতের ভাবমূর্তি মুছে ফেলা যাবে। রাজনৈতিক এই ঝুঁকি নেওয়াটাকে প্রশংসাই করতে হবে। বিধানসভার নির্বাচনে পরাজয়ের পর পুর নির্বাচনে জিততে না পারলে এখানে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎই শূন্য হয়ে যেতে পারত। মহকুমা পরিষদে নির্বাচনে জেতাটা তাঁর অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই অনিল সাহার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও অসুস্থ বর্ষীয়ান কৃষক-নেতাকে গ্রামে গ্রামে সভা করতে পাঠাচ্ছেন। কারণ, এই গ্রামাঞ্চলকে অনিলবাবু তাঁর হাতের তালুর মতো চেনেন। তবে দীর্ঘদিন গ্রামের সংগঠন থেকে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন থাকা অনিল সাহা তৃণমূলের প্রশাসনিক শক্তির প্রাচীর ভাঙতে পারেন কি না তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী গৌতম দেবের রাজনীতিও শহরকেন্দ্রিক। ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন দল থেকে যাঁরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কতজন তৃণমূলের আদর্শের প্রতি মুগ্ধ হয়ে দলে যোগ দিয়েছেন তা বলা মুশকিল। তবে এটা ভাবতে মোটেই কষ্ট হয় না, এর সিংহভাগই এই দলে যোগ দিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের থেকে কিছু পাওয়ার আশায়। ফলে নির্বাচনের ঘণ্টা বাজার আগে থেকেই লড়াই শুরু হয়েছিল নব্য ও আদি তৃণমূলিদের মধ্যে।

সংগঠন পরিচালনার জন্য যে মস্তিষ্ক ও প্রজ্ঞা থাকা দরকার তা গৌতম দেবের আছে বলে কেউ মনে করে না। মেজাজ হারাবার গুণের জন্য তিনি ইতিমধ্যেই সাধারণ কর্মীদের মনে ভীতিপ্রদ ও অপ্রিয় হয়ে পড়েছেন। তিনি মন্ত্রী। দলের সাধারণ সদস্যরা ক্ষমতার অধিকারীর কাছে থাকতে চায়। তাই অনেকেই তাদের ক্ষোভকে কাষ্ঠ হাসির আড়ালে ঢেকে মন্ত্রীর পাশে থেকে স্তাবকের ভূমিকা পালন করে। অন্তর্ঘাত ঘটে সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে, কারণ সেখানে পাওয়ার প্রত্যাশীদের ভিড় বেশি। প্রত্যেকেই ভাবে, টিকিট পেলে আমিই জিততাম। তাই যে চিঠি পেয়েছে, তাকে কাঁকড়ার মতো টেনে ধরার একটা গোপন বাসনা অনেকের মধ্যে থাকে।

গৌতম দেবের একটা গুণ তাঁর পরিশ্রম করার ক্ষমতা। কোনও ঘটনা ঘটলেই সেখানে ছুটে যান, সেটা সবারই নজর কাড়ে। তা ছাড়া তৃণমূল সম্পর্কে একটা ক্ষোভ ধীরে ধীরে দানা বাঁধলেও সাধারণ মানুষ এখনও বামফ্রন্ট নেতাদের দাম্ভিকতা এবং সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হুকুমকারী ভূমিকাকে ভুলতে পারছে না।

তৃণমূলের এক অংশ গৌতম দেবের এই উত্থানকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখে। শিলিগুড়ি পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ক্ষমতা দখলের ব্যর্থতাকে তারা মন্ত্রী গৌতম দেবের ব্যর্থতা বলেই দলের নেত্রীর কাছে তুলে ধরতে চাইছে। মহকুমা পরিষদ দখলে যদি তৃণমূল ব্যর্থ হয়, তবে তাকে তারা গৌতম দেবের ব্যর্থতা বলেই প্রমাণ করতে চাইবে।

অশোক ভট্টাচার্যর সেদিক থেকে হারাবার কিছু নেই। পুর কর্পোরেশনের নির্বাচনে তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে পেরে তিনি ইতিমধ্যেই কিছুটা এগিয়ে আছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে তাঁর দলের সদস্যরা বিরোধীর ভূমিকায় গ্রামে দলকে ধরে রাখতে পারছে না। এই সাংগঠনিক দুর্বলতা তৃণমূল বিরোধী জনতাকে ভোট বাক্সে কতখানি ধরে আনতে পারবে এবং অলিখিত রামধনু জোট তৃণমূলের ঝটিকা বাহিনীকে কীভাবে মোকাবিলা করতে পারবে তা দেখার বিষয়।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বনাম সিপিএমের কমজোরি সংগঠনের সমীকরণে ভোটের বাক্সের ফলাফল নিয়ে চোখ বুজে বলে দেওয়ার মতো রাজনৈতিক গনতকার উত্তরবঙ্গে অন্তত নেই। থাকলেও আগাম অনুমান করা যথেষ্ট কঠিন। তবে জেতা বা হারা যে সহজে হবে না, সেটুকু অনুমান করতে পারছে সবাই। সবার উপরে আসল সত্যটি হল, এ লড়াই তৃণমূল বনাম সিপিএমের চাইতেও অনেকগুণ বেশি নিজের জমি ফিরে পাবার লড়াই। ক্ষমতার আসনে বসে থাকা গৌতম দেব আর ক্ষমতা থেকে বেশ কিছুকাল দূরে থাকা অশোক ভট্টাচার্য— দুয়ের জন্যই এই সত্য নির্মমভাবে প্রযোজ্য।

মোর্চায় মরচে স্পষ্ট : তৃণমূলের ঝুলিতে হরকা হরকার ঝুলিতে কতটা জুটবে পাহাড়ি আবেগ?

বাংলার পাহাড়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে তৃণমূল সরকারের যুযুৎসু প্যাঁচে কুপোকাত হতে হয়েছে যুযুধান মোর্চা তথা গুরুং-বাহিনীকে। মমতার ঘন ঘন পাহাড় সফর ও নানা উন্নয়ন কর্মসূচির আঘাতে জেরবার হয়েছেন বিমল গুরুং ও তাঁর দল। তা ছাড়া গোদের উপর বিষফোড়া পাহাড় জুড়ে জনপ্রিয়তার পারদ দ্রুত নেমে যাওয়া। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাহাড়ে কি আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে তৃণমূল? নাকি উঠে আসবে নতুন পাহাড়ি মুখ?

বাংলার পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণের রং গাঢ় হচ্ছে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। কালিম্পঙের মোর্চা বিধায়ক হরকা বাহাদুর ছেত্রী মোর্চা শিবির ছাড়লেন। এখন ামনে আসতে শুরু করেছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার অভ্যন্তরীণ কলহ, একে অপরকে গালাগালি, কাদা ছোড়াছুড়ি। পাহাড়ে মোর্চা যুগের অবসানের স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে। বাংলার পাহাড়ের রাজনৈতিক চালক হতে মরিয়া শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের মুখে এখন চওড়া হাসি। কারণ! তারা জানে তাদের অঘোষিত হরকাপ্রাপ্তি! বাকি দুই বিধায়ক ইস্তফা দিলেও, হরকা বাহাদুরই যে তৃণমূলের মূল লক্ষ্য তা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

তৃণমূলের হাঁড়ির খবর, গত লোকসভা ভোটের আগে থেকেই হরকা বাহাদুরকে দলে চাইছিলেন মমতা। দিদিমণির এতদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে চলেছে। যে কোনও দিন আনুষ্ঠানিকভাবে হরকা বাহাদুর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। এ বিষয়ে হরকা বাহাদুর ছেত্রীর সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হয়ে গিয়েছে বলে তৃণমূল ভবনের প্রথম সারির এক নেতার দাবি। আরও জানা গিয়েছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কালিম্পঙের তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে দিদিমণির প্রথম পছন্দের নামও হরকা বাহাদুর ছেত্রী। আর হরকা বাহাদুর যদি বিধানসভা ভোটে না দাঁড়াতে চান, সেখানে তাঁকে দার্জিলিং জেলা পাহাড় তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি করা হবে। হরকা বাহাদুরের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে পাহাড়ে শক্তি বাড়াতে চাইছে তৃণমূল। হরকাই হবেন আগামী বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের পাহাড়ের মুখ।

যে পথেই যাই, ঘাসফুলই পাই

এই ছবিটা তো স্পষ্ট যে, বাংলার পাহাড়ের রাজনৈতিক রং পালটাচ্ছে। পায়ের তলার শক্ত জমি ক্রমশ নরম হচ্ছে বিমল গুরুং ও তাঁর দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার। দিন ঘুরতে না ঘুরতেই কালিম্পঙের বিধায়ক হরকা বাহাদুর ছেত্রী মোর্চা শিবির ছাড়লেন। তবে তিনি তাঁর তৃণমূলে যোগদানের বিষয় স্পষ্ট করেননি। না-বলা কথায় তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে রাজ্য সরকারের সখ্য রয়েছে যথেষ্ট।

জিটিএ-তে রাজ্য সরকারের অহেতুক হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পঙের তিন মোর্চা বিধায়কের পদত্যাগের নির্দেশ দেন মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং। দার্জিলিং, কার্শিয়াঙের দুই বিধায়ক মোর্চা সুপ্রিমোর কথা মেনে নিলেও মানেননি কালিম্পঙের বিধায়ক হরকা বাহাদুর। বিধানসভার লবিতে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন মোর্চা ছাড়ার কথা। তবে তিনি বিধায়কের পথ ছাড়ছেন না। তিনি আরও বলেন, নির্দল বিধায়ক হয়েই পাহাড়ের মানুষের জন্য কাজ করবেন। বিমল গুরুঙের নাম না করে হরকা বাহাদুর দীর্ঘদিনের জমা ক্ষোভ উগরে দিতে শুরু করেছেন। আর তা বিমল ও তাঁর দলকে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় ফেলেছে।

যদিও বিমল গুরুঙের দাবি, হরকা বাহাদুরের দলত্যাগ পাহাড়ি রাজনীতিতে কোনও প্রভাব ফেলবে না। অন্য দিকে, বিমল গুরুং, রোশন গিরি-সহ প্রথম সারির নেতৃত্বের উপর আস্থা হারিয়েছেন একাধিক মাঝারি ও নিচুতলার মোর্চা নেতৃত্ব ও কর্মীরা। তাঁরাও মোর্চা ছাড়তে মানসিকভাবে প্রস্তুত। এ কথা

গোর্খাল্যান্ড বা আলাদা রাজ্য কোনও দিনও বাস্তবে সম্ভব নয় তা মমতা যেমন জানেন, জানেন ক্ষুব্ধ মোর্চা নেতা- কর্মীরাও। কিন্তু গোর্খাল্যান্ড পাহাড়ি মানুষের স্বপ্ন। আর এই স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেই পাহাড়ে রাজনীতি করতে হবে।

ঠিক যে, হরকা বাহাদুরের দলত্যাগ যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে পাহাড়ে। কারণ, হারকা বাহাদুর পাহাড়ি মানুষের কাছে একটা আইকন। এখন প্রশ্ন হল, এই বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা কোথায় যাবেন? কোনও দলে যোগদান করবেন? নাকি নতুন দল বা মঞ্চ বানাবেন, তা ঠিক করতে পারছেন না মোর্চার বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা। তাঁদের অনেকেই হরকা বাহাদুরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন গোপনে।

এখন বিক্ষুব্ধ মোর্চা নেতাদের সামনে তিনটি রাস্তা। এক, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করা। ওই দলে যোগ দিয়ে দিদিমণি ও তৃণমূল সরকারের বন্দনা করতে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলার পাহাড়ে রাজনীতির প্রথম কথা হল, আলাদা রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে জিইয়ে রাখা। মমতা বাংলা ভাগ করে গোর্খাল্যান্ডের বিরোধিতা করে আসছেন, সব সভাসমিতিতে তিনি বলেন, বাংলা ভাগ হতে দেব না। কিন্তু গোর্খাল্যান্ড বা আলাদা রাজ্য কোনও দিনও বাস্তবে সম্ভব নয় তা মমতা যেমন জানেন, জানেন ক্ষুব্ধ মোর্চা নেতা- কর্মীরাও। কিন্তু গোর্খাল্যান্ড পাহাড়ি মানুষের স্বপ্ন। আর এই স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেই পাহাড়ে রাজনীতি করতে হবে। তাই পাহাড়ের সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে কতটা সমর্থন করবে, সেটাও এই মুহূর্তে আর একটা বড় প্রশ্ন।

তাঁদের সামনে দ্বিতীয় পথ বিজেপি-তে যোগদান করা। সম্প্রতি কালিম্পঙে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ-র এক অনুষ্ঠানে দার্জিলিঙের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'বাঙালিরা বলেন আমরা বাংলার, পাঞ্জাবিরা বলেন আমরা পাঞ্জাবের, তাহলে গোর্খারা কবে বলবেন আমরা গোর্খাল্যান্ডের?' আলুওয়ালিয়ার ভাষণের পর অনেক মোর্চা নেতৃত্ব বিজেপি শিবিরে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ, আলুওয়ালিয়া পাহাড়ি মানুষের স্বপ্নকে নতুন মোড়কে বিক্রি করার আলো দেখিয়েছিলেন। কিন্তু দু'দিন পর সাংসদ আলুওয়ালিয়া নিজের অবস্থান পালটে ফেলেন। বিজেপি-তে যোগদানের মোহ ম্লান হতে শুরু করে বিক্ষুব্ধ মোর্চা নেতাদের। আসলে বিজেপি-র রাজ্য নেতৃত্ব জানেন, বাংলা ভাগের কথা আনলেই প্রভাব পড়বে ডুয়ার্সে, তরাই এবং গোটা বাংলার সমতলে। সেটা বুঝতে পেরে বা রাজ্য নেতৃত্বর চাপে নিজের অবস্থান বদলেছেন সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। নতুন মঞ্চ বা নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি করা বিক্ষুব্ধ মোর্চা নেতাদের তৃতীয় পথ। কিন্তু বাংলার পাহাড়ে বেশ কয়েক মাস ধরেই গোপনে নতুন মঞ্চ বা নতুন রাজনৈতিক দল তৈরির কাজকর্ম চলছে। অল্প কয়েকদিনেই বিমল বিরোধী মঞ্চ শক্তিশালী হয়েছে পাহাড়ে। এলাকার ছোট-বড় বিভিন্ন অরাজনৈতিক দল, গণসংগঠন বিমল বিরোধী মঞ্চকে সাহায্য করছে। জনসমর্থনও মিলছে প্রচুর। বিমল-বাহিনীকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার সমস্তরকম প্রাথমিক পরিকল্পনা বা 'ব্লু প্রিন্ট' মোটামুটি তৈরি। অনেক বিক্ষুব্ধ মোর্চা নেতাও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। কিন্তু মোর্চা নেতাদের দলে নিতে যথেষ্ট আপত্তি ওই বিমল বিরোধী মঞ্চের। এমনকি হরকা বাহাদুরকে নিয়েও তাঁদের মন্তব্য, 'দুধ খায়-রা মুহ পোশে-কা বিলাই'। যার সোজাসাপটা বাংলা করলে দাঁড়ায়, হরকা বাহাদুর দুধ খেয়ে মুখ মুছে নেওয়া বিড়াল। তাঁদের আরও দাবি, আরও আগে হরকা বাহাদুর যদি মোর্চা ছাড়তেন তাহলে পাহাড় তাঁদের সম্মান করত। কিন্তু তখন তিনি মোর্চা ছাড়েননি। হরকা ক্ষমতালোভী। অর্থলোভী। এখন টাকাপয়সার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে গন্ডগোলের জেরে তিনি মোর্চা ছেড়েছেন। ক্ষমতালোভী বলে বিধায়ক পদ ছাড়েননি হরকা বাহাদুর। তাঁদের আরও দাবি, হরকা বাহাদুর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন শুধুমাত্র ক্ষমতা ও অর্থের লোভে।

ফলে স্বভাবতই একই সঙ্গে প্রশ্ন জাগছে, গৌতম দেব যা পারেননি, রাজেন মুখিয়া যা পারেননি, হরকা বাহাদুর কি তৃণমূলে যোগদান করে পাহাড়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে পারবেন? পাহাড়ের তিন বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের জয় এনে দিতে পারবেন?

পাহাড়ি গ্রামগুলোতে কতখানি জনসমর্থন আছে তাঁর? বিমল গুরুং বা গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিরুদ্ধে পাহাড়ের জনসাধারণের যে ক্ষোভ আছে, তার তালিকায় হরকা বাহাদুরের নামও আছে। বিক্ষুব্ধ মোর্চা নেতারা তাঁকে যতই বাংলার পাহাড়ের আইকন বলুক, বিমল বিরোধী মঞ্চ কিন্তু পাহাড়ি গ্রামে প্রচার শুরু করে দিয়েছে হরকা 'দুধ খায়-রা মুহ পোশে-কা বিলাই'। বিরোধী মঞ্চের দাবি, হরকা বাহাদুর ছেত্রীর মোর্চা ত্যাগ বিমল গুরুং ও তাঁর দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকে যত না বিড়ম্বনায় ফেলেছে, হরকার তৃণমূল যোগদান তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে আরও বড় বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাংলার পাহাড়ের চালচিত্র দার্জিলিঙের রোদ-মেঘের লুকোচুরি খেলার মতোই অনেকটা। গত কয়েক বছরে গোটা দেশ তা-ই প্রত্যক্ষ করেছে। গুরুঙের ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাওয়া-না পাওয়ার বিভাজন প্রকাশ্যে আসছে অহরহ। এই অবস্থায় হরকা বাহাদুরের দলত্যাগ পলতেয় আগুন ধরানোর মতোই। বিস্ফোরণের আওয়াজ মিলতে পারে যে কোনও মুহূর্তেই। কিন্তু একই সঙ্গে এও সত্যি, পাহাড়ে, বিশেষ করে কালিম্পঙের বাইরে হরকা বাহাদুরের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা কতখানি তা যাচাই করে দেখার সুযোগ হয়নি। তৃণমূলে যোগ দিলেও বা তৃণমূলের সমর্থন মিললেও তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার মাপও কেউ জানে না। তাই হরকার দলত্যাগ তৃণমূলের আজকে উৎফুল্ল হওয়ার কারণ হলেও, কালকে পালে সেই হাওয়া কতটা লাগবে তা অনুমান করা যথেষ্ট কঠিন বইকি।

দেব সমুদ্র

বিহারে আধুনিক অস্ত্র ঢুকছে ডুয়ার্স হয়ে ? নির্বাচনের আগে টনক নড়েছে গোয়েন্দাদের !

দিনকাল কি সবই বদলে গেল ? ডুয়ার্সের 'গান করিডর' এখন উলটোমুখী। এতদিন বিহার থেকে বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র আসত ডুয়ার্সে। সেখান থেকে চলে যেত উত্তর-পূর্বে, সীমান্ত পেরিয়ে নেপাল-ভুটান। কেবল জঙ্গিরাই নয়, স্থানীয় ছোট-বড় দুষ্কৃতকারীরাও ব্যবহার করত সেইসব অস্ত্র। তবে আজ সীমান্তের ওপার থেকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র আসছে, ভায়া ডুয়ার্স তা পৌঁছে যাচ্ছে বিহারে এবং সেখান থেকে দেশের নানা প্রান্তে। জঙ্গি অপারেশনের এই 'রিভার্স সুইং' নিয়ে এখন 'ব্রেন স্টর্মিং' চলছে গোয়েন্দা নেটওয়ার্কে।

এখনও সাপের বিষ কাণ্ডের জের মিলিয়ে যায়নি। এখনও পুলিশ ফাইলে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা বাকি। কিন্তু তার আগেই রাজ্য পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে প্রতিবেশী রাজ্য বিহার পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের কাছে খবর, বিহারে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকছে এ রাজ্য থেকে। সূত্রে পাওয়া ওই খবর নির্দিষ্ট করেই জানাচ্ছে, এ রাজ্যের হিমালয়ের পাদদেশে ডুয়ার্স হয়ে ওই অস্ত্র গোপন পথে সংলগ্ন বিহারের কিষানগঞ্জ, কাটিহার, পূর্ণিয়াসহ আরও কয়েকটি জায়গায় পৌঁছচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান থেকে অবাধ অনুপ্রবেশ, জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পারস্পরিক যোগসাজশ, বেআইনি অস্ত্র সমেত গাড়ি আটক, জাল নোটের রমরমা কারবার, চোরাশিকারিদের তাণ্ডব, বেআইনি পাচার থেকে শুরু করে গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ফ্রান্সের গবেষণাগার থেকে খোয়া যাওয়া বুলেটপ্রুফ জারে বন্দি দুষ্প্রাপ্য সাপের বিষ উদ্ধারের মতো ঘটনায় রাজ্য পুলিশ দপ্তরের সব মহলই নাজেহাল। এর উপর ডুয়ার্স হয়ে বিহারে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহর মতো খবরে সত্যিই ঘুম ছুটে যাবার কথা গোয়েন্দা কর্তাদের। যদিও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হোমরাচোমরা পুলিশ কর্তাদের এই খবরের সত্যতা নিয়ে কোনও অফিশিয়াল বিবৃতি মেলেনি। তবে গোয়েন্দা বিভাগের উপরমহল যে নড়েচড়ে বসেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে করা হচ্ছে, তারা তদন্তের স্বার্থেই এখনই খবরটা চাউর করে দিতে চান না।

অস্ত্রের ব্যবহার ও অস্ত্র পাচারে বিহারের কুখ্যাতি পূর্ব ভারত জুড়ে। গোয়েন্দা সূত্রেই জানা যাচ্ছে, উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে সেই বিহারেই ঢুকছে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। আর বলাই বাহুল্য, সেসব অস্ত্রভাণ্ডার সরবরাহ হচ্ছে সীমান্তের ওপার থেকে। আর তা ছড়িয়ে পড়ছে দেশের নানা প্রান্তে। প্রসঙ্গত বলা যায়, মাত্র কয়েকদিন আগেই বিহার বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় রাজনীতির নিরিখে বিহারের এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে

বিহার তথা সমগ্র জাতীয় রাজনীতির বিচার-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণতই অন্য প্রসঙ্গ। আর সে জন্যই অতি সক্রিয় সজাগ গোয়েন্দাদের অ্যান্টেনায় ধরা পড়ছে এই খবর।

সাম্প্রতিককালে ডুয়ার্স এবং ডুয়ার্সের চারপাশের ঘটনা মোটেই নিরাপদ বা উদ্বেগহীন নয়। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাক্রম সামনে আনলে বিহার পুলিশের পাঠানো খবরের সত্যতা যাচাই করা আরও সহজ হয়ে পড়ে। গত বছর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় অসম পুলিশ ওই রাজ্যের চিরাং জেলায় প্রচুর অস্ত্র ভরতি একটি দার্জিলিং নম্বরের গাড়ি আটক করে। সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হয় চালকসহ দুই ব্যক্তি। পুলিশ ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পারে, গ্রেপ্তার হওয়া ওই দুই ব্যক্তির বাস ডুয়ার্সে। তারা এও জানতে পারে যে, ওই অস্ত্রগুলি দার্জিলিঙের কোনও গোষ্ঠীর হাতে যাচ্ছিল। ধৃতদের এই স্বীকারোক্তির ফলে স্বভাবতই অস্বস্তিতে পড়ে রাজ্য পুলিশ। যে পাহাড় শান্ত ও হাসিমুখর, সেখানে নতুন করে অস্ত্র আমদানি করছে কারা ? কারাই বা জোগাচ্ছে ওইসব আগ্নেয়াস্ত্র ? ডুয়ার্সের ওই দুই ব্যক্তির সঙ্গেই বা ওই অস্ত্রশস্ত্রের কী সম্পর্ক ? এ ধরনের প্রশ্ন ঘুমের মধ্যে এক ধরনের আশঙ্কা তৈরি করে দেয়। তাহলে কি পাহাড়ের নিবে যাওয়া আগুনে ঘৃতাহুতি দিতেই ডুয়ার্সের মানুষকে কাজে লাগানো হচ্ছে ? রাজ্য পুলিশের কাছে পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমের এই ঘটনা যতখানি বিড়ম্বনার, তার থেকে কিছুমাত্র কম নয় ডুয়ার্সবাসীর দুশ্চিন্তা। পুলিশ তদন্তে জানতে পারে, শুধু ওই গাড়ি নয়, সঙ্গে ছিল অন্তত আরও তিনটি অস্ত্র বোঝাই গাড়ি। সেগুলির হদিশ শেষ পর্যন্ত মেলে না। তারও চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সেই অস্ত্রগুলি তাহলে গেল কোথায় ? শেষ পর্যন্ত কি তা পাহাড়ে পৌঁছেছিল, নাকি ডুয়ার্সেই ছড়িয়ে গিয়েছিল ?

এর পরের দিন সন্ধ্যায় ফের চিরাং জেলার রুনিখাতাতে দু'টি অস্ত্রবোঝাই গাড়ি আটক করে ওই জেলার পুলিশবাহিনী। এবারও গাড়ির সংখ্যা ছিল চার। দু'টি আটক করা যায় আর দু'টি চম্পট দেয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দু'টি গাড়ি ও চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, অসম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের ডুয়ার্সে আসছিল ওই গাড়িগুলি। চালক ও ধৃতরাও ডুয়ার্সের লোক। তবে তদন্তে জানা যায়, এনডিএফবি-র সংবিহিত গোষ্ঠীর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য ওইসব আগ্নেয়াস্ত্র আসছিল, যেগুলির মধ্যে ছিল এম ১৬ রাইফেল, গ্রেনেড, ম্যাগাজিন ও গুলি। আর ওই গাড়ি দু'টির রেজিস্ট্রেশনও ছিল আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের। যদিও

পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দাদের বক্তব্য, দার্জিলিং পাহাড় হোক কিংবা ডুয়ার্সের জঙ্গল, নতুন করে জঙ্গি কার্যকলাপ শুরু হওয়ার কোনও খবর নেই। কিন্তু যে অস্ত্রবোঝাই গাড়িগুলি পুলিশের চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছিল, সেইসব অস্ত্র কি তবে ডুয়ার্সেই খালাস হয়েছিল? পুলিশের কাছে এতসব কী, কেন, কোথায় প্রশ্নের উত্তর তদন্ত-তল্লাশি-খোঁজখবরসাপেক্ষ। একই সময় অসমের ঢালিগাঁও থানার চাপাগুড়িতে জাতীয় সড়কের উপর থেকে অস্ত্রবোঝাই একটি গাড়ি আটক করে পুলিশ। এ ক্ষেত্রেও কনভয়ে ছিল আরও দু'-তিনটি অস্ত্র ভরতি গাড়ি। কিন্তু পুলিশ তিন ব্যক্তি সমেত একটি গাড়ি আটক করতে সমর্থ হয়। পুলিশের অনুমান, ওই গাড়িগুলির রেজিস্ট্রেশন আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ঠিকানায়। আটক ব্যক্তিদের থেকে এও জানা যায়, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে ওইসব অস্ত্র বোঝাই হয়েছিল।

রাজ্য পুলিশের ঘুম ছুটে গেলেও গোয়েন্দাদের দাবি, ডুয়ার্সে জঙ্গি কার্যকলাপ বা দুষ্কৃতীদের কোনও বড় চক্র নেই। তবে কয়েক বছর আগে কালিম্পঙের গভীর জঙ্গলে 'ইউনাইটেড গোর্খা রেভলিউশনারি ফ্রন্ট' নামে একটি সংগঠন অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া ও ছোট অস্ত্র তৈরির কাজ শুরু করেছিল। 'ইউনাইটেড গোর্খা রেভলিউশনারি আর্মি' নামেও একটি সংগঠনের খবর মিলেছিল পাহাড়েই। প্রাক্তন সিআইএসএফ জওয়ান অশোক দাহালের নামও জড়িয়েছিল ওই জঙ্গি কার্যকলাপে। এর পরবর্তী সময়ে মাঝেমধ্যেই ডুয়ার্সের জঙ্গলে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের ছোটখাটো দলের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। তাদের কাছে ভারত-ভুটান-বাংলাদেশ সীমান্তপথে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও আসছিল বলে খবর আসতে থাকে। পুলিশ খবর পাওয়ামাত্র বহুবারই অভিযান চালায়। কিন্তু দু'-চারজন সন্দেহভাজন বনবাসী ছাড়া আর কেউ, এমনকি কোনও অস্ত্রশস্ত্রও পুলিশের জালে ধরা পড়ে না। তাহলে ওইসব অস্ত্র খালাস হল কোথায়?

পাহাড়ের মতো অশান্তি ডুয়ার্সে না থাকলেও ডুয়ার্স কখনও হয়েছে জঙ্গিদের টার্গেট, কখনও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাঁটি আর সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় পাচারসহ যাবতীয় বেআইনি কার্যকলাপের জন্য বেশ কিছুকালই ডুয়ার্স হয়ে উঠেছে পাচারকারী, চোরাশিকারি আর অস্ত্র ব্যবসায়ীদের মুক্তাঞ্চল। সম্প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য নিরাপত্তা বিভাগের শীর্ষস্থানীয়রা ডুয়ার্সের শান্তিশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই লক্ষ্যে তাঁরা জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির তৎপরতাও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। অসমসহ নাগাল্যান্ড, মণিপুর, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান থেকে অস্ত্র পাচার এবং এনডিএফবি ও কেএলও-র মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির কথাও কবুল করেন। এই দুই জঙ্গি সংগঠন তাদের নিজেদের এলাকায় জনসমর্থন হারিয়েছে বহুদিনই। তাই তারা পার্শ্ববর্তী রাজ্যের কিছু কিছু এলাকায় তৎপরতা জাহির করতে সেখানকার জঙ্গি সংগঠন, পাচারকারী, অস্ত্র ব্যবসায়ীদের শর্তসাপেক্ষ সাহায্য করে পরিবর্তে সেই এলাকায় ঘাঁটি তৈরি করে।

ডুয়ার্সে এ ধরনের কার্যকলাপ যে ক্রমশই বাড়ছে তা স্বীকার করেন এসএসবি-র উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা এও বলেন যে, সীমান্তের ডুয়ার্সে অস্ত্র ব্যবসার মতো আরও নানা ধরনের অবৈধ বা বেআইনি কার্যকলাপ সাম্প্রতিককালে বেড়েছে এবং তা নিয়ে তাঁরা যথেষ্টরকম উদ্বিগ্ন। তাঁরা এও বলেন যে, তাঁরা ভারত-ভুটান সীমান্তকে বহুকাল শান্ত বলেই ভেবেছিলেন। তুলনামূলকভাবে খারাপ অবস্থা ভারত-নেপাল সীমান্তের। কিন্তু ইন্দো-ভুটান ও বাংলাদেশ সীমান্ত যে তাঁদের কপালে রীতিমতো ভাঁজ ফেলছে, সে কথা এখনও মেনে নিতে হচ্ছে। নানা কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে, বিশেষত ডুয়ার্স-ভুটান ও বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় অবৈধ বা বেআইনি কার্যকলাপ বাড়ছে। ২৭ জুন বেলাকোবা রেল গেটে সাপের বিষসহ যে ছ'জন গ্রেপ্তার হল, তদন্তে জানা যাচ্ছে, তারা প্রথমে বাংলাদেশ থেকে বালুরঘাট, সেখান থেকে শিলিগুড়ি হয়ে ডুয়ার্সের মধ্যে দিয়ে ভুটান, তারপর ভুটান থেকে চিনে ওই বিষ পাচারের ছক কষেছিল।

'চিকেন নেক' বলে পরিচিত শিলিগুড়ির ৪০ থেকে ৫০ কিমি পথ পাড়ি দিলে সহজেই পৌঁছনো যায় বাংলাদেশ।
নেপাল-ভুটান-বাংলাদেশ ডুয়ার্স থেকে যেমন সহজে পৌঁছনো যায়, তেমনই শিলিগুড়ি-ডালখোলা দিয়েও সহজে ঢুকে পড়া যায় বিহার। বস্তুতপক্ষে এই রাজ্যে বহু এলাকাতে সামান্য তৎপরতায় নিষিদ্ধ বস্তু পাচার করা পাচারকারীদের পক্ষে কঠিন কাজ নয়। সীমান্ত এবং সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে অপরাধীরা তাদের অবৈধ কার্যকলাপের স্বর্গরাজ্য বিস্তার করবে— এটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া বছরের বেশির ভাগ সময়েই ডুয়ার্সে পর্যটকদের আনাগোনা। সেদিক থেকেও ডুয়ার্স অস্ত্র ব্যবসায়ী ও পাচারকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক স্থান। পাচার কর্মকাণ্ডের জন্য ডুয়ার্স শুধু জাতীয় স্তরের নয়, আন্তর্জাতিক স্তরের অস্ত্র ব্যবসার ঘাঁটি।

২০১৬ সালে ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড হয়ে যে এশিয়ান হাইওয়ে মহাসড়কটি চালু হতে চলেছে, তাতে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়িসহ সমগ্র ডুয়ার্সের গুরুত্ব যে বহুগুণ বাড়বে, কোনও সন্দেহ নেই। যোগাযোগব্যবস্থাও অনেকটা সুগম হবে। কিন্তু তার সুফল পর্যটক, ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ যেমন পাবেন, তেমনি সেই সুবিধাজনক পরিস্থিতিকে নিশ্চয় কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে অবৈধ ও বেআইনি কাজে লিপ্ত সমস্ত স্তরের অপরাধীরাই। কিন্তু সেই অপরাধ প্রতিরোধ করতে যথোপযুক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা কী? তা কি পাচারকারী বা অস্ত্র ব্যবসায় যুক্ত অপরাধীদের অজানা?

পুর ভোটের আগে নবান্ন সচিবালয়ে রাজ্য প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা। পরবর্তী সময়ে এই মর্মেই বৈঠক করেন কেন্দ্র-রাজ্য নিরাপত্তা দপ্তরের শীর্ষস্থানীয়রা। মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ও তাদের কার্যকলাপের পন্থা। পুলিশ প্রশাসন জোর দিয়েছিল নিরাপত্তাব্যবস্থায় ডুয়ার্সসহ উত্তরবঙ্গ জুড়ে। আলোচনায় স্বভাবতই উঠে আসে জঙ্গি সংগঠন, তাদের সহায়ক শক্তি ও অস্ত্র জোগানদারদের কথা। কেন্দ্র ও রাজ্য নিরাপত্তা বিভাগের শীর্ষকর্তারা উল্লেখ করেন সংলগ্ন রাজ্য বিহার-অসমসহ নাগাল্যান্ড, মণিপুরের কথা, সেখানকার অস্ত্র ব্যবসায়ী তথা অস্ত্র পাচারকারীদের তৎপরতা। কথা হয় জোরদার করা হবে নিরাপত্তাব্যবস্থা। জঙ্গি সংগঠন থেকে শুরু করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি, অস্ত্র ব্যবসায়ী তথা জোগানদারদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার সিভিক পুলিশ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার।

বোঝাই যায়, ডুয়ার্সসহ উত্তরবঙ্গে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। আর তৈরি যে হচ্ছে তা স্পষ্ট হয় রাজ্য পুলিশের ব্যস্ততা লক্ষ করলে। রাজ্য পুলিশ কর্তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ, পুরনো অস্ত্র কারবারীদের সহায়তায় প্রোমোটারি, সিন্ডিকেট, দালালি ইত্যাদি ব্যবসায় যুক্ত কেউ কেউ এখন বেআইনি অস্ত্রের কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সেই সূত্র ধরেই গজিয়ে উঠেছে নতুন নতুন আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের গ্যাং। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মাল, কোচবিহার পুর ভোটের আগে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও, ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে পুলিশ ছোট-বড় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। তখনই তা ছিল খুব দুশ্চিন্তার কারণ। যে ধরনের অস্ত্র তখন পুলিশ উদ্ধার করেছিল তা নিছক চুরি-ডাকাতি বা গোষ্ঠী সংঘর্ষে ব্যবহারের জন্য নয়। অস্ত্র কারবারের সঙ্গে ধৃতরা পুলিশের জেরায় জানায়, ওইসব অস্ত্র যাদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল, তারা ডুয়ার্সেরই ক্যারিয়ার। তাদের ছদ্মনাম ছাড়া আর কিছুই ধৃতদের থেকে জানা যায়নি। এর ফলেই সমস্যা আজ এত দূর গড়িয়ে এসেছে। অস্ত্রকারবারীদের ওই চক্রের লিঙ্কম্যানদের খোঁজেই এখন পুলিশ মরিয়া।

ব্রততী ঘোষ

ডুয়ার্সের দেবী বন্দনা নানা রূপে দশভূজা

রাজবাড়ির ঠাকুরদালান থেকে জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামের উঠান কোথাও দেবী রক্তবর্ণা ভয়ালদর্শনা কোথাও আবার আটপৌড়ে শাড়িতে রাজবংশী গ্রাম্য কন্যা। দেবী রূপই যে শুধু ভিন্ন তা নয়, আরাধনা রীতিনীতিতেও রয়েছে বিস্তর ফারাক। শতাব্দী অতিক্রান্ত এই পুজোগুলি আজও ডুয়ার্সের ইতিহাস ঐতিহ্য।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কোচবিহারের বড়দেবী পুজো

বঙ্গদেশে প্রাচীন দুর্গাপুজো বলতে তাহেরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ ১৫৮০ সালে যে দেবীবন্দনার সূচনা করেছিলেন, তাকেই হিসেবে ধরা হয়। তবে কোচ-কামতা পরবর্তীতে কোচবিহার নামক ভূখণ্ডকে যদি ওই হিসেবে রাখা হয়, তবে নিশ্চিতভাবেই বড়দেবী-বন্দনাই বাংলার প্রাচীনতম দুর্গাপুজো। ইতিহাস অনুসারে কোচ রাজা নরনারায়ণ ১৫৬২-তে সংকোশ নদীর অদূরে চামটা গ্রামে সাড়ম্বরে এই পুজোর আয়োজন করেন। সেই থেকেই কোচবিহারের রক্তবর্ণা এই দেবীবন্দনার সূচনা। রাজা স্বপ্নাদিষ্ট দেবীরূপ দেখে ভেবেছিলেন, হয়তো অতসীকুসুমাকার বর্ণে রঞ্জিত দেবী রক্তবর্ণ হলে ভাল হয়। তার থেকেই রক্তবর্ণা দুর্গাবন্দনার প্রচলন। হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে দেবী আরাধনায় সব থেকে আগে যে পুজোটির কথা বলতে হয়, সেটি হল কোচবিহারের বড়দেবী বাড়ির দুর্গাপুজো। কোচ রাজবংশের আদিপুরুষ বিশ্বসিংহের ইতিহাসে চোখ রাখলে শক্তিপুজো থেকে শুরু করে বড়দেবীর মূর্তি ও পুজোর অদ্ভুত কাহিনি জানা যায়। সেই কথা-কাহিনি বহুশ্রুত। শুধু দেবীবাড়ির প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সিংহ নয়, দুর্গা বসে আছেন বাঘের উপর। উধাও দেবীর শান্ত, সৌম্য রূপ। দশপ্রহরণধারিণী ভয়ালদর্শনা। বসনের রঙেও অভিনবত্ব। দেবীর সংসারে গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী নয়, দুই পাশে জয়া ও বিজয়া। ১২ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মূর্তি বিশ্বকে দেখছেন সংহার রূপে।

পুরনো কোচবিহার রাজ্য থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে বড়দেবীর মন্দির। সারা বছর কোনও পুজোআচ্চা না হলেও, দেবীবাড়ি বলে সমধিক পরিচিত দেবস্থানের উপর কোচবিহারবাসীর অপরিসীম শ্রদ্ধা। তবে সাধারণ মানুষ বড়দেবীর দর্শন এবং তাঁর উদ্দেশে নিবেদনের সুযোগ পান বছরে মাত্র চার দিন— সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত। আমজনতার পুজো বছরে মাত্র চার দিন পেলেও দেবী আরাধনা শুরু হয়ে যায় শ্রাবণ মাসের শুক্লা অষ্টমী থেকে। সে দিন ময়না গাছের কাঠ কেটে প্রতিমার কাঠামো তৈরি হয়। পুজোও শুরু সে দিন থেকে।

পুজোর অন্যতম অনুষঙ্গ পশুবলি। পায়রা থেকে পাঁঠা, মোষ, শোল মাছ তো আছেই, বলির তালিকায় আছে শুয়োরও। তা ছাড়া বলি দেওয়া হয় কুমড়ো। বলি চলে রোজ। এক সময় নরবলিও প্রচলিত ছিল। প্রতীকী নরবলি এখনও চালু আছে। সন্ধিপুজোর সময় ওই প্রতীকী বলি হয়, কিন্তু সাধারণের দেখা নিষেধ। বাঁশের কুলোয় চালের গুঁড়ো দিয়ে আঁকা হয় মানুষের আদল। সেই আদলকেই দেওয়া হয় বলি। কিন্তু তাতেও দরকার হয় রক্তের। মানুষের লাল রক্তের। বংশপরম্পরায় একটি পরিবারের সদস্য আঙুল চিরে ওই রক্ত দেয়।

কোচবিহারের বড়দেবী-বন্দনায় বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আজও পালিত হয়। আজও তুফানগঞ্জ মহকুমার চামটা গ্রাম থেকে মাটি সংগ্রহ করে তা মূর্তি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। মাটি সংগ্রহের সময় লৌকিক প্রথা অনুসারে লাল ও সাদা ফুল দিয়ে পুজো করা হয়। চিত্রকররা হন সেই পুজোর পুরোহিত। পুজোর উপকরণ হিসেবে একজোড়া পায়রা বলি দেওয়া হয়। তার আগে কৌমসংস্কৃতির বৃক্ষপুজোর অনুকরণে ময়না গাছের ডাল সংগ্রহ করে তাকে শক্তিগোঁজ হিসেবে পুজো করা হয়। একে যূপকাষ্ঠ বলে। ওই পুজো শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমীর দিন শহরের উত্তর দিকে ভাঙড় আইঠাকুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে তা মদনমোহন বাড়িতে এনে এক মাস ধরে রোজকার পুজোর পর যূপকাষ্ঠ রাধাষ্টমীর দিন মঙ্গলবাদ্য সহকারে দেবীবাড়িতে আনা হয়। ওই দিন মদনমোহন বাড়ি থেকে কোচ রাজবংশের রাজদণ্ড-হনুমানদণ্ড দুয়ারবকশি বা দ্বারবকশিদের তত্ত্বাবধানে মঙ্গলবাদ্য সহযোগে দেবীবাড়ি আনা হয়। এর পর ময়না গাছের ডালকে শক্তিগোঁজ হিসেবে রেখে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়।

মহালয়ার দিন দেবীর চক্ষুদান হয়। তারপর শুক্লা প্রতিপদের দিন দেবীর কল্পারম্ভ। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় রাজগুরুর বাড়িতে গিয়ে দুয়ারবকশি মহাশয় জোড়া বেল স্পর্শ করতেন। একজোড়া বেল যেত মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির ‘কাঠামিয়া’ মন্দিরে দুর্গাপুজোয়, আর বাকি বেল নিয়ে তিনি আসতেন

এক সময় নরবলিও প্রচলিত ছিল। প্রতীকী নরবলি এখনও চালু আছে। সন্ধিপুজোর সময় ওই প্রতীকী বলি হয়, কিন্তু সাধারণের দেখা নিষেধ। বাঁশের কুলোয় চালের গুঁড়ো দিয়ে আঁকা হয় মানুষের আদল। সেই আদলকেই দেওয়া হয় বলি। কিন্তু তাতেও দরকার হয় রক্তের।

দেবীবাড়িতে। তারপর বেলবরণ সম্পন্ন হত।

সপ্তমী পুজোর দিন ঘটস্থাপন ও অন্যান্য পুজো হয়। কিন্তু অষ্টমী পুজোয় বিরাট সমারোহ ও জনসমাগম হয়। যদিও ষষ্ঠীর দিন থেকেই মেলা বসে যায়। অষ্টমী পুজোর বিশেষ আকর্ষণ মোষবলি। তা দেখতে প্রচণ্ড ভিড় হয়। এ ছাড়াও ছাগল, পায়রা ইত্যাদি বলি হয়। অনেকে প্রচুর পায়রা ছেড়ে দেয় দেবীর সামনে। দর্শনার্থীরা বাতাসা, মিছরি দেবীকে দেন। সেগুলো আবার নেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দোকানিরা নানা জিনিস বিক্রি করেন, যাতে এই বাতাসা প্রধান। মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সময় তিনি নিজে হাতে হাজার হাজার বলি দিতেন। একবার এক বাঘ ধরে এনে মায়ের সামনে বলিদান করেন। এই দিন ‘হনুমানদণ্ড’কে আবার নিয়ে আসা হয়। সারাদিন থেকে গভীর রাতে তা আবার মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে ফিরে যায়। গভীর রাতে ‘নিশাপুজো’ বা ‘গুপ্তপুজো’ হয়। এই পুজো কেউ দেখতে পারে না, কেবল দুয়ারবকশি, পুরোহিত ও ‘কামসেনাইত’ ছাড়া। এই সময় পাশে ‘চালিয়াবাড়িয়া’ পুজো নামে

কৃষকসমাজের প্রতিনিধি একটি পুজো করে থাকেন। এখানে শুয়োরবলি হয়। আগেকার দিনে এই দিন রাজসিংহাসন পুজো হত দেবী মন্দিরের পেছনের ঘরে। তারপর তা দেখার জন্য জনগণের সামনে খুলে দেওয়া হত। আজ তা হয় না। নবমীর যাগযজ্ঞ শেষে দশমী পুজোর দিন দেবীবাড়ি থেকে ঘট এনে রাজবাড়িতে 'অপরাজিতা' পুজো করা হত। রাজসিক এই পুজো উপলক্ষে মন্ত্রী, রাজকর্মচারী উপস্থিত থাকতেন। রাজতোশাখানা খুলে বহুমূল্য অস্ত্র, সোনার তরোয়াল, ঢাল, বল্লম, রাজকীয় নানা প্রতীক ইত্যাদি পুজো করা হত। পুজো শেষে কাঠামিয়াদেবী, বড়দেবীকে কোচ রাজাদের রাজকীয় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা আজও প্রণামি দেওয়া হয়। আগের দিনে রাজা পাটহাতির পিঠে চড়ে খঞ্জন পাখি ছাড়তেন। পাখি যেদিকে উড়ে যেত, রাজা সেদিকেই যুদ্ধযাত্রা করতেন। অনেক সময় মহারাজারা সেদিকে শিকারেও যেতেন। সে প্রথা উঠে গিয়েছে। তবে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর কোচবিহারে যে 'দশহারা' উৎসবের প্রচলন করেছিলেন তা স্বাধীনতার পরেও এক বছর চলেছিল। ওই দিন উৎসব ও শোভাযাত্রা হত। 'নারায়ণ গার্ড', কোচবিহার রাজ্য রাজকীয় পুলিশ ব্যান্ড, সেন ব্যান্ড, সুসজ্জিত হস্তিবাহিনী, আমবাড়ি হাওদায় সাজানো পাটহাতি শোভাযাত্রায় অংশ নিত। সাগরদিঘির পাড়ে উপস্থিত হয়ে শোভাযাত্রা করে বড়দেবী ও কাঠামিয়া দুর্গা তোর্সা নদীর পাড়ে বিসর্জন হত। মহারাজা সবকিছুর নেতৃত্ব দিতেন। এক বিরাট উৎসব হত সে দিন। আজ বড়দেবীকে যমুনাদিঘিতে বিসর্জন দেওয়া হয়। কোচবিহারের রাজকীয় দুর্গাপুজো প্রথামাফিক সমাপ্ত হয় জগদ্ধাত্রীপুজোর অষ্টমীর দিন 'বামাপুজো' বা 'অস্ত্রপুজো'র মধ্য দিয়ে।

আজ আর রাজার রাজত্ব নেই। গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ, তাদের ভক্তি, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সমান গৌরবে বেঁচে আছে এই পুজো। স্থানীয় ও দূর-দূরান্তের মানুষের সমাগমে তা বোঝা যায়। নিম্ন অসম, উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলা থেকে মানুষ ভিড় করে পুজোর দিনগুলিতে। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনজাতি কোচ, মেচ, রাভা ইত্যাদি মানুষ এই পুজোয় অংশ নেন। অপলক নয়নে মা যেন সবাইকে দেখেন। সকলের মিলনে এই দেবী শুধু আর্য সংস্কৃতির দেবী দুর্গা থাকেন না, হয়ে ওঠেন অনার্যদের আদিবাসী মা। তাদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, আনন্দ, বেদনার ধারক ও বাহক তিনি। তাঁকে কেন্দ্র করেই বেজে চলেছে এই অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছন্দ। তাই কোচবিহারের বড়দেবী আরাধনা আজ আর রাজকীয় পুজো নয়, হয়ে উঠেছে এক বৃহৎ মিলনমেলা।

সূর্যশেখর চক্রবর্তী

মদনমোহন বাড়ির কাঠামিয়া পুজো শুরু বিল্ববরণ দিয়েই

সময়টা ৪ মে ১৮৯১ সাল। কোচবিহারের তদানীন্তন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে বর্তমান মদনমোহন মন্দিরটির উদ্বোধন করেন রাজমাতা নিশীময়ী দেবী। দূরে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাভরে অবলোকন করেন নৃপেন্দ্রনারায়ণ, কেননা ইতিমধ্যেই তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। এরও বেশ কয়েক বছর পর দুর্গাপুজোর জন্য বর্তমান মণ্ডপটি নির্মিত হয়। আর সেখানেই শুরু হল একটিমাত্র কাঠামোতে মায়ের চার সন্তান, তাঁদের বাহন, অসুর, সিংহ বা মহাদেবের সহাবস্থান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৮৯ সালে টিনের চালায় প্রথমে মদনমোহন মন্দির তৈরি হয়।

এখন প্রশ্ন হল, কোচবিহারের মদনমোহন বাড়ির দুর্গাপুজোকে 'কাঠামিয়া দুর্গাপুজো' কেন বলা হয়? এ প্রসঙ্গে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের প্রথিতযশা গবেষক ও ঐতিহাসিক ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল বলেন, 'কোচবিহার জেলার প্রথম কোনও পুজোয় একটি কাঠামোতে দুর্গাপুজো হয় মদনমোহন বাড়িতে। আর তাই লৌকিকভাবে এটি কাঠামিয়া দুর্গাপুজোয় আখ্যায়িত হয়েছে।' অর্থাৎ বাংলার অন্যান্য প্রান্ত বা আরও আগে পূর্ববাংলায় একচালা বা এক কাঠামোয় দুর্গাপুজো হলেও, কোচবিহারের প্রথম এক কাঠামো পুজো মদনমোহন বাড়ির দুর্গাপুজো।

শুধু নামেই নয়, পুজোর আচারেও কাঠামিয়া পুজো ভিন্নতার পথে চলেছে যুগ যুগ ধরে অনেক ক্ষেত্রেই। যেমন ষষ্ঠী পুজোর দিন 'বিল্ববরণ'-এর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় মায়ের পুজো। ষষ্ঠীর সকালে চারটি বেলকে শোধন করে যথাবিহিত আচারের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয় শহর ছাড়িয়ে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে বাণেশ্বরের মন্দিরে। সেখানে বিভিন্ন আচার ও ক্রিয়াকর্মের পর বিকেলে ফের মদনমোহন বাড়িতে বেলগুলো ফেরত আসে। দুটো বেল মদনমোহন বাড়িতে রেখে বাকি দুটো বেল পাঠিয়ে দেওয়া হয় দেবীবাড়িতে বড়দেবীর মন্দিরে। সেখানে মহারাজা নরনারায়ণের স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী অনেকটাই ভিন্ন রূপে-সাজে মাতৃপুজো সমাপন হয়। আর এই বেলগুলোকে 'মাতৃস্তন'রূপে মায়ের মূর্তির ডান বা দক্ষিণ পাশে রেখে লাল কাপড় ও সিঁদুরে সজ্জিত করা হয়। সেই সঙ্গে ন'টি গাছ, যেমন— কলা, বেল, অশোক, জয়ন্তী, আদা, কচু ইত্যাদির সাহায্যে তৈরি হয় 'নবপত্রিকা'। এ ক্ষেত্রেও রয়েছে অন্যান্য পুজোর সঙ্গে অনেকটাই ভিন্নতার ছোঁয়া। অধিকাংশ দুর্গাপুজোতেই যেখানে একটি ঘট স্থাপন করে তাতে সপ্তমী, অষ্টমী বা নবমী পুজো সাঙ্গ করা হয়, কাঠামিয়া দুর্গাপুজোতে প্রতিদিন নতুন করে ঘট স্থাপন করা হয়, তিন দিনই হয় যজ্ঞ, তিন দিনই হয় পশুবলি ও প্রসাদ বিতরণ।

এক আবেগমেদুর পরিমণ্ডলে রাজ আমল থেকে কোচবিহার মদনমোহন বাড়িতে কাঠামিয়া দুর্গাপুজো হয়ে আসছে মহাসমারোহে। হাজার হাজার মানুষের ভিড় উপচে পড়ে পুজোর দিনগুলোতে জেলা সদরের এই মণ্ডপে। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রাহ্মণদের নিয়ে এসেছিলেন রাজ প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মন্দিরে পুজোআচ্চার জন্য, যেমন কনৌজি, মৈথিলি প্রমুখ। দশ পুরুষ ধরে মদনমোহন বাড়ির দুর্গাপুজো করে থাকেন কনৌজি ব্রাহ্মণরা। বিগত ১৪ বছর যাবৎ কাঠামিয়া দুর্গাপুজো করে চলেছেন কনৌজি ব্রাহ্মণ খাগোপতি মিশ্র। কাঠামিয়া পুজোর বিবরণ দিতে গিয়ে বহু অতীত হাতড়ে আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েন সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খাগোপতি! চোখের কোণগুলি ওঁর নিজের অজান্তেই চিকচিক করে ওঠে, বেরিয়ে আসে স্বগত উক্তি, 'মা আসছেন...!'

দিব্যেন্দু ভৌমিক

রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

এই দুর্গার হাতে ত্রিশূলের পরিবর্তে শূল বা বল্লম জাতীয় একটি অস্ত্র এসে অসুরের বক্ষদেশকে আঘাত করেছে, মহিষের ছিন্ন মস্তক বেদিতে রক্ষিত, এই মহিষের মুণ্ডু থেকে যমরাজের সৃষ্টি কিন্তু দেখা যায় না।

রায়কত বংশের প্রাসাদে রক্ষিত প্রাচীন মূর্তিতে কার্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী অর্থাৎ মায়ের ছেলেমেয়েরা শোভা পেত না। কিন্তু বর্তমানে তারাও স্থান পেয়েছে মায়ের সঙ্গে একই স্থানে আরাধনায়। তাদের সঙ্গে আরও কিছু মূর্তি রয়েছে, তারা হল— জয়া-বিজয়া, মহাদেব, ব্রহ্মা ও মেছেনি মূর্তি। রাজবাড়ির গৃহদেবতা বৈকুণ্ঠনাথ ও দশভুজা ভগবতী একই আসনে অধিষ্ঠিতা। দেবী নানা অলংকারে ভূষিতা। দেবীর সুশ্রী মুখটি ডিম্বাকৃতি, চোখ দু'টির উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন পৃথিবীর সমস্ত কোণে শান্তির বার্তা পৌঁছে দেয়। তৃতীয় নেত্রটি স্পষ্ট। দেবী জটাধারী। সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দুর্গার মূর্তি কিন্তু অত্যন্ত প্রাচীন। কিন্তু ব্যাঘ্রবাহনা দুর্গার কোনও উল্লেখ শাস্ত্রে নেই। শুধু বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত বংশেই নয়, কোচবিহার রাজবংশ এবং উভয় রাজবংশের উত্তরাধিকারীরা যাঁরা পরবর্তীকালে দরং, বিজনি, সিডলি, পাঙ্গা ইত্যাদি স্থানে রাজ্য গঠন ও শাসন করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ব্যাঘ্র ও সিংহবাহনা দেবী দুর্গার পূজা করতেন। রাজবাড়ির দুর্গাপ্রতিমা রক্তবর্ণা। তবে আস্তে আস্তে রংটি ফিকে হয়ে পড়ছে। প্রতিমাটি একচালা। এক চালের মধ্যে দেবী দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দেবদেবীর বাহনগুলি অবস্থিত। যে পাটাতনে দেবী দুর্গা আসীনা এবং একচালাটি গড়ে ওঠে, সেটি একটি রথ। এই রথের চারটি চাকা থাকে। এই রথের কাঠ হল ময়না কাঠ, যা বৈকুণ্ঠপুর অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু বর্তমানে এই ময়না কাঠের পরিবর্তে অন্য কাঠও ব্যবহৃত হয়। তবে রাজা প্রসূনদেব রায়কত বংশের চিরাচরিত ধারা অনুসারে এ বছরও রথের উপর মূর্তি তৈরি করেছেন সুদূর কৃষ্ণনগর থেকে আসা মৃৎশিল্পী মনোজিৎ দাস। সেই জন্মাষ্টমীর দিন থেকে শুরু হয় পুজোর প্রস্তুতি। এক-দুই বছর নয়, একশো বা দু'শো বছরও নয়, পাঁচশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই নিয়মরীতিতে চলছে জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো। আদতে রাজবাড়ির পুজো হলেও, পাঁচ শতকেরও বেশি সময় ধরে জলপাইগুড়িবাসীর আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রস্থল এই রাজবাড়ির পুজো। সময়ের হিসেবে ৫০৬ বছরে পা দিল।

কেবলমাত্র মূর্তি তৈরির বংশপারম্পর্য অনুযায়ী কারিগর নয়, মূর্তি তৈরির উপকরণ বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও চলে আসছে সেই বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের অভ্যাস। রাজপরিবারের এই পুজোয় মূর্তির কাজ সম্পূর্ণ হয় সপ্ততীর্থের জল এবং সপ্ততীর্থের মাটি দিয়ে। সেইমতোই রাজার উত্তরাধিকারীরা পৌঁছে যান সপ্ততীর্থের জল ও মাটি সংগ্রহে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাজপরিবারের কুলপুরোহিত শিবু ঘোষালের কথা থেকে জানা যায়, হরিদ্বার, বারাণসী, যমুনা, পুরীর মতো তীর্থস্থান থেকে জল-মাটি নিয়ে এসে প্রতিমা তৈরি হয়। রাজবাড়ির পুজোয় ঐতিহ্যের এই ধারাবাহিকতা আজও বহাল। সময় বদলেছে। দ্রুত পালটে গিয়েছে চারপাশ। কিন্তু নিয়মকানুন বজায় রাখার একটা চেষ্টা এখানে রয়েছে।

রাজপরিবারের অষ্টধাতুর দুর্গামূর্তিকে মহালয়ার দিন সপ্ততীর্থের জল ও মাটি দিয়ে স্নান করানো হয়। এই রীতি অন্য সব দুর্গাপূজার থেকে একেবারে ভিন্ন। কারণ, অন্যান্য পরিবারের পুজোয় দর্পণের মাধ্যমে প্রতিমাকে স্নান করানো হয়। এ দিনই বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দেবীমূর্তির চক্ষুদান হয়। পরানো হয় নতুন কাপড়। মহালয়ার রাতে এ বাড়িতে রয়েছে কালীপুজোর রেওয়াজ। রয়েছে নন্দ উৎসব। নারকেল, চালকুমড়ো, কলা, মোসাম্বি, দই, মাটি মিশিয়ে চলে কাদা খেলা। রাজবাড়ির উত্তরাধিকারী প্রণতকুমার বসুর বর্তমান প্রজন্ম সৌম্য বসুর থেকে জানা গেল, ওই নন্দ উৎসবের মাটিও তুলে রাখা হয়। প্রতি বছর অষ্টমীর সকালে কুমারীপুজো হয়। সেই পুজোয় শুধু রাজপরিবারের উত্তরাধিকারীরাই নয়, অংশ নেয় জলপাইগুড়ি জেলার বহু মানুষ।

দশমীতে আজও দর্পণ বিসর্জন হয়ে থাকে। দশমী সমাপন হলে মূর্তিসহ রথ টেনে নিয়ে যাওয়া হয় রাজবাড়ি সংলগ্ন শাপলা ফুল ফোটা অপরূপ সুন্দর দিঘিতে। সেখানে মহাসমারোহে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। যে রথে প্রতিমা অধিষ্ঠিতা, সেই রথটির দুই ধারে পুরু রশি বাঁধা থাকে, উপস্থিত সকল মানুষের ভালবাসার হাত সেটিকে টেনে নিয়ে যায় নিরঞ্জনের পথে। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় প্রতিমার অঙ্গে যে অতিরিক্ত স্বর্ণালংকার থাকে, মহার্ঘ বস্ত্রাদি দ্বারা শোভিত করা হয়, তা খুলে নেওয়া হয়। তারপর বিরাট প্রতিমাগুলি একে একে তলিয়ে যায় দিঘির বুকে। শান্তির জলের জন্য মানুষের ঢল এগিয়ে আসে দিঘির চতুর্ধারে। কেউ কেউ ফ্রেমবন্দি করে রাখতে চায় মায়ের কান্নাভেজা মুখ, আবার কেউ প্রণাম করে বিদায় জানায় মাকে, 'পরের বছর আবার এসো মা'— এই বলে। দিঘির বুকে জলের আলপনাগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে ক্ষণিক সময়ের জন্য। আবার কিছুক্ষণ পর স্থির হয়ে যায়, থমকে যায় হঠাৎ সমস্ত কিছু। সবার বাড়ি ফেরার পালা, পথে যেতে যেতে আবার বিষণ্ণ মুখে মিষ্টির ছোঁয়া ভুলিয়ে দেয় প্রতিটি দুঃখ মাখা মুখের বিষণ্ণতা।

উইনি রায়

রাজবংশী মেয়ের বেশে দেবী দুর্গা

চ্যাপটা নাক, পটলচেরা চোখ, একেবারে জৌলুসহীন সাজপোশাক, গড়নও অতি সাধারণ এক গ্রাম্য মেয়ের। বলা ভাল, এই রূপ এক রাজবংশী কন্যার। দু'শো বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজবংশী কন্যাই দেবী দুর্গা হিসেবে পুজো পেয়ে আসছেন। ১৮১০ সাল থেকে মা দুর্গার এই আদল দেখে আসছেন জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি এলাকার মানুষ। আর সেই সঙ্গে এতগুলি বছর ধরে নিষ্ঠা আর ভক্তিভরে অসুরনাশিনীর পুজো করে আসছে আমগুড়ির বসুনিয়া পরিবার, হিমালয়ের পাদদেশে বৈচিত্রে ভরা এক স্বতন্ত্র মাঠে। এখানকার আকাশের রং যেমন সৌন্দর্যময়, তেমনই বিস্ময়কর এর সবুজের সমাহার। নদ-নদী-পাহাড়-জঙ্গল-চা-বাগিচা ঘেরা জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে প্রাচীন আদিবাসী, জনগোষ্ঠী। ওইসব মানুষের প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। বলা বাহুল্য, এত ধরনের মানুষ, এত ভাষা, এত ধরনের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কারণেই এই অঞ্চল বৈচিত্রময় এবং স্বতন্ত্র। প্রাচীন আদিবাসী-জনজাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতির হাত ধরেই জেলার নানা প্রান্তে বহুকাল ধরে নানা নামে, নানা আঙ্গিকে মা দুর্গার অধিবাস হয়ে আসছে। কোথাও বনদেবী, কোথাও আবার ভান্ডানি। আসলে তিনি সিংহবাহিনী, দশপ্রহরণধারিণী। নামে বা রূপে ভিন্ন হলেও, পূজাপদ্ধতি বা রীতির তারতম্য থাকলেও, দেবী দুর্গারই আরাধনা করে আসছেন জেলার মূলবাসী মানুষজন। ঠিক যেমনভাবে বিগত দু'পুরুষ ধরে রাজবংশী কন্যা রূপে মা দুর্গাকে বরণ করে আসছে আমগুড়ির বসুনিয়া পরিবার। কালের প্রবাহে

হরিদ্বার, বারাণসী, যমুনা, পুরীর মতো তীর্থস্থান থেকে জল-মাটি নিয়ে এসে প্রতিমা তৈরি হয়। রাজবাড়ির পুজোয় ঐতিহ্যের এই ধারাবাহিকতা আজও বহাল। মহালয়ার দিন বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দেবীমূর্তির চক্ষুদান হয়।

আজ আর সেই জৌলুস নেই। আমগুড়ি বসুনিয়া পরিবারের অবস্থাও বর্তমানে অনেকটাই পড়তি। কিন্তু পুজো ঘিরে রাজবংশী সমাজের সহজ-সরল লোকাচার কিংবা নিষ্ঠার আবেদনে কোনও খামতি নেই। আগের মতোই দেবী আরাধনায় এবং তার আয়োজনে কোনও ফাঁক রাখেন না পরিবারের সদস্যরা।

বসুনিয়া পরিবারের এখনকার প্রজন্মের কথা থেকেই জানা যায়, ১৮১০ সালে এই পুজোর প্রথম আয়োজন করেছিলেন সেই সময়ের জোতদার ধনবর বসুনিয়া। অরণ্যময় এই অঞ্চলে সেই সময় ময়নাগুড়ি বলে কোনও জায়গার অস্তিত্ব ছিল না। অবশ্য এই এলাকার নাম ময়নাগুড়ি নিয়ে এবং তখনকার স্থাননাম ঘিরেও বিতর্ক রয়ে গিয়েছে। অধিকাংশের মত, ময়নাগুড়ি সেই সময়ও ছিল জনবসতিপূর্ণ। তবে ২৬টি তালুক নিয়ে গঠিত সেই অঞ্চলের নাম ছিল চাপগড় পরগনা। ময়নাগুড়ির ইতিহাস বা ভূগোল আলোচনা সম্পূর্ণতই ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে বলা দরকার, বসুনিয়া পরিবারের একটি পারিবারিক দলিলে চাপগড় পরগনা কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। যা-ই হোক, ফিরে আসি পুজোর কথায়। কীভাবে শুরু হল এই পুজো? জনশ্রুতি, ব্যবসায়ী ধনবর দেবী দুর্গার স্বপ্নাদেশ পেয়েই নাকি দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ধনবরের পুত্র তথা তৎকালীন ভুটান রাজার খাজাঞ্চি মুসব্বর বসুনিয়ার প্রতিপত্তি আরও বাড়ে। এলাকায় পারিবারিক প্রতিপত্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বসুনিয়া পরিবারের দুর্গাপুজোর জাঁকজমকও বাড়তে থাকে স্বাভাবিকভাবেই। পরিবার সূত্রে জানা যায়, একেবারে শুরুর দিকে রংপুর, অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত থেকে নিয়ে আসা হত দুর্গাপ্রতিমা। সেই পুজো যিনি সম্পন্ন করতেন অর্থাৎ পুরোহিত, তিনিও আসতেন সুদূর অসম থেকে। এমনকি পুজোর সময় যারা ঢাক ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজাত, তারাও আসত অসম থেকে। এইভাবে বসুনিয়া পরিবারের দুর্গাপুজোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ময়নাগুড়ি ছাড়িয়ে দূরের অন্যান্য গ্রামের মানুষও আসত আমগুড়িতে। তবে তখন থেকেই পুজো হয়ে আসছে পুরোপুরি রাজবংশী সমাজের রীতিনীতি অনুসারে।

বসুনিয়া পরিবারের দুর্গাপুজোর প্রতিমা বেশ কয়েক বছর ধরেই আর রংপুর থেকে আসে না। এখন পুজো করতে কিংবা ঢাক বাজাতেও আর পুরোহিত বা ঢাকিরা আসে না অসম থেকে। আমগুড়ির বাসিন্দারাই এখন পুরোহিত ও ঢাকি। কিন্তু পুজোয় রাজবংশী সমাজের প্রভাব রয়ে গিয়েছে ঠিক আগের মতোই। বসুনিয়া পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম সুনীল বসুনিয়ার কথা অনুসারে, চিরাচরিত নিয়মানুসারে বসুনিয়া পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা রাজবংশী সাধারণ কন্যার আদলেই তৈরি করা হয়। গায়ের রং আগের মতোই রক্তাভ। পুরনো প্রথা অনুযায়ী দেবীর মাথায় শোভা পায় 'শেয়ারা'। আগেকার রাজবংশী সমাজে বিয়ের সময় মেয়েরা যে মুকুট মাথায় পরত তা হল শেয়ারা। দেবীর অঙ্গে থাকে সাধারণ গ্রাম্য রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় আটপৌরে ছাপা শাড়ি। রাজবংশী সমাজের নিয়ম মেনেই দেবীর আরাধনার আগে 'গ্রামঠাকুর'-এর পুজো করা হয়। এই গ্রামঠাকুর হল শিব। অনেককাল আগে এই পুজোয় দেবীর উদ্দেশ্যে মহিষ বলি দেবার প্রথা ছিল, তিন পুরুষ আগে সেই প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন পরিবর্তে ছাগবলি হয়। পাশাপাশি আখ, চালকুমড়ো বলিরও চল রয়েছে। নবমীর দিন রাজবংশী রীতি অনুসারে কৃষি উৎসব বা যাত্রাপুজোর আয়োজন করা হয়। লাঙল, কাস্তে, কোদালের পুজো হয় ওই দিন। হেমন্তকালে ভাল ফসলের আশায় রাজবংশী সমাজের কৃষকরা সুদূর অতীতকাল থেকে যাত্রাপুজো করে আসছে। তবে এ কথাও ঠিক, সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মানুষের সমাজের সবরকম রীতিনীতিতেও ঘটেছে বদল। রাজবংশী সমাজের বসুনিয়া পরিবারের দেবী দুর্গার আরাধনাতেও সেই পরিবর্তনের ছাপ কিছুটা হলেও লক্ষ করেছেন স্থানীয় মানুষ। তবে সাধারণ এক গ্রাম্য রাজবংশী কন্যার বেশে দেবী দুর্গা এখনও একটুও পালটাননি।

দুই বাংলার মানুষ মেতে ওঠেন যে পুজোয়

এখানে থিম নেই। বিশাল সাজসজ্জা নেই। নেই চোখধাঁধানো বাতি। তবে পুজোর রং শরতের আলোর মতোই উজ্জ্বল আর মোলায়েম। সেই পুজোকে ঘিরেই চলে উৎসব। উৎসাহে মাতেন দুই বাংলার মানুষ। উৎসবের কি কোনও সীমানা থাকে? উৎসবের সম্বল তো বিশ্বাস আর আস্থা। আর তা-ই নিয়েই বছরের পর বছর ধরে দিনহাটার মহামায়াপাটের পুজোতে মিলে যায় এপার বাংলা-ওপার বাংলা। মহামায়া তো তাদের ঘরের মেয়ে। তাকে একটিবার চোখের দেখা দেখতে কাঁটাতার তো বাদ সাধতে পারে না। জনশ্রুতি, ১৮৮৭ সালে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের উদ্যোগে জয়ন্তী থেকে রংপুর পর্যন্ত রেল লাইন পাতার কাজ শুরু হয়। দিনহাটার কাছে মাটি খুঁড়তে গিয়ে এক শ্রমিকের গাঁইতি ঠং করে লাগে পাথরে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সেই শ্রমিক। আশপাশের শ্রমিকরা ছুটে আসে। আচমকা এ ধরনের ঘটনায় সবাই বিস্মিত হয়। জ্ঞান ফিরলে সেই শ্রমিক জানায়, পাথর আর লোহার ঘর্ষণে বিদ্যুৎ চমকের মতো মাতৃরূপ দর্শন হয়েছে তার। তার কথামতোই রেল লাইনের ধারে তৈরি হয় মহামায়া মন্দির। ওই পাথরের খণ্ডকেই দেবীরূপে শুরু হয় নিত্যপুজো। বছরকয়েক পর দেবী ফের স্বপ্নাদেশ দেন। এবার তিনি আদেশ দেন, তাঁকে দুর্গারূপে পুজো করতে হবে। তারপর থেকেই সারা বছর ধরে ওই পাথরখণ্ড মহামায়ারূপে পূজিত যেমন হচ্ছে, পাশাপাশি প্রতিপদের দিন থেকে দশমী পর্যন্ত দুর্গা হিসেবে পুজো করার রীতি প্রচলিত আছে। ১২৫ বছর যাবৎ তাই মহামায়াপাটের দুর্গাপুজোয় অংশ নেয় দুই বাংলার মানুষ। থিম না থাকলেও, জৌলুস-আভিজাত্যের যথেষ্ট ঘাটতি থাকলেও, ভিড় কিন্তু এতটুকু কমেনি।

পুজো ঘিরে এ বছরও শুরু হয়েছে তোড়জোড়। মহামায়াপাট মন্দিরের পাশে স্থায়ী মন্দিরে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ। প্রতি বছরই বিশাল প্রতিমা তৈরি হয়। এ বছরও যার ব্যতিক্রম ঘটছে না। কিন্তু পুজো ঘিরে বাড়তি কোনও সাজসজ্জা বলতে যা বোঝায়, তা লক্ষ করা যায় না। প্যান্ডেলের ক্ষেত্রেও কোনও বাড়বাড়ন্ত নেই। শুধু দেবীকে একবার দেখার টানে ভক্তরা ছুটে আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। দিনহাটার প্রায় প্রতিটি বাড়ি থেকে আসে ভোগের সামগ্রী। পুজোর চার দিন বসে মেলা। চলে দেদার বিকিকিনি। চলতি বছর পুজোর বাজেট আড়াই লক্ষ টাকা, এরকমই হয় ফি বছর। এই টাকার বেশির ভাগটাই খরচ হয় প্রসাদ তৈরিতে। এখন প্রশ্ন, টাকা আসে কোথা থেকে? রাস্তায় নেমে চাঁদা তোলার রেওয়াজ কোনও দিনই ছিল না। এখনও নেই। মহামায়াপাটের দুর্গাপুজোয় ভক্তরাই স্বেচ্ছায় চাঁদা দেন। মহামায়া দুই বাংলায় খুবই জাগ্রত। ফি বছর ভক্তদের কারও না কারও মনস্কামনা পূর্ণ হলেই তিনি পুজোর যাবতীয় খরচ বহন করেন। কথিত আছে, মহামায়াপাটের মন্দিরে যা মানত করা যায়, তা-ই পূরণ হয়। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। তাই বিশ্বাসের টানেই মন্দিরে বছরভর ভিড় লেগে থাকে। পাশাপাশি পুজোর চার দিন সেই ভিড়ই পরিণত হয় মানুষের ঢলে। পুজো কর্তাদের কথায়, মা মহামায়ার পুজোর ব্যবস্থা করার তাঁরা কেউ নন। উনি নিজেই নিজের পুজোর ব্যবস্থা করেন।

মহামায়াপাটের মন্দিরস্থাপনার নানা গল্প উঠে আসে এলাকার প্রাচীন বাসিন্দাদের স্মৃতিচারণায়। তাঁরা বলেন, দিনহাটায় এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি মহামায়াপাটের পাথরখণ্ডের গল্প জানেন না। এখানে বিশ্বাসটাই সব। এখানে তর্কের অবকাশ প্রায় নেই বলা যায়। সেই বিশ্বাসেই হাজার হাজার ভক্তসমাগম হয়। পুজোর ক'দিন এখানে এত ভক্তসমাগম ঘটে যে মাটি দেখা যায় না।

একটা করে মানতপূরণ হয় আর বিশ্বাসের মাত্রা বেড়ে যায় দ্বিগুণ। মহামায়াপাট পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা কালীপদ পাল বলেন, ‘ভক্তদের কাছে মহামায়াপাট মন্দির হল তীর্থভূমি। এখানকার দুর্গাপুজোয় কোনও আড়ম্বর নেই যেমন, তেমনই এটাই হল এই পুজোর বিশেষত্ব। ঐতিহ্যও বলা যায়। এমন পুজো বাংলাদেশে দ্বিতীয়টা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে কোনও জাঁকজমক নেই, অথচ ভক্তদের ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়।’ রাষ্ট্রসীমানা-কাঁটাতার মানচিত্র ভাগ করতে পারে। আন্তর্জাতিক পররাষ্ট্র চুক্তি অনুসারে তাকে মান্যতা দেওয়াই নাগরিকের কর্তব্য, কিন্তু বিশ্বাস বা হৃদয়ের আবেগে সেই নীতি কার্যকরী হয় না শেষ পর্যন্ত। তাই ওপার বাংলার মা-ভাইবোনরাও এখানে স্বাগত। তাঁরাও মহামায়াপাটে মানত করেন। মনস্কামনা পূরণ হওয়ামাত্র তাঁদের বিশ্বাসও বেড়ে যায় দ্বিগুণ। এখানকার দুর্গাপুজো শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দেয়, দেশ ভাগ হলেও বিশ্বাস ভাগ হয় না।

তপন মল্লিক চৌধুরী

ভান্ডানি, এক অন্য দুর্গা

ময়নাগুড়ি থেকে কামাখ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে দেবী ভান্ডানি, কারও মতে বনদুর্গা পুজোর প্রচলন রয়েছে। একে ঘিরে প্রতিটি জায়গাতেই মেলার আয়োজন করা হয়। এখনও জাঁকজমকপূর্ণভাবে ভান্ডানি বা ভান্ডালি পুজো ও মেলা যেসব জায়গায় হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম ময়নাগুড়ি, বার্নিশ, ধূপগুড়ির ভান্ডানি, আলিপুরের যোগেন্দ্রনগরের মেলা। এই ভান্ডানি উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী, বেশ কয়েকটি নামে ইনি পরিচিত— ভান্ডানি, ভান্ডারনি, ভান্ডালি। গবেষকরা এঁকে বনদুর্গা বলে পরিচিতি দেন। এঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এঁর পুজো প্রচলন, এঁর লোককাহিনি। এই দেবীর পুজোর প্রচলন নিয়ে অনেকগুলো জনশ্রুতি রয়েছে, তার কাহিনিও ভিন্নরকম। আলিপুরদুয়ারের যোগেন্দ্রনগরে পূজিত ভান্ডালি দেবী সম্পর্কে যে মিথ রয়েছে তা এরকম—

ভান্ডালি দেবী দুর্গার বোন। শারদীয়া দশমী তিথিতে দুর্গা মর্তের পুজো শেষে স্বগৃহে ফিরছিলেন, তখন পথিমধ্যে বোনের সঙ্গে দেখা হয়। দুর্গাপুজোর সংবাদ পেয়ে এবং নিজে পুজো না পাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করলে দুর্গাদেবী তাঁকে সান্ত্বনা দেন যে, পরদিন অর্থাৎ একাদশীর দিন মর্তে তাঁর পুজো হবে। এর থেকেই একাদশীর দিন তাঁর পুজোর প্রচলন শুরু হয়। আবার ময়নাগুড়ির প্রচলিত মিথ অন্যরকম। কোচবিহারের রাজবাড়িতে দুর্গাপুজোর পর বিজয়াদশমী তিথিতে দেবী দুর্গার মর্ত থেকে কৈলাস যাওয়ার সময় তাঁর মালপত্র তত্ত্বাবধানকারী ভান্ডারনিকে উপলক্ষ করে এই পুজো বলেই এর নাম ভান্ডারনি পুজো। বিজয়াদশমীর দিন বার্নিশে হয় ভান্ডারনি পুজো, এর পর দু'দিন আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় হয় বাশিয়া ভান্ডারনি বা বাশি ভান্ডারনি পুজো।

ভান্ডানি নিয়ে সবচেয়ে প্রচলিত ও জনপ্রিয় লোকশ্রুতিটি রাজা নহুষকে ঘিরে। সুদূর অতীতে রাজা নহুষ দুর্গাপুজোর উদ্যোগ নেন, কিন্তু পুজোর সূচনায় দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেই শিকারে বেরিয়ে যান তিনি। বনে বন্য পশু শিকারের আনন্দে ভুলেই যান দেবীর পুজোর কথা। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পার হয়ে গেলেও তাঁর হুঁশ ফেরেনি। রাজার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে ক্লান্ত হলেন রাজপরিবারের মানুষরা। পুরোহিত দশমীর তিথি শেষ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে তাই দেবীর বিসর্জন দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মৃন্ময়ী দেবীর বিসর্জন হলেও রাজার স্বহস্তের অর্ঘ্য না নিয়ে উমা স্বগৃহে যেতে নারাজ। সেই জন্য যে পথে রাজা শিকারে বেরিয়েছিলেন, সেই পথে দেবী এগলেন, অবশেষে বনে রাজার দেখা পেলেন। দেবী নহুষকে তাঁর পরিচয় দিয়ে পুজো চাইলেন। রাজার পুজোর কথা মনে পড়ল, লজ্জা ও অনুতাপে তিনি সেই বনের মাঝেই দেবীকে অঞ্জলি অর্ঘ্য দিলেন এবং রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে একাদশীর দিন মহাধুমধামে দেবীর পুজোর প্রচলন করলেন। এই দেবীই ভান্ডানি বলে প্রসিদ্ধ হলেন। দেবী রাজাকে খুঁজতে পশ্চিম মুখে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে এই দেবী পশ্চিমমুখী। দেবী লোকজ অনুষঙ্গে ব্যাঘ্রবাহনা।

উপরের কাহিনিগুলোর ভিন্নতা দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে, পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে এইসব লোককাহিনি তৈরি হয়েছে। আসলে ভান্ডানি এই অঞ্চলের এক লৌকিক দেবী। অরণ্যসংকুল ও বন্য জন্তুর বিপদের সামনে অসহায় মানুষের সৃষ্ট দেবীবিশেষ।

এক সময় ভান্ডানি দেবী একাই পুজো পেতেন, এবং দ্বিভুজা ও ব্যাঘ্রবাহিনী ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ পুজোর বারোয়ারি আয়োজকরা একে আধুনিক দুর্গা বানিয়ে ফেলছেন। চার পুত্রকন্যা জুড়ে দেওয়ার পাশাপাশি বাঘের জায়গায় সিংহ চলে এসেছে। দ্বিভুজা দেবী অনেক স্থানেই চতুর্ভুজা। তবে ইদানীং দশভুজাও হয়ে গিয়েছেন। যা-ই হোক, পরিবর্তন-বিবর্তন সত্ত্বেও এই দেবী আজও গ্রামীণ জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের অন্যতম আরাধ্যা দেবী।

তিস্তার পূর্ব পারের বার্নিশ ঘাট এক সময় জলপাইগুড়ি শহরের সঙ্গে ফেরি যোগাযোগের সূত্র ছিল। ১৯৬৮-র প্লাবনের পর বার্নিশ বিচ্ছিন্ন। সেই বার্নিশ থেকে ময়নাগুড়ি রোড স্টেশনের পথে জলপাইগুড়ির অন্যতম প্রধান ভান্ডানিপুজোর মেলা বসে। বিজয়াদশমীতে একদিনের এই মেলায় এখনও গ্রাম্য চেহারা থাকলেও, মেলা শুধু বিকিকিনির হাটই হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। পুজোর সামনের মাঠ ও রাস্তার দু'ধারে মেলা পরিচালনায় স্থানীয় কমিটি তৈরি হয়েছে। পুজোর বিষয়টির দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সেবাইতের ব্যক্তিগত। প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন এই মেলার পরিচালনায় স্থানীয় প্রশাসনের অংশগ্রহণও রয়েছে। পদমতি, মাধবডাঙা, ময়নাগুড়ি, ধর্মপুর প্রভৃতি জায়গায় মানুষজন ছাড়াও দূর-দূরান্তের মানুষ এই মেলায় হাজির হন নাড়ির টানে। তবে সাম্প্রতিককালের এই ভান্ডানিমূর্তি তার পুরনো চেহারা পালটে সন্তানসন্ততিসহ সিংহবাহিনী দুর্গার চেহারা নিয়েছে। পুজোয় সহস্রাধিক পায়রা উৎসর্গিত হয়। প্রাচীনকালের মতোই রাজবংশী লোকভাষায় পুজোর মন্ত্র উচ্চারিত হয়।

বার্নিশের ভান্ডানির মতোই আরও একটি উল্লেখযোগ্য ভান্ডানি বা ভান্ডালি পুজো আলিপুরদুয়ারের যোগেন্দ্রনগরের ভান্ডালিপুজো। এখানে বিজয়ার পর একাদশী

তিথিতে এই পুজো হয়। দুর্গাপুজোর মতোই মহাসমারোহে এই পুজো হয়, এখানেও দেবী সিংহবাহিনী ও কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী বেষ্টিতা হয়ে গিয়েছেন। তবে চতুর্ভুজা এই দেবীপুজোর মন্ত্র জগদ্ধাত্রীপুজোর অনুরূপ। পুজো উপলক্ষে ভোগ রাঁধা হয়, যা সর্বসাধারণের জন্য। সন্ধিপুজো ও অষ্টমী পুজোয় বলিও দেওয়া হয়। মেলা চলে তিন দিন। মেলায় গ্রাম্য চরিত্র বজায় আছে অদ্যাবধি। এখানে যাত্রাপালার আয়োজন হয়। কুমারগ্রাম থানার পশ্চিম নারাথলি গ্রামেও ভান্ডানি পুজো উপলক্ষে মেলা বসে। দশমীর চার দিন পরে স্থানীয় মানুষজনের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন হয়। মেলায় ব্যাপ্তি ততটা না হলেও প্রাচীনত্ব রয়েছে। মূলত মনিহারি দোকান, খাওয়াদাওয়ার দোকান ছাড়াও লোকগান ও পালাগানের আসর এর আকর্ষণ। ধূপগুড়ির ভান্ডানি গ্রামেও বিজয়াদশমীর পরদিন ভান্ডানি পুজো ও এই উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়। এটিও দেড়শতাধিক বছরের প্রাচীন মেলা। পাকা মন্দিরে দেবী ভান্ডানিমূর্তিটি আজ দুর্গার অনুরূপ চেহারার হলেও ব্যাঘ্রাসীনা ও দ্বিভুজা। পায়রা, পাখি, পাঁঠাবলি দেওয়া হয় ও সর্বজনীন ভোগ ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও করেন পুজোর আয়োজকরা। সেবাইত রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মন্ত্র লোকভাষায়। এই মেলার সূচনা দেড়শো বছর আগে হয়েছিল, উদ্যোক্তা ছিলেন দক্ষিণ উল্লাডাবরির ধীরদেব মল্লিক।

মাল ব্লকের ক্রান্তিতে ভান্ডাঠাকুর বা ভাণ্ডারীর পুজো উপলক্ষে ইদানীং বেশ জমজমাটি মেলা বসছে। পুরুষ ঠাকুর। প্রায় সত্তর বছরের পুরনো এই পুজো ও মেলা, তবে মেলার এই জৌলুস খুব বেশি দিনের নয়। ভান্ডাঠাকুর, যাঁকে উপলক্ষ করে এই মেলা, তাঁর মূর্তিতে দুর্গার ছায়া মিশেছে। ভান্ডা আসলে যক্ষ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাহারা দেন তিনি। বাঘের পিঠে আসীন, দু'পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী ও কার্তিক-গণেশ। পূজারির স্বপ্নাদেশে এই দেবতামূর্তি রচিত হয়েছে। অনেকের মতে, এই এলাকার ভান্ডি গাছের থেকে ভান্ডাঠাকুরের নাম এসেছে। আগে একটি মাটির ঢিপি ছিল, জঙ্গল ঘেরা, এখানেই পুজোর সূচনা হয়েছিল। লক্ষ্মীপুজোর সময় কার্তিক মাসে সাধারণত এই পুজো ও মেলা হয়, এক সপ্তাহ ধরে চলে এই মেলা। সম্প্রতি মেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে একে সুসম্পন্ন করতে জেলা পরিচালনায় যুক্ত হয়েছে মাল পঞ্চায়েত সমিতি। এই মেলায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ অংশ নেন। পাশেই কাঠামবাড়ি, মেচদের গ্রাম। মেচরাও এই মেলায় অংশ নেন। পায়রা প্রভৃতি বলি হয়, তবে আগে বলি হত না। মেলাকে কেন্দ্র করে মাল, ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ এই উৎসবে মেতে ওঠেন।

গৌতম গুহ রায়

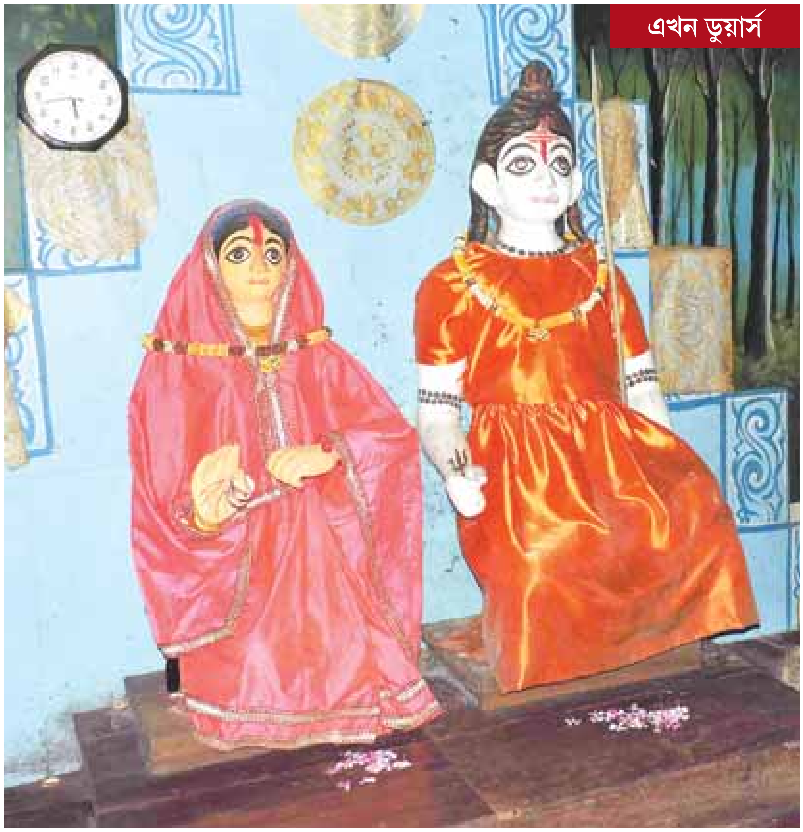

জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি

মন্থনার কর্ত্রী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি।
বড় বুদ্ধি বড় তেজ জগতে বাখানি।।
—রতিরাম দাস, জাগের গানের অংশ

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর সে কাহিনি নিয়ে নাটক-যাত্রা-সিনেমা অনেক হয়েছে। বঙ্কিম যে দেবীর কথা লিখেছিলেন, আর বৈকুণ্ঠপুরের অরণ্যে যে দেবীর মাহাত্ম্য পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে, তাঁরা কিন্তু বিলকুল আলাদা। দু'জনই দেবী চৌধুরানি নামে পরিচিত। কিন্তু সাহিত্যসম্রাটের কাহিনিতে তিনি কাল্পনিক আর বৈকুণ্ঠপুরে জীবন্ত। শিকারপুরের অরণ্যের অনেকটাই এখন চা-বাগান আর বসতি গিলে নিয়েছে। একদা সেই অরণ্যের গভীরে ছিল বৈকুণ্ঠপুরের রাজধানী। পরে উনবিংশ শতকের একেবারে গোড়াতে যা জলপাইগুড়ি শহরে চলে এসেছিল। বঙ্কিম শুনেছিলেন সে দেবীর কাহিনি, লোকমুখে বা জনশ্রুতিতে। তারপর লিখেছিলেন উপন্যাস।

কিন্তু উপন্যাসের বাইরে বাস্তবে যে দেবীর স্মৃতি বৈকুণ্ঠপুরের প্রাচীন রাজধানীর কাছাকাছি শিকারপুর চা-বাগানের মন্দিরে ধরা আছে, তিনি কে? চলুন, একটু অতীতে বিচরণ করি। বৈকুণ্ঠপুর এস্টেট তখন রংপুরের আওতায়, প্রশাসনিক বিচারে। জলপাইগুড়ি জেলার তখন অস্তিত্ব নেই। ইংরেজরা চেষ্টা করছে বৈকুণ্ঠপুরকে কবজা করতে। সময়টা ইংরেজ আগমনের গোড়ার কাল। ছিয়াত্তরের অভিশপ্ত মন্বন্তরের সামান্য আগে। বৈকুণ্ঠপুর এস্টেটের তৎকালীন শাসক দর্পদেব মানতে চাইছেন না ইংরেজদের বশ্যতা। ইংরেজদের নিয়োগ করা রাজপুত দেওয়ান দেবী সিং তখন রাজস্ব আদায়ের নামে চালাচ্ছেন ভয়ানক নির্যাতন।

১৭৭১-এ হল ভয়াবহ মন্বন্তর। বাংলা রসাতলে যেতে বসল। দেবী সিং-এর অত্যাচার আর অরাজকতা— এই দুইয়ের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের স্বার্থে দর্পদেবের শাসনকালে এবং প্রশ্রয়ে দেবী চৌধুরানির আবির্ভাব বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। মন্থনা নামক এস্টেটের কর্ত্রী জয়দুর্গা দেবী এ সময় দর্পদেবের সহযোগিতায় যে বাহিনী বানিয়ে নিজেদের এলাকা রক্ষা করতেন— সে

কাহিনির সঙ্গে বঙ্কিমের চরিত্রের আশ্চর্য মিল।

তিস্তার দুই কূল দাপিয়ে বেড়াতেন জয়দুর্গা দেবীর লোকজন। এদের সঙ্গে মিলেছিলেন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তিরা। মোগল সম্রাটের সুদিন তখন লাটে উঠেছে। বিশাল মোগল বাহিনী আর নেই। কাজ হারিয়েছেন বহু সেনা। এদের যে অংশটা রংপুর-বৈকুণ্ঠপুর এস্টেট জুড়ে বহাল ছিলেন, তাঁরা জয়দুর্গা দেবীর বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলেন। বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা ছিলেন এঁদের নেতা। এমনই এক নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক। বাস্তবে বৈকুণ্ঠপুর এস্টেট-সহ রংপুরের বিভিন্ন অংশে জয়দুর্গা আর ভবানী পাঠকের মিলিত শক্তি ইংরেজদের নাচিয়ে ছেড়েছিলে বেশ কিছু বছর।

১৭৮৭ সালে বগুড়ার কালেক্টর লেফটেন্যান্ট রেনানের সঙ্গে যুদ্ধে ভবানী পাঠকের মৃত্যু হয়। সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ দমন করেছিল সাহেবরা। রানি জয়দুর্গাও ক্ষান্ত হয়েছিলেন এক সময়। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর এস্টেট-সহ ডুয়ার্সের কোনায় কোনায় ততদিনে ছড়িয়ে পড়েছে দেবী চৌধুরানি আর ভবানী পাঠকের কাহিনি। না। সে কাহিনি উপন্যাসের চাইতে আলাদা। বঙ্কিম যখন রংপুর অঞ্চলে ডেপুটির দায়িত্ব পালনে এসে সে কাহিনি শোনেন, তখন কেটে গিয়েছে বেশ খানিকটা সময়। তিনি সে কাহিনিকে নিজের মতো গড়ে নিয়েছিলেন। উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে মনে হবে যে ব্রজেশ্বর আসলে রাজা দর্পদেবের অপভ্রংশ। আর প্রফুল্লকে বাদ দিলে দেবী চৌধুরানির সঙ্গে জয়দুর্গা দেবীর আশ্চর্য মিলের কথা তো আগেই জানিয়েছি।

বঙ্কিম অবশ্য বৈকুণ্ঠপুর এস্টেট থেকে ব্রজেশ্বরকে নিয়ে গিয়েছেন বরেন্দ্রভূমিতে। দেবী চৌধুরানিও সেখানকার মানুষ হয়েছেন তাঁর কথায়। বাস্তবে দেবীর এলাকা ছিল 'মন্থনী' এস্টেট। জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবার কাছেই সে স্থান। সেখান থেকে দেবী চৌধুরানির মন্দির দূরে নয়। কাছেই একটা রেল স্টেশনের নাম 'চৌধুরাণী'। বঙ্কিম বৈকুণ্ঠপুরের অরণ্য রাজ্যের ইতিহাস বিষয়ে খুব একটা অবহিত ছিলেন না বলে অনুমান করা যায়। তাই নিজের মতো করে কাহিনিকে গড়েছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর নামটিকে এড়িয়ে যাননি। পাঠক, উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদের একটুখানি পড়ুন—

"এই বলিয়া দেবী উঠিল। আবার জঙ্গল ভাঙিয়া বজরায় গিয়া উঠিল। বজরায় উঠিয়া রঙ্গরাজকে ডাকিয়া চুপি চুপি এই উপদেশ

বাস্তবে দেবীর এলাকা ছিল 'মন্থনী' এস্টেট। জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবার কাছেই সে স্থান। সেখান থেকে দেবী চৌধুরানির মন্দির দূরে নয়। কাছেই একটা রেল স্টেশনের নাম 'চৌধুরাণী'। বঙ্কিম বৈকুণ্ঠপুরের অরণ্য রাজ্যের ইতিহাস বিষয়ে খুব একটা অবহিত ছিলেন না বলে অনুমান করা যায়। তাই নিজের মতো করে কাহিনিকে গড়েছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর নামটিকে এড়িয়ে যাননি।

দিল, 'আগামী সোমবার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে। এই দণ্ডে বজরা খোল— সেইখানেই চল— বরকন্দাজদিগের সংবাদ দাও, দেবীগড় হইয়া যাও— টাকা লইয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে অধিক টাকা নাই।'"

মন্থনীর হাটের কাছে কিংবা জলপাইগুড়ি শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা করলা নদীর গভীরে এক সুড়ঙ্গের কাহিনি অনেককাল ধরেই প্রচলিত। শহরের গোশালা মোড়ের কাছে, করলা সংলগ্ন স্থানে যে দেবী চৌধুরানির মন্দিরটি রয়েছে (এটি আসলে কালী মন্দির), সেই ভূখণ্ডে সুড়ঙ্গের অস্তিত্ব কয়েক দশক আগে অবধি মানুষের চোখে পড়ত। করলা নদী বৈকুণ্ঠপুর অরণ্য থেকে সৃষ্টি হয়ে জলপাইগুড়ি শহরে তিস্তার সঙ্গে মিশেছে। তিস্তার দু'পারে লুঠপাট চালিয়ে এই নদীপথে দেবীর বাহিনী মিলিয়ে যেত অরণ্যের গভীরে। উপন্যাসের উক্ত পরিচ্ছেদে বঙ্কিম লিখেছেন—

"দেবী জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াও অনেক দূর গেল। একটা গাছের তলায় পৌঁছিয়া পরিচারিকাকে বলিল, 'দিবা, তুই এখানে বস। আমি আসিতেছি। এ বনে বাঘভালুক বড় অল্প। আসিলেও তোর ভয় নাই। লোক পাহারায় আছে।' এই বলিয়া দেবী সেখান হইতে আরও গাঢ়তম জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। অতি নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটা সুড়ঙ্গ। পাথরের সিঁড়ি আছে। যেখানে নামিতে হয়, সেখানে অন্ধকার পাথরের ঘর। পূর্বকালে বোধহয় দেবালয় ছিল— এক্ষণে কাল সহকারে চারি পাশে মাটি পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাতে নামিবার সিঁড়ি গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে। দেবী অন্ধকারে সিঁড়িতে নামিল।"

উপন্যাসে বর্ণিত 'চাঁদের খাল' গবেষক উমেশ শর্মা খুঁজে পেয়েছেন বৈকুণ্ঠপুর অরণ্য ফাড়াবাড়ি বিট অফিসের কাছে নিম নদীর পাড়ে। স্থানীয় শ্রুতি অনুযায়ী এর কাছেই মহাকাল নামক স্থান ছিল দেবীর গোপন আস্তানা। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে স্পষ্টভাবেই ত্রিস্রোতা নদীর উল্লেখ করেছিলেন। সেখানে ইংরেজরা তাঁর বজরা আক্রমণের মতলব এঁটেছিল। দেবী যে ভাটির দিকে খাল ধরে পালিয়ে যেতে পারেন, সেটাও ভেবেছিল সাহেবরা। করলা নদী হিসেবে খালের মতোই। ডুয়ার্সের বহু নদীই তেমন চওড়া নয়, কিন্তু বয়ে গিয়েছে অরণ্যের ভেতর দিয়ে।

তবে উপন্যাসে দেবীকে ধরার জন্য ইংরেজদের যে চেষ্টা দেখা যায়, ইতিহাসে তার সমর্থন নেই। বরং, ভবানী পাঠকের সঙ্গে

কমবেশি দশ বছর এই অঞ্চলে দাপিয়ে বেরিয়েছেন দেবী ও তাঁর দলবল, ভবানী পাঠকের সঙ্গে জোট বেঁধে। তিনি অরাজকতার অত্যাচার রুখতে নেমেছিলেন। সাহেবরা তাঁকে ডাকাত আখ্যা দিয়েছিল বটে, কিন্তু স্থানীয় মানুষ তাঁকে ভেবেছিল পরিত্রাতা। তা না হলে দুই শতক আগের এক শাসিকা এমন দেবত্ব অর্জন করবেন কেন? কেনই বা তাঁর পুজো হবে?

সাহেবদের যুদ্ধের তথ্য আছে। রংপুরের কালেক্টরকে 'ডাকাত রানি'র বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেননি বগুড়ার কালেক্টর ব্রেনান। এটা একটা রহস্য যে, ভবানী পাঠকের পতনের পর জয়দুর্গা দেবী কতদিন জীবিত ছিলেন! বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের মানুষ দেবী চৌধুরানি আর ভবানী পাঠককে জানে, কিন্তু প্রফুল্ল, ব্রজেশ্বরকে জানে না। কারণ, তাঁরা উপন্যাস থেকে দেবীকে চেনেনি। দেবী এবং ভবানী পাঠক তাঁদের কাছে অতীতের জীবন্ত চরিত্র।

ফলে এই অঞ্চলের অনেক জায়গায় দেবী চৌধুরানি আর ভবানী পাঠক পুজো পেয়ে আসছেন। পুজো হয় দেবীর বিশ্বস্ত সহচর রঙ্গলালেরও। একাধিক মন্দিরও আছে। এর মধ্যে অন্যতম হল শিকারপুরের দেবী চৌধুরানির মন্দির। যদি এই মন্দিরটিকে কেন্দ্রবিন্দু ধরা যায়, তবে দেখা যাবে, এর চারদিকে কয়েক মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দেবী আর ভবানী পাঠকের বহু চিহ্ন। শিকারপুরের কাছেই মন্থনী।

প্যাগোডার আকারে নির্মিত শিকারপুরের মন্দিরটি। দেবী চৌধুরানি আর ভবানী পাঠকের সামনে বসে রয়েছেন রঙ্গলাল, নিশা, দিবা, রংরাজ ছাড়াও একটা শেয়াল, বাঘ। সব ক'টিই ছিল কাঠের মূর্তি। কিন্তু আগুনে দেবী ও ভবানী মূর্তিটি পুড়ে যাওয়ায় নীরদ পাল নামক স্থানীয় শিল্পী স্মৃতি থেকে ওই দু'টি মূর্তি বানিয়ে দিয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। এটা এখন পর্যটকদের আসার স্থান হয়ে উঠছে। মন্দিরের উলটো দিকের হাট তুলে দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে উদ্যান।

দেবী চৌধুরানি আর ভবানী পাঠক পাশাপাশি। ভবানীকে শিবের আদলে ভাবা হয়েছে, কারণ সে ছিল সন্ন্যাসী। ভবানীর বাঁ দিকে রঙ্গলাল। বসে থাকা নীল নারী হলেন নিশা আর দাঁড়ান হলদে নারী দিবা। ডুয়ার্সের অরণ্যে একদা হাতির মতো বাঘও ছিল প্রচুর। তাই বাঘ হল বাহন। বন্দুক নিয়ে রঙ্গরাজ। মূর্তির চেহারাতে নিশ্চয় ভিন্নতা নজরে এসেছে। এ ছাড়াও শিমলাডিঙিতে ভবানী পাঠকের মূর্তি সর্বত্রই তেজোদীপ্ত। কিন্তু দেবী চৌধুরানি সর্বদাই ঘরোয়া— যেন মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। এর কারণ, জয়দুর্গা দেবী অত্যন্ত প্রজাবৎসল ছিলেন। বঙ্কিম নিশ্চয় তাঁর এই চরিত্রের কথা জেনেছিলেন। কারণ, তাঁর দেবী চৌধুরানি নিজস্ব বাহিনীর কাছে ছিলেন মাতৃতুল্য।

ডুয়ার্সের অরণ্যভুমির মাঝে লুকিয়ে থাকা গোপন পথ আর স্থানগুলির কথা এই সে দিন পর্যন্ত ঠিকমতো জানত না রাজ্য। কেএলও জঙ্গিরা সেই করিডর ব্যবহার করে প্রশাসনকে ঘোল খাইয়েছে। তাই ইংরেজ আমলের গোড়ায় তিস্তার পশ্চিম পাড়ের বৈকুণ্ঠপুর অরণ্য রাজ্য তাঁদের কাছে ছিল প্রায় পুরোটাই

অজানা। অন্য দিকে, বৈকুণ্ঠপুর শাসকদের কাছে তা হাতের তালুর মতো চেনা। তাই কমবেশি দশ বছর এই অঞ্চলে দাপিয়ে বেরিয়েছেন দেবী ও তাঁর দলবল, ভবানী পাঠকের সঙ্গে জোট বেঁধে। তিনি অরাজকতার অত্যাচার রুখতে নেমেছিলেন। সাহেবরা তাঁকে ডাকাত আখ্যা দিয়েছিল বটে, কিন্তু স্থানীয় মানুষ তাঁকে ভেবেছিল পরিত্রাতা। তা না হলে দুই শতক আগের এক শাসিকা এমন দেবত্ব অর্জন করবেন কেন? কেনই বা তাঁর পুজো হবে?

যদি কখনও জলপাইগুড়ি শহর থেকে রংধামালি হয়ে বেলাকোবার পথে শিকারপুরের মন্দিরে যান, তবে যেতে যেতেই অনুভব করবেন দু'শো বছর আগে এই এলাকা কতটা দুর্গম ছিল। তখন আপনার যাত্রাপথের নব্বই শতাংশই ছিল গভীর অরণ্য।

বাস্তবের দেবী চৌধুরানি রানি জয়দুর্গা দেবী এই অরণ্যভূমে দেবীত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁর উপাখ্যান যখন সাহিত্যসম্রাটের কাছে এসেছে, তখন পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় শতবর্ষ। তাই তাঁর কাহিনিতে সুপ্তসলিলা নদীর মতো প্রবাহিত হয়েছে যে স্থান-কাল-পাত্র— তাঁদের এলাকায় একবার ঘুরে যেতেই পারেন। এভাবেই হয়ত ভবিষ্যতের কোনও উৎসাহী গবেষক খুঁজে আনবেন জয়দুর্গা দেবীর প্রামাণ্য জীবনী। দেখে আসতে পারেন উপন্যাসের চরিত্রগুলির চেহারা।

প্রাসঙ্গিক— রাজা দর্পদেব বৈকুণ্ঠপুরের রাজা হন ১৭৫৬-তে। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই পলাশির যুদ্ধে দেওয়ানির অধিকার পাওয়া সাহেবদের কর দেওয়া বন্ধ করে দেন। শক্তি বাড়ানোর জন্য ভুটানের সঙ্গে মিত্রতা করেন। ওয়ারেন হেস্টিংসকে খেপিয়ে দেন। ফলে যুদ্ধ। তিস্তা নদীতে ইংরেজরাই জেতে সে যুদ্ধ। পরে ভুটান-ইংরেজ মিত্রতা হলে দর্পদেবের লড়াই দু'পক্ষের সঙ্গেই চলতে থাকে। কিন্তু দর্পদেব সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে আধুনিককালের গেরিলা কায়দায় হানা দিতেন। জয়দুর্গা দেবীকে তিনি সহযোগিতা করে গিয়েছেন বরাবর। ১৮৯৩-এ তাঁর মৃত্যু ঘটে। আনুমানিক ১৭৭০ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ লগ্ন অবধি কোনও সময়সীমায় দেবী চৌধুরানির উত্থান বলে ধরা হয়।

বৈকুণ্ঠ মল্লিক

ঋণ- 'বৈকুণ্ঠপুরের পূজাপার্বণ ও লোকাচারের ধারা'। উমেশ বর্মা

স্মৃতির ভেলায় ভেসে ওঠে চা বাগানের দুর্গোৎসব

ডুয়ার্স অঞ্চলে চায়ের দেশেও দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে একতার ঐকতান অনুরণিত হতে থাকে বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরে। চা-বাগান অঞ্চলের দুর্গাপুজোর চালচিত্র খুঁজে পেতে ফিরে যেতে হয় বিস্মৃত অতীতের গভীরে। একবিংশ শতকের আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ডুয়ার্সের অধিবাসীরা হয়ত ভাবতেই পারবেন না যে, সে আমলে ডুয়ার্সে সাংস্কৃতিক চেতনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর কাজ ছিল কত কঠিন। বর্তমানে পাকা সড়কের মাধ্যমে যোগাযোগব্যবস্থা সুদৃঢ়। দূরভাষ দূরকে টেনে এনেছে ঘরের নিভৃত কোণে। অতীতের সেই যোগাযোগবিহীন অখ্যাত নির্জন বন্য শ্বাপদসংকুল ডুয়ার্স প্রাঙ্গণে কবে কোথায় দুর্গাপুজোর প্রচলন ঘটেছিল, তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া বড়ই কঠিন। তবু সংক্ষিপ্তাকারে দু'-চারটি পুজোর সামান্য পটভূমি তুলে ধরা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে হয়।

দুর্গাপুজো শুধুমাত্র ধর্মীয় উপলক্ষ নয়। সর্বধর্মসমন্বয়ে দুর্গাপুজো হয়ে থাকে এই শরৎকালে, সুতরাং শ্রেষ্ঠ শারদোৎসব। যেখানেই বঙ্গসন্তানরা রয়েছেন, সেই অঞ্চলেই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শারদোৎসবের সূচনা ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে ডুয়ার্স অঞ্চল এক সময়ে ভুটানের দখলে ছিল, ফলে কিছুটা বিলম্বই হয়েছিল। ডুয়ার্স অঞ্চল ব্রিটিশের অধীনে আসার পর পুরো অঞ্চলটা চা-শিল্পের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মূলত চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করতে ইংরেজরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দুর্গাপুজোর তাৎপর্য তেমন গুরুত্ব কিছু পায়নি। ফলত পুজোর ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেতে পেতে সর্বধর্মসমন্বয়ের শারদোৎসবের বিস্তৃতি লাভ করতে সময় লেগে যায়। সে আমলে প্রান্তিক কেন্দ্র শিলিগুড়ি। নেহাত কিছু লোক বাস করত বন-জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট জনপদে। একমাত্র গুরুত্ব শিলিগুড়ি থেকে ট্রেন সরাসরি কলকাতা যায়, অন্য দিকে ছোট রেলপথ দার্জিলিং যায়। দার্জিলিং যাবার রেলপথের একটি শাখা পঞ্চনই জংশন থেকে কিষানগঞ্জ পর্যন্ত যেত। রেল লাইনের পাশ দিয়ে গাড়ি যাবার রাস্তা। গোরুর গাড়িই যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন। এ জন্যই এ রাস্তার নাম হিল কার্ট রোড। এখনও এ নামেই পরিচিত। এ ছাড়া শিলিগুড়ির আর কোনও গুরুত্ব ছিল না। শিলিগুড়ি থেকে গোরুর গাড়ি অথবা ট্রেনে

জলপাইগুড়ি আসা যেত, কিন্তু ডুয়ার্সের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না। ১৯৩৭ সাল নাগাদ করোনেশন সেতু সেবকে তৈরি হবার পর ডুয়ার্সের সঙ্গে ক্ষীণ যোগাযোগব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৪০ সালে করোনেশন সেতু সরকারিভাবে উদ্বোধন হলে ডুয়ার্সের যোগাযোগব্যবস্থা দৃঢ় হয়। তা সত্ত্বেও যাতায়াতে অনেক হ্যাপা ছিল।

যেহেতু শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা যাবার ট্রেন ছাড়ত, সুতরাং রেলগাড়ি রক্ষণাবেক্ষণকল্পে বেশ কিছু রেল কর্মচারী শিলিগুড়িতে বাস করতেন। এ কথা ঠিক, যেখানেই বাঙালি কর্মচারী একত্রিত হতে থাকে, সেখানেই দুর্গাপুজোর একটা গুঞ্জন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এভাবেই ইস্ট বেঙ্গল রেল কর্মচারীরা দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ১৯২৬ সালে। যাঁরা উদ্যোগী, তাঁদের যতটুকু নাম-পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন সূর্য চক্রবর্তী, শিরীষ বিশ্বাস, আশুতোষ সান্যাল এবং উপেন মুখোপাধ্যায়। তাঁরা নিউ সিনেমা রোডের উপর দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগেই ডুয়ার্সে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। প্রথম কে বা কারা কোন অঞ্চলে শুরু করেছিলেন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা রীতিমতো কঠিন। তবুও রাজভাতখাওয়ায় সে সময় বনবিভাগের ডিভিশনাল অফিস থাকার কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে গণ্য হত। তা ছাড়া জয়ন্তী যাওয়ার শাখা রেলপথ এখানেই শুরু, সেদিক থেকেও ছিল এটা গুরুত্বপূর্ণ। কাদের

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগেই ডুয়ার্সে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। প্রথম কে বা কারা কোন অঞ্চলে শুরু করেছিলেন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা রীতিমতো কঠিন। তবুও রাজভাতখাওয়ায় সে সময় বনবিভাগের ডিভিশনাল অফিস থাকার কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে গণ্য হত। কাদের উদ্যোগে দুর্গাপুজোর সূচনা ঘটেছিল তা না জানা গেলেও বলা যায়, রেল স্টেশনে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল।

উদ্যোগে দুর্গাপুজোর সূচনা ঘটেছিল তা না জানা গেলেও বলা যায়, রেল স্টেশনে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। দুর্গাপুজো হত সাতালী জ্ঞান মণ্ডলের বাড়িতে, গোপালপুর চা-বাগানে, মেটেলি কালীবাড়িতে। বেশির ভাগ চা-বাগান ইংরেজ পরিচালিত, কাজেই ইংরেজদের নজরে দুর্গাপুজো তেমন স্তপায় না। অথচ এই চা-বাগানগুলির প্রায় একশো ভাগ করণিক ছিলেন বঙ্গসন্তান। ইংরেজ পরিচালিত চা-বাগানগুলিতে প্রধান করণিক অর্থাৎ বড়বাবুর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। সাহেব ম্যানেজার যে কোনও বিষয় প্রথমে বড়বাবুকে ডেকে বলতেন, তারপর বড়বাবু সব দিক বিবেচনা করে সমস্যার সমাধান করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহেবরা সেই সমাধানেই গুরুত্ব দিতেন। এর ফলে বাগানে অন্য বাবুদের থেকে বড়বাবুর আধিপত্য, গুরুত্ব সবটাই অধিক মাত্রায় থাকত। কোনও শ্রমিক কিংবা কর্মচারী যে প্রয়োজনই হোক না কেন, বড়বাবুকেই প্রথম সমাধানের জন্য বলতে হত। বড়বাবুও তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব, সকলকে সমবিচারের তালিকায় রাখতেন। বাগানে কর্মরত বাঙালি কর্মচারীরা বেশির ভাগ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর কথা তাঁদের মনে হওয়াতে বড়বাবুকেই জানালেন। এভাবেই নানা টানাপোড়েন পার করে অবশেষে ১৯৩৪/৩৫ সাল নাগাদ।

রাজাভাতখাওয়া অঞ্চলের কাছাকাছি ডিমা চা-বাগানের হেড ক্লার্ক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ম্যানেজারকে বাগানে প্রথম দুর্গাপুজোর কথা বললেন। হেমচন্দ্রবাবু দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ইংরেজ ম্যানেজারকে বোঝাবার চেষ্টা করে অবশেষে সফলও হলেন। সাহেব অনুমতি দিলেন বাগানে দুর্গাপুজো করার। সমস্ত বাঙালি কর্মচারী একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পুজো সম্পন্ন করতে। সে আমলে বহু কর্মচারী স্ত্রী-পুত্র-পরিজন পূর্ববঙ্গের বাড়িতে রেখে দিতেন, আর পুজোর সময় ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যেতেন। সেবার যেহেতু বাগানেই পুজোর ব্যবস্থা হচ্ছে, অনেক কর্মচারী বাড়ি তো গেলেনই না, উপরন্তু পরিবার-পরিজনকে পুজো উপলক্ষে এ দেশে অর্থাৎ চাকরিস্থলেই নিয়ে এলেন। এইভাবেই চা-বাগানে দুর্গাপুজো ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে বসবাসকারী সব মানুষের মনে, সব সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশ অঙ্কুরিত হতে থাকল।

বাঙালি মালিকানার চা-বাগানগুলিতে প্রথম থেকেই দুর্গাপুজো হত, কিন্তু ইউরোপীয় কোম্পানির বাধ্যবাধকতার ফলে সব বাগানে পুজো হওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। বেশ কিছু চা-বাগানে তাই পুজো শুরু হওয়ার সূত্রপাত হল না। ডিমা চা-বাগানে পুজোর পর পাশাপাশি বাগানগুলিতে ধীরে ধীরে পুজোর রেওয়াজ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্রমে ডুয়ার্সের সব অঞ্চলেই দুর্গাপুজোর ঢেউ ছড়াতে লাগল। পশ্চিম ডুয়ার্সের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র মেটেলি। চালসা থেকে রেলগাড়িতে চড়ে পাহাড়ি পথে চা-বাগানের ছায়া গাছের পাশ দিয়ে রেলগাড়ি পৌঁছে যেত মেটেলি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর মেটেলি থেকে আরও একটু এগলে প্রকৃতির উন্মুক্ত আকাশ সামসিং। মেটেলিতে স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, রেল কর্মচারীবৃন্দ, চা-বাগানের কর্মচারী, উদার মনোভাবনার উজ্জীবিত নেপালি সম্প্রদায়— সব মিলিয়ে মেটেলি কালীবাড়ির সূচনা হয়েছিল ১২৭৮ বঙ্গাব্দে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪১ সালে মেটেলি কালীবাড়ি কমিটির পরিচালনায় প্রথম দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। কালীবাড়ির কমিটির সদস্যবৃন্দর সঙ্গে সংস্কৃতিমনা কিছু ব্যক্তিত্বর মতবিরোধের ফলে ১৯৫২ সালে মেটেলি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি গঠন করে আরও একটি দুর্গাপুজো সংযোজিত হয়।

ডুয়ার্সের যাতায়াতব্যবস্থা প্রাক-স্বাধীনতা আমল পর্যন্ত প্রকৃতই দুর্বল ছিল। মধ্য ডুয়ার্স থেকে জেলা শহর অথবা মহকুমা শহর— কোথাও সন্ধ্যার পর যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। আলিপুরদুয়ার যেতে শহর নিকটবর্তী কালজানি নদী পার হতে হত অথবা ট্রেনে লালমণির হাট হয়ে আলিপুরদুয়ার পৌঁছতে সময় লাগত দু'দিন। অর্থাৎ আগের দিন রওনা দিয়ে পরদিন পৌঁছনো। রেলগাড়ি একাধারে পূর্বে মাদারিহাট পর্যন্ত, অন্য দিকে পশ্চিম প্রান্তে বাগরাকোট। জলপাইগুড়ি যেতে বার্নেশ ঘাট থেকে নৌকোয় ভয়াল খরস্রোতা তিস্তা নদী পার হয়ে তবেই জলপাইগুড়ি। তা সত্ত্বেও মূল প্রবেশদ্বার বার্নেশ ঘাট দিয়েই ছিল। বার্নেশ ঘাটে নৌকাব্যবস্থা ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেল কর্তৃপক্ষের। বোট নৌকার ভাড়া ছিল চার আনা এবং খোলা নৌকা দুই আনা। দীর্ঘকাল এই ব্যবস্থা চালু ছিল। সেবক চালু হয়েছিল, কিন্তু রীতিমতো ভীতিপ্রদ। কখন ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হবে তা বলা যায় না। ধীরে ধীরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চলে ও চা-বলয়েও দুর্গাপুজোর ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করেছিল, আর দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে চা-বাগানে তিন দিনের ছুটি শ্রমিক-কর্মচারীর মনে এনে দিল অভাবনীয় আনন্দ। শ্রমিক গোষ্ঠীর নিজেদের তৈরি করা হাঁড়িয়া মাদক অনেক বেশি আকর্ষণীয়। ছুটির দিন অধিকাংশ শ্রমিক গোষ্ঠীকে দেখা যেত হাড়িয়া খেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। যদি একবার পিছন পানে ফিরে দেখি, সে বর্ণনা লিখতে সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের 'উৎসারিত আলো' বইয়ের বিষয়বস্তু জীবন্ত হয়ে উঠে আসে। একশো বছরের কিছু আগে ডুয়ার্সের চা-বাগান পত্তনের পর আদিবাসীদের নিয়ে আসা হয়েছিল ছোটনাগপুর অঞ্চলের গ্রাম থেকে। সহজ-সরল দারিদ্রপীড়িত মানুষগুলির অবর্ণনীয় জীবন সংগ্রাম না জেনে হাড়িয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করা কঠিন। এখানে খুব সামান্যই তুলে ধরছি।

"ঈশ্বরের আশীর্বাদে সবাই ঠিকঠাক এসেছে।

এরা সংখ্যায় কত— একশো আটানব্বই।

কবে থেকে এরা কাজ শুরু করবে— কাল থেকেই, ফাদার।

নো। পরশু থেকে ওদের কাজ করাবেন। ওরা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত।

কিন্তু একটা দিন ওদের বসে বসে খাওয়াব? হেগ সাহেবের পছন্দ হচ্ছিল না। ওরা অনেক বেশি কাজ করবে যখন আপনার ভরসা বেড়ে যাবে। এসো কাজ শুরু করি, ফাদার ইশারায় দু'জনকে কাছে ডেকে নিল। এরা গির্জার কর্মী। একজন ফাদারের হাতে বাইবেল তুলে দিল। ততক্ষণে একশো আটানব্বই জনকে মাঠের উপর বসিয়ে দিয়েছে। এখন বিকেল, সূর্য গাছের আড়ালে। মানুষগুলো কথা বলছিল না। সোমরা দেখল দুখনও এখানে। মনে হচ্ছে তাদের খেতে দেবে। ফাদার মুখ তুললেন, ভাষা জগা খিচুড়ি। ফাদার বললেন, 'এই পৃথিবীতে মানুষের অনেক দুঃখ। পরম পিতা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সন্তানের নাম যিশু। তোমরা বলো যিশু।' কেউ কোনও কথা বলল না। এবার হেগ সাহেব নিজে বললেন, 'বলো

ধীরে ধীরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চলে ও চা-বলয়েও দুর্গাপুজোর ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করেছিল, আর দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে চা-বাগানে তিন দিনের ছুটি শ্রমিক-কর্মচারীর মনে এনে দিল অভাবনীয় আনন্দ। শ্রমিক গোষ্ঠীর নিজেদের তৈরি করা হাঁড়িয়া মাদক অনেক বেশি আকর্ষণীয়। ছুটির দিন অধিকাংশ শ্রমিক গোষ্ঠীকে দেখা যেত হাড়িয়া খেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

যিশু... যিশু... যিশু।’ একটু নড়াচড়া দেখা গেল। বিরক্ত হয়ে শূন্যে হাতের লাঠি চালালেন, সেটা বাতাস কাটল, সঙ্গে সঙ্গে কথা ফুটল। কয়েকটি গলায় স্বর ফুটল যিশু। ঈশ্বরের পুত্র যিশু, পুরো নাম যেশাস ক্রাইস্ট। ‘তোমাদের সৌভাগ্য তোমরা এখানে আসতে পেরেছ।’ হেগ সাহেব চিৎকার করে একজনকে কাছে ডাকলেন। হেগ সাহেবের চিৎকার আর লাঠির আস্ফালনে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল। হেগ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার নাম কী?’ সে বলে, ‘চারোয়া।’ ফাদার গলার লকেটটা বার করে বারবার কপালে ছোঁয়ালেন, তারপর চারোয়ার কপালে ছোঁয়ালেন, কিছু বিড়বিড় করে বললেন। এবার চারোয়াকে বললেন, ‘আজ থেকে তোমার চারোয়া নাম ভুলে যাও। যেশাস ক্রাইস্ট তোমার নাম বলেছেন চার্লস। আজ থেকে তুমি খ্রিস্টান। যাও হোলি ওয়াইন পান করো।’ স্বেচ্ছাসেবক ইশারা করতেই তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, ‘কী নাম তোমার?’ বলল, ‘চার্লস।’ সঙ্গে সঙ্গে ফাদার হাতছানি দিলেন। লম্বা হাতা দিয়ে ড্রামের ভেতর থেকে পানীয় তুলে একটা হাতল ভাঙা কাপে ঢেলে স্বেচ্ছাসেবী এগিয়ে দিল, ‘নাও, খাও।’ ফাদার বললেন, ‘হোলি ওয়াইন’।”

—‘উৎসারিত আলো’, সমরেশ মজুমদার।

এভাবেই ইতিহাস রচনা করেছিল ওয়াইন। বাগানে কোনও ছুটি পড়লেই ওয়াইন পানের ধুম পড়ে যায়। মদিরাসক্ত হয়ে স্বাভাবিক চলাফেরা বিঘ্নপ্রাপ্ত হয়ে যত্রতত্র চেতনাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যেত।

ইংরেজ পরিচালিত বাগানে দুর্গাপুজো হত, তবে সংখ্যায় সেগুলো ছিল নগণ্য। দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার কিছু কিছু ঘটনা, তাৎপর্য কিছু অবশ্যই ছিল। তবে সবচাইতে বড় কথা, বঙ্গসন্তানদের আন্তরিকতা এবং ঐকান্তিকতা। পুজো শুরু হওয়ার পরে ক্রমপর্যায়ে অনেকেই এগিয়ে আসে। এখানে বলা দরকার, ডুয়ার্সের চা-বাগানের দুর্গাপুজো চলাকালীন নাচ-গানের অনুষ্ঠান কিন্তু এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আদিবাসী সম্প্রদায় এই নাচ-গানকে ‘যাত্রা’ বলে অভিহিত করে। দূর-দূরান্তে ‘যাত্রা’-য় (আদিবাসী সম্প্রদায়ের) অংশগ্রহণ করতে চলে যায়। বাগান কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এখনও হয়। মোগলকাটা চা-বাগানে সপ্তমী পুজোর রাতে সারারাতব্যাপী আদিবাসী নাচ-গান হয়। পুজো প্রাঙ্গণ থেকে সামান্য দূরে এই ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এমনকি পরদিন বেলা ১০/১১টা পর্যন্ত চলে। তখনও তাসাটি চা-বাগানে দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়নি, তবে নবমী পুজোর দিন সকাল ৯/১০টা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাচ-গানের আসর চলত। ওখানে সাঁওতাল গোষ্ঠীর অপূর্ব নৃত্য-গীত আজও মনে ভেসে ওঠে। যারা নাচত, সকলেরই বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব এবং পুরুষ। বলিষ্ঠ যুবকরা মাদল, নাগরা, ঝাঁপ ও বাঁশি বাজাতে ব্যস্ত। পুরুষরা রঙিন শাড়ি ঘাগরার মতো করে পরত। সাদা ধুতি পুরোটাই পাকিয়ে মাথায় জড়ানো, হাতে ময়ূরের পুচ্ছ এক গোছা। মাদলের তালে তালে নাচতে নাচতে চকিতে থেমে গিয়ে সবার হাতের ময়ূরপুচ্ছের গোছা হাত তুলে উঁচুতে তুলে ধরা আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ যন্ত্রের মিষ্টি আওয়াজ— একটা অদ্ভুত ঐকতান, সঙ্গে বাঁশি। আবারও ময়ূরপুচ্ছ নামিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচ শুরু হত। সাঁওতাল মহিলাদের নাচ অদ্ভুত সুন্দর। একই ধরনের শাড়ি। মাথার চুল বিশেষ ধরনে বেঁধে ফুল গোঁজা। গলায় রুপোর হাঁসুলি, হাতে রুপোর মোটা বালা, নাচের ধরন অন্য সম্প্রদায় থেকে একেবারেই আলাদা। প্রত্যেক মহিলা, যুবতী, কিশোরী পরস্পর পরস্পরকে কোমর জড়িয়ে ধীরপায়ে একসঙ্গে তালে তালে পা ফেলছে এবং ঘুরে যাচ্ছে। এক অপূর্ব ছন্দে নেচে চলেছে, তার সঙ্গে মাদলের সুরে এক মিষ্টি মাদকতা মাঝে মাঝে নাগরার দ্রুতলয়ের বাদ্যধ্বনি যেন এক অজানা রহস্যের অমোঘ হাতছানি। আদিবাসী, যেমন ওরাওঁ, মুন্ডা, খাড়িয়া— তাদের নৃত্যভঙ্গিও একটু আলাদা। সাঁওতালরা যেমন কোমর জড়িয়ে নাচে, কিন্তু ওরাওঁ, মুন্ডারা হাতে হাত জড়িয়ে নাচতে থাকে। সঙ্গে বাজে মাদল আর বাঁশি। সাঁওতালদের গানের সুরও তেমনই মিষ্টি। বাগানের ম্যানেজার বড়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রায় অংশগ্রহণকারী সব দলকে বকশিস দেবার পর যাত্রা শেষ হত।

এরকমভাবেই ডুয়ার্সের দুর্গাপুজো ধীরে ধীরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি এ কথাও ঠিক যে, অনেক জায়গাতেই দুর্গাপুজোর উদ্বোধন কোনও না কোনও অন্তর্নিহিত অর্থ তৈরি করে থাকে। যেমন ধরা যাক বানারহাটের দুর্গাপুজো। এক সময় যাতায়াত ছিল সমস্যাসংকুল। যোগাযোগ মাদারিহাট পর্যন্ত রেলগাড়ি। জেলা শহরে যেতে একখানা কি দু’খানা বাস বার্নেশ ঘাট, তিস্তা পেরিয়ে জলপাইগুড়ি। উদ্যোক্তা স্টেশন মাস্টার চণ্ডীচরণ কুণ্ডু। সবরকম প্রতিকূলতা পার করে রেলের ওয়াগনে দুর্গাপ্রতিমা আনার ব্যবস্থা করেন এবং সেই রেল ওয়াগনের মধ্যেই পুজোর শুভারম্ভ। সঙ্গে উদ্যোগী আরও কিছু সঙ্গী মিলেমিশে গড়ে তোলেন এক আবহ। গয়েরকাটার দুর্গাপুজোর সূত্রপাতও অভিনব। গয়েরকাটা বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যকেন্দ্র। বড় হাটকে কেন্দ্র করে লোকজনের যাতায়াত, সরকারি পূর্ত দপ্তরের অফিস এবং বন বিভাগের অফিস কৌলীন্য প্রদান করেছিল গয়েরকাটাকে। সন্নিহিত বনাঞ্চল এবং অফিস থাকাতে কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দিয়েছিল। ফলে গড়ে উঠেছিল কাষ্ঠ ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র। কোথা থেকে জটাজূটধারী এক সাধুর আবির্ভাব ঘটল এ অঞ্চলে। আস্তানা গেড়েছিল সর্দার সুখা সিং নামে এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের মোটরগাড়ি মেরামতের কারখানায়। সেই সাধুর তৎপরতায় অকালবোধনের চিন্তাভাবনা। তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত কিছু ব্যক্তির প্রচেষ্টায় আরম্ভ হয়েছিল দুর্গাপুজো। আবার বীরপাড়ায় পুজো শুরু হয়েছিল সন্ধ্যায় কেরোসিনের মৃদু আলোয়, তাসা খেলতে খেলতে দুর্গাপুজোর কথা ওঠে। তাসের আসর থেকেই বাস্তব রূপ নেয় দুর্গাপুজো। বাগানের জায়গা, কাজেই আমন্ত্রণলিপিতে বাগানের বড়বাবুর নামই থাকত। পাঁচের দশকেও এর কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। বিজলি বাতির ব্যবস্থা ছিল না। কয়েকটা হ্যাজাক, পেট্রোম্যাক্সের দৌলতে যে আলো পাওয়া যেত, সেটাই অনেক। বাইরে অন্ধকার। পুজো মন্দিরের ভিতর ধূপের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। যা কিছু লোকজন মণ্ডপের ভিতরেই। আরতি চলছে প্রায় বিরামহীন। এমনও দেখা গিয়েছে, আরতি করতে করতে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ধুনুচি নিয়ে নেচেই চলেছেন। যাঁরা আরতি পরিচালনা করছেন, তাঁরা বুঝতে পারতেন, এ

মাদলের তালে তালে নাচতে নাচতে চকিতে থেমে গিয়ে সবার হাতের ময়ূরপুচ্ছের গোছা হাত তুলে উঁচুতে তুলে ধরা আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ যন্ত্রের মিষ্টি আওয়াজ— একটা অদ্ভুত ঐকতান, সঙ্গে বাঁশি। আবারও ময়ূরপুচ্ছ নামিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচ শুরু হত। সাঁওতাল মহিলাদের নাচ অদ্ভুত সুন্দর। প্রত্যেক মহিলা, যুবতী, কিশোরী পরস্পর পরস্পরকে কোমর জড়িয়ে ধীরপায়ে একসঙ্গে তালে তালে পা ফেলছে।

আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। আরতি করতে করতে ঘোর লাগা সেই ভদ্রলোককে চার-পাঁচজন ধরে পুজোমণ্ডপের বাইরে এনে শুইয়ে হাতপাখার হাওয়া এবং জলের ঝাপটায় ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। এখনকার মতো যত্রতত্র ঠিক কানের কাছে বাজি ফোটানো যেত না। আমার মনে আছে, বীরপাড়া পুজো প্রাঙ্গণে প্রচুর ভিড় হত এবং যারা বাজি পোড়াতে চাইত, তারা অপেক্ষাকৃত নির্জন প্রান্তে খানিকটা আধো অন্ধকারের মধ্যে বাজি পোড়াতে যেত। এক বিশেষ ধরনের বাজি লম্বা স্টিকের মতো হাতেই ধরা যেত। হাতে ধরে স্টিকের মাথায় আগুন ধরিয়ে হাত যতটা সম্ভব লম্বা করে দূরে রাখতে হত। প্রচণ্ড শব্দে মাথার অংশ পুড়ে যেত। এখনও হয়ত এ ধরনের বাজি পাওয়া যায়, তবে বর্তমান চাহিদা শব্দের তুঘলকি চরিত্র।

বীরপাড়ার কাছাকাছি তাসাটি চা-বাগান। কোনও এক সময় হুজুগের বাগান ছিল। বিশেষ করে বিভিন্ন আমোদপ্রমোদ, বিনোদন ইত্যাদিতে। তবে এই হুজুগ খুবই গুরুত্ব পেত। বাগানের বড়বাবু অনাথবন্ধু ঘোষ মিশুকে, ভাল গান করতে পারতেন। অতিথিপরায়ণ এবং নানা বিনোদনের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর সহকর্মীরাও ততোধিক আন্তরিক ও উদ্যোগী ছিলেন।

সাহেবরা শ্রমিকদের মদ খাওয়ায় উৎসাহ জোগাত। মদ খেয়ে তার বিবেকবুদ্ধি ঠিকমতো কাজ করবে না। সুতরাং সাহেবদের মর্জিমতো কাজের দায়িত্ব বৃদ্ধি করা খুব একটা অসুবিধা হত না। মোটামুটি প্রচলিত প্রথা, তা সত্ত্বেও অত্যন্ত সন্তর্পণে বাগানের কর্মচারীবৃন্দ মদ খাওয়া কী করে বন্ধ করা যায় ভাবতে ভাবতে দুর্গাপুজোর কথা উত্থাপন করে বাগানের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শ করতে করতে শেষ পর্যন্ত পুজোর সময় যে বিলিতি মদ কাজের শেষে পান করতে দেওয়া হত, সেটা বন্ধ করে ওই টাকা পুজো বাবদ নেওয়া হল। অবশেষে এই পরিকল্পনা সার্থক রূপ পেয়েছিল। মদ্যপান বন্ধ করে দুর্গাপুজোর প্রচলন হল।

আবার এক চা-বাগানের সঙ্গে অন্য চা-বাগানের রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনও কোনও সময়ে চরম সীমায় পৌঁছে যেত। তাসাটি চা-বাগান থেকে ১০/১১ কিলোমিটার দূরে নাংডালা চা-বাগান। দুই বাগানের লোকজনের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা, আবার মনের গভীরে এক হাত নেবার প্রবণতাও প্রবল। তাসাটি চা-বাগানে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছে, সুতরাং নাংডালাতেও পুজোর জোগাড় করতেই হবে। বাগানের বড়বাবু শশাঙ্কশেখর সেন নানাভাবে তৎপরতা বৃদ্ধি করে অবশেষে দুর্গাপুজো চালু করেছিলেন। তারপর তর্ক-বিতর্ক, কোন পুজো ভাল হল, কোনটার জাঁকজমক বেশি— এ যেন সেই গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার কাহিনি। কোন মাস্টারমশাই বিদগ্ধ, বিদ্বান, পণ্ডিত? নিরক্ষর গ্রামবাসীর সামনে নিজেদের যোগ্যতা দিতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয়েছিল প্রকৃত পণ্ডিত শিক্ষককে। ডুয়ার্সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই শারদোৎসবের সূচনা। ধীরে ধীরে গোটা ডুয়ার্সে এর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। কালচিনি অঞ্চলে গাঙ্গুটিয়া বাগানে এক বিদেশিনি দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবার রাজাভাতখাওয়ার রেল স্টেশন চত্বরে দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার পরপরই হ্যামিলটনগঞ্জের তৎকালীন বলিষ্ঠ কাষ্ঠ ব্যবসায়ী স্মরজিৎ মজুমদার দুর্গাপুজোর সূচনা করেন।

চা-অঞ্চলের শেষ প্রান্তের বাগান কাদম্বিনী চা-বাগান কিন্তু কাজকর্মে বিভিন্ন তৎপরতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। কাদম্বিনী সংলগ্ন জনপদ ফালাকাটা। বর্ধিষ্ণু কৃষিভিত্তিক অঞ্চল। বিজয়াদশমী উপলক্ষে এখানে বিশাল মেলার ব্যবস্থা হয়। কাঠের সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র তুলনামূলকভাবে সুলভে পাওয়া যায়। দশমী উপলক্ষে মেলা বসলেও তার ব্যাপ্তি কয়েকদিন থাকে। যে সময় সরকারি বিদ্যুতের বণ্টন ব্যবসা বাস্তবায়িত হয়নি, সে সময়ে মেলা কর্তৃপক্ষকে কাদম্বিনী চা-বাগান কর্তৃপক্ষ যে সহায়তা করত তা চিরস্মরণযোগ্য। বিসর্জনের ঘাট থেকে শুরু করে মেলা প্রাঙ্গণ— সর্বত্রই চা-বাগানের ডায়নামো সেট তুলে এনে সাময়িকভাবে প্রতিস্থাপন করে পুজোর ঘাট ও মেলা প্রান্তর বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করে দিত এবং গভীর নদীতে নৌকোয় চা-বাগানের প্রতিমা স্থাপন করে নদীবক্ষে প্রতিমা ঘোরানো হত। নৌকোর উপর বৈদ্যুতিক অলংকরণ পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত দর্শকের মনে গভীর আনন্দের রেশ বইয়ে দিত। পাড়ে রাখা প্রতিমার উপর নৌকো থেকে সার্চলাইট ফেলে দর্শকবৃন্দকে অপার আনন্দের অংশীদার করা— এ কথা তো অস্বীকার করা যাবে না, সে চা-বলয়ে দুর্গাপুজোর প্রথম সূত্রপাত যেভাবেই ঘটুক না কেন। পরবর্তীতে ডুয়ার্সের শারদোৎসব সর্বধর্মসমন্বয়ের এক পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করেছিল। যোগাযোগব্যবস্থা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলে বসবাসকারী জনমানবের মানসিক বিবর্তন ঘটতে থাকে, আধুনিকতার ছোঁয়া ক্রমবর্ধমানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। চা-বাগানের স্বাভাবিক পরিচালন, ন্যায়নীতি মেনে কর্মসংস্কৃতির ফলে চা-বাগানের জনজীবন এক পরিতৃপ্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছিল। অভাব ছিল, কিন্তু মানসিক শান্তির ছন্দে বিঘ্ন ঘটার সুযোগ ছিল না। চা-বাগানের সমাজের সকল স্তরের মানুষের নানা ধরনের দুঃখকষ্ট,

কারণে-অকারণে বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়া, বেতন না পাওয়া, ঘরবাড়ি ঠিকমতো মেরামত না করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এই মুহূর্তে ডুয়ার্সের বহু বাগানের কথা শোনা যাবে যে, বন্ধ হয়ে আছে। এরকম দু'একটা বাগানের নাম করাই যেতে পারে— যেমন ঢেকলাপাড়া, রেড ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। অথচ কোনও এক সময় এই বাগানগুলিতে প্রাণপ্রাচুর্য ভরপুর ছিল। ভয়ংকর অস্বস্তির দিনেও রেড ব্যাঙ্ক বাগানে দুর্গাপুজোর ব্যবস্থা হয়েছিল

অভাব ছিল ঠিকই, কিন্তু মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ জীবনপথে চলার উদ্যম খুঁজে পেত। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ মানস দাশগুপ্তর ভাষায় 'ভুঁইফোঁড়' চা-বাগানের কর্মসংস্কৃতিতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্রুতলয়ে অপসৃত হতে শুরু করল। চা-বাগান থেকে সুখ— এ শব্দটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দৃঢ় আসন স্থান করে নিল বিপর্যয়। শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বাভাবিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। এরই সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দেখা দিল চরম বিপর্যয়।

কারণে-অকারণে বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়া, বেতন না পাওয়া, ঘরবাড়ি ঠিকমতো মেরামত না করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এই মুহূর্তে ডুয়ার্সের বহু বাগানের কথা শোনা যাবে যে, বন্ধ হয়ে আছে। এরকম দু'একটা বাগানের নাম করাই যেতে পারে— যেমন ঢেকলাপাড়া, রেড ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। অথচ কোনও এক সময় এই বাগানগুলিতে প্রাণপ্রাচুর্য ভরপুর ছিল। ভয়ংকর অস্বস্তির দিনেও রেড ব্যাঙ্ক বাগানে দুর্গাপুজোর ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু

এককভাবে পারিবারিক বাধ্যবাধকতা মেনে দুর্গাপুজো উদ্‌যাপন খুব সহজসাধ্য নয়। তবুও দিবদাস ও নিভারানি দত্ত দু'জনে মিলে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে ফেললেন। আশপাশের কয়েকটি বাগানের মধ্যে দিবদাস দত্ত ও নিভারানি দত্তর পারিবারিক দুর্গাপুজো ওই অঞ্চলে আনন্দের ঢেউ তুলে দিল।

অনিশ্চয়তার বাতাবরণ এখনও প্রবল। শেষ মুহূর্তে কী ঘটবে ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। তবে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তা বোধহয় এ বাগানে হারিয়েই গিয়েছে।

১৯৭৪/৭৫ সালে গয়েরকাটা চা-বাগানের কর্মচারীবৃন্দ সূচনা করেছিল দুর্গাপুজোর। নয়ের দশকে এই পুজো বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। নতুন কিছু করার উৎসাহ সর্বদাই মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। গয়েরকাটা চা-বাগানের দুর্গাপুজোর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীবৃন্দ ব্যবস্থা করেছিলেন অপর্যাপ্ত ভোগ বিতরণের। সেই ব্যবস্থা এখনও বর্তমান। নিষ্ঠার সঙ্গে ভোগ রান্না করতেন বাগানেরই কর্মচারী মায়া রায় ও জয়া চ্যাটার্জি। অন্য অঞ্চল থেকে পুজো দেখতে আসা দর্শনার্থীরা মায়ের ভোগপ্রসাদ পেয়ে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করতেন। পুজোর সময় শিশুদের কাঁচা হাতের লেখা নিয়ে 'মাতল রে ভুবন' নামে ছোট্ট স্মরণিকা প্রকাশ হত। একনাগাড়ে পনেরো বৎসর চলার পর ছন্দপতন ঘটে।

বিনাগুড়ি সর্বজনীন দুর্গোৎসব 'কাশফুল' নামে ভারী সুন্দর একটি স্মরণিকা প্রকাশ করত, সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রামঝোরা পেরিয়ে গ্যারগান্ডা চা-বাগান ইদানীং সর্বাধিক চর্চিত চা-কোম্পানি। ডানকানের একটি বাগান। গড়ে উঠেছিল ইংরেজের তৎপরতায়। আশপাশের সব চা-বাগানই ডানকান গোষ্ঠীর। যাতায়াতে নিজস্ব বাহন না থাকলে রীতিমতো অস্বস্তির কারণ ঘটত। আশপাশে দুর্গাপুজোর কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। অথচ দুর্গাপুজোর সময়ে একবার পুজোর প্রতিমার সামনে দাঁড়াতে না পারলে স্বাভাবিকভাবে মনে হবে, কিছু বোধহয় অসমাপ্ত থেকে গেল। ওই অঞ্চলের আশপাশে সকল বাঙালি কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারজনের মনে নিদারুণ ক্ষোভ, দুর্গাপুজোয় তাঁদের কোনওভাবে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

দিবদাস দত্ত ও তাঁর স্ত্রী নিভারানি দত্ত চাকরি সূত্রে গ্যারগান্ডা যোগ দিলেন। পূর্ববর্তী চা-বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের ফলেই চাকরি ত্যাগ এবং গ্যারগান্ডা বাগানে যোগদান। ভদ্রলোক অমায়িক, ভদ্র, আমুদে, নিরহংকারী ও মিশুকে ছিলেন। স্ত্রী নিভারানি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখতেন এবং মানুষকে ভালবাসতেন। ছেলেমেয়েরা ততোধিক ভদ্র এবং সুসন্তান বলতে যা বোঝায় তা বোধহয় এদের পক্ষে প্রয়োগ করা অসমীচীন হবে না। নিভারানি ধর্মকর্মে যথেষ্ট নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি থাকতেন কলকাতায়। মাঝে মাঝে দিবদাস দত্তর বাড়িতে আসতেন। আশপাশে বহু লোক ওই পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে আসতেন, উনি নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। শিষ্যা নিভারানি একবার গুরুদেবকে সমস্যার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, আশপাশে কোনও বাগানেই দুর্গাপুজো হয় না। দুর্গাপুজোর সময় মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। উনি নিভারানিকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। বললেন, 'মা, দুঃখ কোরো না। তোমার বাড়িতেই দুর্গাপুজোর ব্যবস্থা হবে, নিশ্চিন্ত থাকো।'

এককভাবে পারিবারিক বাধ্যবাধকতা মেনে দুর্গাপুজো উদ্‌যাপন খুব সহজসাধ্য নয়। তবুও দিবদাস ও নিভারানি দত্ত দু'জনে মিলে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে ফেললেন। প্রতিমা এনে বাড়িতে বাইরের অংশে প্যান্ডেল তৈরি করে দুর্গাপুজোর ব্যবস্থা হল। কলকাতা থেকে ওঁদের গুরুদেব কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য এলেন। তিনিই পুজো করলেন। আশপাশের কয়েকটি বাগানের মধ্যে দিবদাস দত্ত ও নিভারানি দত্তর পারিবারিক দুর্গাপুজো ওই অঞ্চলে আনন্দের ঢেউ তুলে দিল। ১৯৭৪ সালে পুজো শুরু হয়েছিল, শেষ পুজো হল ১৯৯০ সালে— মাঝে দু'বছর নিভারানির অসুস্থতার কারণে পুজো বাদ দিতে হয়েছিল। কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য নিয়মিত নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করতেন। ১৯৮২ সাল থেকে পুজোর দায়িত্ব সামলেছেন তাঁর পুত্র।

ডুয়ার্স অঞ্চলে সর্বত্রই সর্বজনীন দুর্গোৎসব। পারিবারিক পুজো বলতে জলপাইগুড়ি শহরে এবং গ্রামগঞ্জে যাঁরা জোতদার, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য পারিবারিক পুজো করেন। কিন্তু চা-বাগান অঞ্চলে একজন চা-কর্মচারী হিসেবে দিবদাস দত্ত ও নিভারানি দত্ত যে উদারতার ও মানসিক ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। ডুয়ার্স অঞ্চলে পুজোর জাঁকজমক অমলিন সবধর্মসমন্বয়ের মিলিত উৎসব— শারদোৎসব। চা-বাগান অঞ্চলে বসবাসকারী লোকজনের হাতে এ সময় কিছু বাড়তি অর্থ আসে। স্বভাবতই মানবিক সুস্থতা বিশেষ মাত্রা যোগ করে, সারা বছরের ঘাটতি মেটাতে সচেষ্ট হয় আপামর জনতা। পূর্বে যোগাযোগব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে অনেক পরিবারকে বাস্তবতা মেনে নিজেদেরকে নিবৃত্ত করতে বাধ্য হত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে শারদোৎসবের সময় নতুন জামাকাপড় পরা এক প্রচলিত রীতি। কিন্তু জেলা শহর যাওয়ার অর্থ নদী পার হয়ে শহরে যাওয়া এবং একদিনে ফিরে আসা নিশ্চিতভাবে কঠিন। এ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলে বাস্তব পরিস্থিতি বোঝানো খানিকটা সহজ হবে। স্বর্গত ডাঃ দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা ছিল। পুজোর দু'দিন পূর্বে তিনি আমাকে বললেন, 'চলো, আমরা জলপাইগুড়ি ঘুরে আসি।' বাসে বার্নিশ ঘাট, সেখান থেকে তিস্তা নদীর চর পার হয়ে নৌকোয় নদী পার, তারপর জলপাইগুড়ি। সকালেই রওনা হয়ে বিকেলে জলপাইগুড়ি পৌঁছলাম। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে সন্ধ্যায় পুজোর বাজার করতে বেরোলাম। ডাঃ মজুমদার তাঁর পরিবারের জন্য দামি শাড়ি, তা ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রসম্ভার কিনেছিলেন। পরদিন সকালেই বাগানের উদ্দেশে আমরা রওনা দিলাম।

ডাঃ মজুমদার নৌকোর গলুইয়ের পাশে বসলেন। তিস্তায় প্রবল স্রোত। নদী পার হয়ে নৌকো এপারে ভিড়তে গিয়ে চরে বেশ জোরে ধাক্কা লাগল। আচমকা ডাঃ মজুমদার নদীতে পড়ে গেলেন। মাঝিরা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে তাঁকে জল থেকে তুলল। ততক্ষণে কিছুটা জল ওঁর পেটে চলে গিয়েছে। সঙ্গের সব জামাকাপড় বালু মেশানো জলে ভিজে একটা কাপড়ের পুঁটুলি হয়ে গিয়েছিল। চর পার হয়ে এক অস্থায়ী চালাঘরের হোটেলে বেশ কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে একটু সুস্থ বোধ করায় আমরা নির্দিষ্ট বাস ধরে বাগানে ফিরলাম। চা-বাগানের শ্রমিকরা নির্ভর করত বোনাসের হাটের উপর। বর্তমানে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বোনাস দেবার পরদিনই বাসে অথবা ট্যাক্সি ভাড়া করে জামাকাপড় কিনতে অধিকাংশই চলে যায় বড় শহরে।

পরিবর্তন ঘটে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। তবে শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হল সম্প্রীতি। সর্বধর্মসমন্বয়ে এমন উৎসব অন্য কোথাও জনমানবকে এত কাছে টেনে আনে কি না সঠিক বলা কঠিন।

ব্রজগোপাল ঘোষ

ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম থেকে ডুয়ার্সের পুজোর পুরনো দিনগুলি

প্রথম পর্ব

ওয়ারেন হেস্টিংস তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাগ্যবিধাতা। ভুটানের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রেখে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য করাটাই তাঁর মূল লক্ষ্য। তাই বারবার ভুটানের দূত পাঠানো, ভুটানকে ডুয়ার্সে নানা সুবিধে দেওয়া, তবু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই করতে হয়েছে। ইংরেজ-ভুটান যুদ্ধ নিয়ে সার্জন রেনি, এম. ডি. লিখেছেন 'Bhutan and the story of Doors War' এবং তিনিই আঠারো দুয়ারের কথা লেখেন, লেখেন— সমতল থেকে পাহাড় বা ভুটানে যাবার পথ বা দরজা, বহুবচনে 'Doors' দুয়ারগুচ্ছ। এখন অবশ্য তিস্তা থেকে সংকোশ পর্যন্ত এলাকা ডুয়ার্স। ভুটানের অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ এবং কোচবিহারে রাজসৈন্যদের একত্র অভিযান। এক বছরের দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষে ১৮৬৫-র ১১ নভেম্বর বক্সা পাহাড়ে সিঞ্চুলা চুক্তির ফলে গোটা ডুয়ার্স এলাকা ইংরেজ অধিকারে আসে। সান্ডার সাহেব রাজশাহি ডিভিশনের অধিকর্তা পি. নোলার্নের নির্দেশে পশ্চিম ডুয়ার্সের এক প্রতিবেদন (১৮৯৫-১৮৯৬) রচনা করেন। এই প্রতিবেদন অবশ্য নিছক অর্থনীতি নয়, ডুয়ার্সের প্রকৃতি, মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, নদনদী ইত্যাদির এক সামগ্রিক বিবরণ। পশ্চিম ডুয়ার্স স্বতন্ত্র এলাকা হিসেবে ১৮৬৫-র ১১ নভেম্বর থেকে ১৮৬৮-র ডিসেম্বর পর্যন্ত শাসিত হলেও, নতুন জলপাইগুড়ি জেলা তৈরি হল ডুয়ার্স আর রংপুরের খানিকটা অংশ নিয়ে। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলার জন্ম। এখন অবশ্য জলপাইগুড়ি থেকে আবার ডুয়ার্সের খণ্ড অংশ নিয়ে আলিপুরদুয়ার নতুন জেলা হয়েছে ২৫ জুন, ২০১৪-তে। জলপাইগুড়ি আমাদের কাছে অবশ্য জলপাই-ডুয়ার্স। এই দুই অঞ্চলের মধ্যে আমাদের শৈশবের যোগাযোগের রাস্তা ছিল তিস্তা— নৌকোয় পার হয়ে। সেকালে ছিল সবকিছুই ঢিলেঢালা, আন্তরিক এবং ছিল পারিবারিক সংযোগ। একুশ শতকে মা, বাবা, ছেলে, পুত্রবধূ— সবাই বিচ্ছিন্ন, একক। রবীন্দ্রনাথের 'কাঙালিনী'র দিকে কেউ ফিরেও দেখে না। নতুনকাল নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।

আমাদের শৈশব অর্থাৎ আমার শৈশব কেটেছে ইংরেজ শাসনের শেষ পর্বে। জলপাইগুড়ি তখন পুরনো শহর, আবার আলিপুরদুয়ার-ময়নাগুড়ি আমার আসা-যাওয়া বাবার বদলির চাকরি উপলক্ষ করে। গয়েরকাটার সেই পুরনো কাঠের বাংলোটা এখনও আছে। তখন জলপাইগুড়ির দুর্গাপুজো পুরনো পদ্ধতির হলেও তার খ্যাতি বিপুল। আলো দিয়ে সাজানো করলা নদীর বুকে নানা মাপের নৌকায় ঘোরাঘুরি এবং শেষে বিসর্জন— সে এক অভিজ্ঞতা, যা ভোলার নয়। পরে সে কথায় আসছি।

আবার আলিপুরদুয়ার তখন ক্রমশ জেগে

আলিপুরদুয়ার তখন ক্রমশ জেগে উঠছে। পুরনো আলিপুরদুয়ারের মধ্যে তখন বসবাসের সীমাবদ্ধতা, খানিকটা শহুরে ভাব। তবে জানা দরকার, আলিপুরদুয়ারের সরকারি নির্দেশে পুরসভা এবং কলেজ— দুটোই অনুমোদিত হয় ১৯৫৭-তে। আলিপুরদুয়ারেও তখন আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ির কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। দুর্গাবাড়ির শতবর্ষে একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এখন তা এক বিশাল প্রতিষ্ঠান।

উঠছে। পুরনো আলিপুরদুয়ারের মধ্যে তখন বসবাসের সীমাবদ্ধতা, খানিকটা শহুরে ভাব। তবে জানা দরকার, আলিপুরদুয়ারের সরকারি নির্দেশে পুরসভা এবং কলেজ— দুটোই অনুমোদিত হয় ১৯৫৭-তে। আলিপুরদুয়ারেও তখন আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ির কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। দুর্গাবাড়ির শতবর্ষে একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। জানা যাচ্ছে, কালীবাড়ি থেকে দুর্গাবাড়ি— এখন তা এক বিশাল প্রতিষ্ঠান। শতবর্ষ অনুষ্ঠান হয়েছিল ৭ অক্টোবর, ১৯৯৭ থেকে কয়েক মাস ধরে। ১৮৭৬-এ আলিপুরদুয়ার স্থায়ী মহকুমা হওয়ার পর ক্রমে জনপদ স্থায়ীভাবে গড়ে উঠতে থাকে। কিছু কিছু পুজোর সূচনা ঘটে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সেই শহরে জনসংখ্যা ছিল ৫০৪ জন মাত্র! সাতের দশকে শহরের ঘুম ভাঙা।

আলিপুরদুয়ার পুর এলাকার সর্বজনীন পুজো নিয়ে পবিত্রভূষণ সরকার তাঁর একটি লেখায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অরবিন্দনগর, কোর্টপাড়া, নিউটাউন দুর্গাবাড়ি, নিউটাউন বাজার সমিতি, চিত্তরঞ্জন পল্লি, নেতাজি রোড সর্বজনীন দুর্গোৎসব, পূর্ব শান্তিনগর বারোয়ারি (১৯৭০), উত্তর দেবীনগর সর্বজনীন দুর্গোৎসব, সুকান্তপল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব, আলিপুরদুয়ার বাবুপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব, স্টেশন রোড সর্বজনীন দুর্গোৎসব, দেশবন্ধুনগর সর্বজনীন দুর্গোৎসব, ইটখোলা দুর্গাবাড়ির পুজো— এমনভাবে একের পর এক পুজো বেড়ে চলেছে। দেবীনগর, শান্তিনগর, পুরাতন পূর্ব আলিপুরদুয়ার, সুভাষপল্লি, দ্বীপচর, নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশন, নিউ শোভাগঞ্জ, মায়া টকিজ হল্ট, আলিপুরদুয়ার চৌপথি— এমন কত পুজো! সব নাম উল্লেখ করা গেল না। তবে এখন ডুয়ার্সে মিলন সংঘ, এগারো হাত কালীবাড়ি, হোয়াইট হাউস— এমন কত ঐশ্বর্য, জাঁকজমকের পুজো। অতীতের মানুষ কোনও দিনও ভাবেনি, এখনকার বিশাল দুই লেনের আলো দিয়ে সাজানো রাস্তার কথা। তবে কৃষ্ণচূড়ার সমারোহ হারিয়ে গিয়েছে। আমাদের যৌবনে, তারও আগে পুজোর মধ্যে একটা পারিবারিক আন্তরিকতা ছিল, তা ক্রমশ আলিপুরদুয়ারে নয়, সর্বত্র হারিয়ে যাচ্ছে। তবু গ্রামেগঞ্জে সেই আন্তরিকতা, লোকায়ত জীবনের স্বাদ আজও বেঁচে আছে। স্মৃতি উচ্চারিত এই লেখার সবকিছু লেখা যায় না। ১৫১টি মাতৃভাষার জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সের বৈচিত্র ব্যাপক ও বিশাল। তার তুলনা বিরল।

জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সের মানুষ ছেলেবেলা থেকেই চা-বাগিচা আর শ্রমিকের কথা শুনছে বা দেখছে স্বচক্ষে। আমরাও শৈশব থেকে 'কুলি' কথাটা শুনছি। চা-শ্রমিকের মর্যাদা আমরা দিতে পারিনি। ভারতের সুদূর প্রান্ত থেকে ছলে-বলে-কৌশলে আনা শ্রমিকরাও বাগিচায় বন্দি। তবু এটাই এখন তাঁদের দ্বিতীয় স্বদেশ। জলপাইগুড়ির প্রথম চা-বাগিচা ১৮৭৪-এ গাজলডোবায়। তবে সেখানেও সমস্যা। একের পর এক চা-বাগিচা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বিপন্ন চা-শ্রমিক আনন্দবাজার পত্রিকার (উত্তরবঙ্গ) ১৭.৭.২০১৪-তে হিসেব দিয়েছে— ২৬টি চা-বাগিচা বন্ধ। আমরা ছেলেবেলায় এই সমস্যার কথা তেমনভাবে জানতে পারিনি, তখন মিডিয়া বা গণমাধ্যমও ছিল দুর্বল। চা-বাগিচায় দুর্গাপুজো খুব বেশি হত না। বাঙালি মালিকানার বাগিচায় দু'-একটি পুজো দেখেছি। সেখানেও অবশ্য চলেছে আদিবাসীদের নৃত্যগান। সে এক অদ্ভুত সংস্কৃতি সমন্বয়। চা-শ্রমিকের দলও মিশে গেছেন দুর্গাপুজোয়। বহু জাতি, জনজাতির চা-বাগিচায় বা বৃহত্তর চা-অঞ্চলে নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা ভাষা, লোকসংস্কৃতি চর্চার বিপুল বৈচিত্র। তখন এসব নিয়ে বেশি কিছু ভাবা হয়নি। এখন ডুয়ার্সে লোকসংস্কৃতি চর্চা বড়ই সম্ভাবনাময় একটা দিক। আর আছেন নেপালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক অসংখ্য মানুষ। এখন নেপাল নয়, এই ভারতই তাঁর স্বদেশ। আঞ্চলিকতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটা আমরা দেখিনি ডুয়ার্সে, এখনও তেমন প্রবল নয়, তবু বাতাসে বিষ ভাসছে, রাজনীতি তার সীমা ছাড়াচ্ছে।

আবার ফিরতে হয় পুরনো দিনের পুজোয়। পুজো মানেই নতুন জামাকাপড়, নতুন ফ্যাশন— এটা আগেও ছিল, তবে এখনকার মতো প্রবলভাবে নয়। অবশ্য ফ্যাশন তাঁদের কাছেই, যাঁদের আর্থিক কৌলীন্য আছে। তবে পুজোর পর পুজো আসে, ফ্যাশন বদলায়, ঢোলা প্যান্ট, চাপা প্যান্ট, লম্বা বড় কলার, আবার ছোট কলার জামায়। মেয়েদেরও তা-ই— চাপা শ্লাকস, ঢিলে পাজামা, আবার টাইট ক্যাপ্রি অথবা এখনকার জিন্‌স মেয়ে-পুরুষের ভেদাভেদ তুলে দেয়। এখন লেগিংস, কিন্তু কতদিন? আবার শাড়ি-ব্লাউজের চিরন্তন মহিমা বেঁচে থাকে।

ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবামের অনেক ছবিই ঝাপসা। পুরনো দিনের অনেক কিছুই হারিয়ে গিয়েছে। নিষ্ঠা, অমায়িকতা, আন্তরিকতা আর দেখিনি। পুজো এখন 'থিম'-নির্ভর, প্রদর্শনীর নামান্তর। তবে এটাও ঠিক, অসংখ্য মানুষের জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা দুর্গাপুজো এখন সর্বসম্প্রদায়ের। হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্যরাও এগিয়ে এসেছে। বহু বছর থেকেই মালদার দুর্গাপুজোয় সম্পাদক হচ্ছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ, আবার সর্বজনীন ইদ উৎসবও চলছে। এসবই আমাদের স্মৃতিতে ভাসছে। তবে পুজো সেকালেও ছিল, এখন তা সাংস্কৃতিক উৎসব।

দুর্গাপুজো মানেই শহরে হইহই কাণ্ড, মাইকের কানফাটা চিৎকার, ভিড়, কেনাকাটা। কিন্তু তখন হাটপাড়া, তুরতুরি, কার্জিপাড়া, পানবাড়ি, খুঁটিমারি ফরেস্ট, দমনপুর অনেক নীরব, উদাসীন। ডিমা নদী বা তিস্তার চরেও সেই উন্মাদনা নেই। মনে আছে, সাতের দশক থেকে অভাবের তাড়নায় মানুষ বেছে নেয় প্যান্ট। গরিব মানুষ, চাষিও আজকাল প্যান্ট পরছে। তার নাম বাংলাদেশি প্যান্ট বা জামা। একটি সস্তা ধুতির চেয়ে অনেক বেশি টেকসই, অনেক সস্তা। তাই ভিয়েতনাম যুদ্ধ আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমাদের রুচি পালটে দিয়েছে। চল্লিশ বছর আগেও দেখেছি, গ্রামের কৃষক পিচ রাস্তার ধারে ধান ঝাড়ছে— তার বুকের গেঞ্জিতে লেখা— 'লাভ মি' অথবা টাইট প্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি পরে তরুণ কৃষক জমিতে লাঙল দিচ্ছে। পুজোর ষষ্ঠী থেকে দশমী— অনেকের কাছেই অর্থহীন, প্রতিদিনের মতোই গতানুগতিক। অবস্থা বদলায়নি পঞ্চাশ বছরেও।

তবে একদিন এই দুর্গাপুজোয় মা দুর্গার সপরিবারে আসা আর চলে যাওয়া নিয়ে আগমনি-বিজয়ার অসংখ্য গান লেখা হয়েছিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সেই দিনগুলো অ্যালবামের পাতায় ঝাপসা। এখন টিভি-সুন্দরী ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামগঞ্জে। মহানগরী থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায়। বিশ্বায়নের হাত ধরে বিশ শতকের শেষ দশক থেকেই আমরা রুচির দিক থেকে অনেক খোলামেলা। আমরা ভাবছি, নারী স্বাধীনতা মানেই পোশাকের স্বাধীনতা। এই ভ্রান্তি কবে ঘুচবে জানি না। তবু এখন মিশ্র সংস্কৃতির যুগে জিন্‌সের সঙ্গে নাকছাবি মানায়।

অতীতের মানুষ কোনও দিনও ভাবেনি, এখনকার বিশাল দুই লেনের আলো দিয়ে সাজানো রাস্তার কথা। তবে কৃষ্ণচূড়ার সমারোহ হারিয়ে গিয়েছে। আমাদের যৌবনে, তারও আগে পুজোর মধ্যে একটা পারিবারিক আন্তরিকতা ছিল, তা ক্রমশ আলিপুরদুয়ারে নয়, সর্বত্র হারিয়ে যাচ্ছে। তবু গ্রামেগঞ্জে সেই আন্তরিকতা, লোকায়ত জীবনের স্বাদ আজও বেঁচে আছে।

আমরা পঞ্চাশ বছর আগে ভাবতেও পারিনি। দুর্গাও এখন আধুনিকা!

দ্বিতীয় পর্ব

শরৎকালের সঙ্গে, দুর্গাপুজোর উৎসবের সঙ্গে বাঙালি জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রুচি বদলায়, মানসিকতাও। তবু অতীত স্মৃতি বেঁচে থাকে। ফরাসি কবি স্তেফান সালার্ম (১৮৪২-৯৮)-এর একটি গদ্য-কবিতার মধ্য পর্বে আছে— 'এভাবেই আমার বছরের সবচেয়ে প্রিয় ঋতু হয়ে দাঁড়ায় শেষ গ্রীষ্মের ম্রিয়মাণ দিনগুলি, যা তখনই শরৎকে ডেকে আনে...।' এই কবিতা পড়তে পড়তেই আমি চলে যাই আমার শৈশব ও বালক বয়সের দিনগুলোয়। সে অনেক বছর হয়ে গেল। তখন তো টিভি ছিলই না, রেডিয়ো পর্যন্ত দুর্লভ ছিল। তবু দোকানে দোকানে বক্স লাগানো থাকত শ্রোতাদের জন্য— অবশ্যই সব দোকানে নয়। ট্রানজিস্টারও ছিল না। তবু আমরা শুনেছি রেকর্ডের গান— 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা— নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা।' অথবা 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি। আহা, হাহা, হা।' রবীন্দ্রনাথ বোধহয় সকল কালের জন্যই এ গান লিখেছিলেন।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে চলে যাই আমার প্রিয় শৈশবের বেলাভূমিতে। তখন জলপাইগুড়ি শহর মানেই উত্তরবাংলার প্রশাসন ও সংস্কৃতির রাজধানী। ছোট শহর, কিন্তু ঝকঝকে পিচের রাস্তাঘাট, দোলনা ব্রিজ, কিং সাহেবের ঘাটের কাছে অর্ধচন্দ্রাকার ফুটব্রিজ। হাকিমপাড়ায় লাল রঙের সরকারি বাড়ি, সামনে বাগান, তবু নিষেধের পাহারা সর্বদা প্রস্তুত দিশি-বিদেশি সাহেবদের জন্য। টাউন ক্লাবের মাঠে স্টেডিয়াম নেই, বেড়া নেই। সবুজ রং করা টাউন ক্লাবের টিনের ঘর। উলটো দিকে বন বিভাগের সাধারণ কর্মচারীদের জন্য কাঠের কালো রং করা, সামনে খোলা বারান্দার সারি সারি টিনের বাড়ি। আট ফুটের পিচের রাস্তা চলে গেছে তিস্তার দিকে, বনপালের বাড়ির দিকে, চিকিৎসা দপ্তরের প্রধান আধিকারিকের দোতলা লন বাড়ির দিকে। তখন তো তিস্তার বাঁধ ছিল না। রাস্তাটা ঘুরে চলে গেছে জেলা স্কুলের দিকে। সেই রাস্তার একদিকে তিস্তার বালুকাময় ক্ষীণ স্রোতের ধারা, তিস্তা তো অস্থিরমতি। কখনও থাকে জলপাইগুড়ি শহরের দিকে, আবার কখনও সরে যায় বার্নেশ ঘাটের দিকে— ময়নাগুড়ির দিকে। শৈশবের এক বছরের ময়নাগুড়ি।

আকাশে শরতের সাদা টুকরো মেঘের ডেলা, তিস্তার চরে কাশ ফুল। সূর্যের তেজ কমে আসছে, বেলা ছোট হয়ে আসছে, আমরা ছোটরা, বড়রাও বুঝে যায়— 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ'। তখন তো তিস্তার নতুন সেতু তৈরি হয়নি। ভরসা নৌকো আর বিশাল চর পার হওয়ার জন্য হয় পায়ে হাঁটা অথবা ডেসমন্ড ডয়েগ কথিত অতি জীর্ণ পুরনো 'তিস্তা টাইগার' নামক চট ও খড়ের গদির ট্যাক্সি গাড়ি! চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে সেইসব চর-ট্যাক্সি। এভাবেই অতীত হারিয়ে যায়। এখন ডুয়ার্স ও জলপাইগুড়ির মধ্যে কংক্রিট সেতু, রেল লাইন।

শরৎ এলেই আমরা ছুটতাম তিস্তার ধারে। কাশ ফুল বাতাসে দুলতে দুলতে মাথা নুইয়ে আমাদের ডাক পাঠাত। হাকিমপাড়ার সর্বজনীন দুর্গাপুজোর তখন খুব নামডাক। তবু প্যান্ডেলে ঢাক বাজত, মাইক ছিল না, পুরোহিতমশাই আসতেন কৃষ্ণনগর থেকে। অতি সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান মানুষ, স্বপাকে খেতেন।

তখন জলপাইগুড়ি-কলকাতার দূরত্ব সারা ব্রিজ দিয়ে ছিল এখনকার চেয়ে অনেক কম। সাহেব-মেমসাহেব নিয়ে কঠোর নিয়ম মেনে ছুটত দার্জিলিং মেল। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই পাওয়া যেত কলকাতার টাটকা খবরের কাগজ আর ফিরপোর রুটি। কলকাতার সঙ্গে শহরের মানসিক দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। তাই কলকাতার নিত্যনতুন সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ঢেউ, সাময়িক পত্রপত্রিকা, পুজোর বিশেষ সংখ্যা, নতুন কালের ফ্যাশন— সবই অতি দ্রুত চলে আসত জলপাইগুড়িতে। সেই ঢেউ তখন উত্তরের অন্য শহরগুলোয় অত সহজে যেত না। শিলিগুড়ি তখনও পর্যন্ত এতটা বড় হয়নি। ছাড়িয়ে যায়নি জলপাইগুড়িকে। আলিপুরদুয়ার উদ্বাস্তু শহর হয়েও বেড়ে উঠেছে, বড় হচ্ছে!

পুজোর মধ্যে আমাদের বিশেষ মনে পড়ে জলপাইগুড়ি শহরের প্রতিমা বিসর্জনের দিনটি। করলা নদীর সব পানা জঙ্গল পরিচ্ছন্ন করে আলো দিয়ে সাজানো দু'টি তীর। বিপুল ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে বাজি আর তারাবাতির চমক। নানা মাপের নৌকোয় ঘোরানো হত প্রতিমা। বেশ কয়েকবার পরিক্রমার পর বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠত। প্রতিমা জলে বিসর্জন দিয়ে ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফেরা। গুরুজনদের প্রণাম, সমবয়সিদের কোলাকুলি, মিষ্টি খাওয়া— সবই হয় এখনও। তবু আমরা বুঝতে পারি, সময়টা বদলে গিয়েছে। ছেলেমেয়েদের পোশাক, আচার-আচরণ পালটে গিয়েছে। নারী এবং পুরুষের মেলামেশার যে নৈকট্য বেড়েছে, তখন তা ছিল না। তখন একটা অদৃশ্য দেয়াল বাধা হয়ে থাকত। সেই বাধাটা ভাল না মন্দ তা বিচার করে লাভ নেই। সেই পুরনো জলপাইগুড়ির দুর্গাপুজোর ভাসানের নিখুঁত ছবি পাওয়া যাবে সুলেখক সুরজিৎ দাশগুপ্তর লেখা 'বিদ্ধ করো' উপন্যাসে। "পুজো, পুজো, পুজো। দেখতে দেখতে পুজো শেষ। করলা নদীতে ভাসান। কত নৌকো— জোড়া নৌকো, বড় নৌকো, ছোট নৌকো, দিশি নৌকো, কতরকম বাহার করে সাজানো হল দুপুর থেকে। ছোট নৌকোগুলোর সাজের বাহার দেখবার জিনিস।... নদীর দু'পারে হাজার হাজার লোক, জলের ধারে শালের খুঁটি পুঁতে বাঁশের বেড়া, তবু ভিড়ের চাপে এক এক জায়গায় বেড়া ভেঙে পড়তে চায়।" আলিপুরদুয়ারে বিসর্জনের মিছিল অতিকায় এবং আলোর বাহুল্যে চমকপ্রদ, কিন্তু নৌকোবিলাস এখানে নেই। তবে আছে তারুণ্যের অপরিমেয় প্রাণশক্তির প্রকাশ। এই শক্তি কাজে লাগবে কবে?

অর্ণব সেন

সাতের দশক থেকে অভাবের তাড়নায় মানুষ বেছে নেয় প্যান্ট। গরিব মানুষ, চাষিও আজকাল প্যান্ট পরছে। তার নাম বাংলাদেশি প্যান্ট বা জামা। একটি সস্তা ধুতির চেয়ে অনেক বেশি টেকসই, অনেক সস্তা। তাই ভিয়েতনাম যুদ্ধ আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমাদের রুচি পালটে দিয়েছে। চল্লিশ বছর আগেও দেখেছি, গ্রামের কৃষক পিচ রাস্তার ধারে ধান ঝাড়ছে— তার বুকের গেঞ্জিতে লেখা— 'লাভ মি' অথবা টাইট প্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি পরে তরুণ কৃষক জমিতে লাঙল দিচ্ছে।

আজকের দেবী চালিত ডুয়ার্স

সাংসদ থেকে শুরু করে জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, জেলা পরিষদ সভাধিপতি, পৌরসভার প্রধান ও উপপ্রধান ডুয়ার্সের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ পদ ও দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এখন দেবীরাই। দৈনন্দিন সংসারজীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও কর্তব্যে কারও ত্রুটি নেই। দেবীপক্ষে সেইসব দেবীদের কাছে হাজির হয়েছিলেন 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রতিনিধিরা। পত্রিকার পক্ষ থেকে ডুয়ার্সের কৃতী কন্যাদের জানাই আগাম অভিবাদন।

রেণুকা সিনহা

সাংসদ, কোচবিহার

কলকাতার দমদম অঞ্চলের মেয়ে আমি। বিবাহসূত্রে ১৯৭৫ সালে কোচবিহারে আসা এবং স্থায়ী বসবাস শুরু। বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ির রাজনৈতিক পরিবেশে কংগ্রেস ঘরানা। শিক্ষকতাই ছিল পেশা। কলকাতার এয়ারপোর্ট গার্লস হাই স্কুল, সরোজিনী নাইডু কলেজ থেকে পাঠ শেষ করে কলকাতার একটি হাই স্কুলে পার্ট-টাইম শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু। কোচবিহারে এসে নতুন চাকরি এবং শিক্ষক সংগঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

দুই সন্তানকে বড় করে তোলার পাশাপাশি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিলাম। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তনের অনেক আগেই কোচবিহার শহরে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। বামেদের শক্ত ঘাঁটিতে ক্ষমতার হাতবদল হয় ১৯৯৫ সালে। এককভাবে কংগ্রেস দখল করে কোচবিহার পুরসভা। সেই নির্বাচনে লড়াই করে কোচবিহার শহরের ১ নং ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়ে ভাইস চেয়ারম্যান হই। এর পর ২০১৪ সালে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ নির্বাচিত হওয়া, পথ খুব একটা ছোট ছিল না। তবে রাজনৈতিক দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে কখনওই ফাঁকি দিইনি সংসার জীবনে। দুই পুত্রসন্তান বড় হয়ে নিজেরা সংসার গড়েছে। জেলার বাইরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তারা। বউমারাও শিক্ষকতা করছেন। এখন নিয়মিত কোচবিহার-দিল্লি যাতায়াত শুধু নয়, নিয়মিত মানুষজনের সঙ্গে যোগাযোগ, নদী ভাঙন, বন্যা পরিস্থিতি, ছিট সমস্যা—সবটাতেই মাথা ঘামাতে হয়। প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও রাখতে হয়। এরই মধ্যে খানিকটা অভ্যাসের দাস হয়েই সংসারও সামলাই, কোনও সংঘাত না করেই।

ডুয়ার্স অঞ্চলে নদী একটি বড় বিষয়। এর ভাঙন পরিস্থিতি বদলে দিচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থান। তাই নদী নিয়ন্ত্রণ বা নদীকে নিয়ে নতুন ভাবনার প্রয়োজন। ভুটান পাহাড়ের উপর নির্ভর থাকে ডুয়ার্সের নদীর আচরণ-গতিবিধি। তাই যৌথভাবে নদী নিয়ে কিছু করা গেলে ডুয়ার্সের মানুষ প্রত্যেক বছরের বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেত। সদিচ্ছা থাকলে এটা সত্যিই সম্ভব।

নূরজাহান বেগম

সভাধিপতি, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ

আমার জন্ম রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে। বাবা সচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন। ভূসম্পত্তি অনেক ছিল আমাদের। আমার স্কুল-কলেজে পড়ায় অবশ্য বাধা ছিল না। কিন্তু স্কুলজীবনে বাড়িতে থেকেই পড়তে হত বলে বাবার চোখ এড়িয়ে কিছু করার উপায় ছিল না। আর আমাদের পরিবারকে এখনও মানুষ সম্মানের চোখে দেখেন।

১৯৯৩-এ জলপাইগুড়ি এসি কলেজে ভরতি হওয়ায় আমার বাড়ির বাইরে থেকে পড়াশোনার অভিজ্ঞতা হল। আমি এসএফআই করা শুরু করলাম। বাড়িতে বামপন্থী রাজনীতিরই চল ছিল। এইভাবেই আমার বর্তমান প্রশাসক-রাজনৈতিক জীবনের শুরু বলা যায়। রাজনীতি করতে করতে আমি পঞ্চায়েতের ভোটে দাঁড়িয়েছি। জিতেছি। তারপর তিন বছর হতে চলল এই পদে। আমাকে অবশ্য বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে রাজনীতি করার পুরো স্বাধীনতা দিয়েছেন। ফলে পরিবারের দিক থেকে আমার আর কোনও অসুবিধা হয়নি। বাবাও এখন আর আপত্তি করেন না।

ডুয়ার্স নিয়ে আমার একটাই স্বপ্ন। চা-বাগানের সঙ্গে জড়িত থাকা মানুষগুলি মানুষের মতো বাঁচুক। আজ বাগান বন্ধ থাকায় ওদের থাকার মতো ঘরবাড়ি অবধি নেই। আমি তো চা-বলয়েরই মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তা-ই। কিন্তু এই স্বপ্নপূরণের জন্য আমার ক্ষমতা আর কতটুকু? ডুয়ার্সের জন্য কিছু করার আগে এই অনাহারী, বাসস্থান হারানো মানুষগুলিকে বাঁচাতে হবে। আমি ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, বাবা কত মানুষকে কতরকমভাবে সাহায্য করেছেন। প্রশাসক হিসেবে আমিও চাই সামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকতে। আমি আনন্দিত যে আমার স্বামী-সন্তান আমাকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে। তাই প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে আমার কোনও সমস্যাই নেই। ডুয়ার্সের কোনও স্বপ্নপূরণের জন্য আমার দরকার হলে আমি থাকব।

পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া

সভাধিপতি, কোচবিহার জেলা পরিষদ

জলপাইগুড়ি জেলার কন্যা, বিবাহসূত্রে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে স্থায়ী বসবাস। স্বামী কংগ্রেসের হয়ে বারবার লড়াই করে ভোটে হারলেও, আমি হার মানিনি। জয়ের মুখ দেখি রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের অনেক আগেই। তুফানগঞ্জ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি দখলে আসে আমাদের। বামেদের শক্ত ঘাঁটিতে ওই পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রীর দায়িত্ব পাই। তারপর ২০১৩ সালে ভোটে জিতে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচিত হই। দুই সন্তানের মা হয়ে শুধু সংসারের লড়াই নয়, গ্রামীণ পরিবেশে এক সময়কার দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএম-এর সঙ্গে লড়াই করে ক্ষমতা অর্জন করেছি।

রেণুকা সিনহা, সাংসদ

নূরজাহান বেগম, জেলা সভাধিপতি

পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া, জেলা সভাধিপতি

এথেনা মজুমদার, জেলা শাসক

সুমিতা ঘটক, ডিএফও

সীমা হালদার, মহকুমা শাসক

মমতা রায়, বিধায়ক

রেবা কুণ্ডু, পৌরপ্রধান

এই এগারো জনের বাইরেও ডুয়ার্সে আরও অনেক দেবী আছেন যাঁরা সংসার কর্মের পাশাপাশি কাজ করে চলেছেন মানুষের জন্য। সবাইয়ের কাছে এবার পৌঁছনো সম্ভব না হলেও আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

পাপিয়া পাল, উপ-পৌরপ্রধান

আমিনা আহমেদ, উপ-পৌরপ্রধান

রুমা চ্যাটার্জি, উপ-পৌরপ্রধান

জলপাইগুড়ি খারিজা বেড়ুবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। পড়াশোনা করেছি জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ির স্কুলে। স্বামী সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারী ছিলেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলে কৃষি বিষয় নিয়ে আগ্রায় পড়াশোনা করছে। ফুল, ফল, বন, বন্য প্রাণী, রাজ-ঐতিহ্যের ডুয়ার্সকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলাই আমার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য বলতে পারেন।

এথেনা মজুমদার

এডিএম, ল্যান্ড, আলিপুরদুয়ার জেলা

১৯৮১ সালে এম এ পাশ করে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মজীবন শুরু। কিন্তু প্রশাসক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত অঞ্চল কালচিনিতে জয়েন্ট বিডিও রূপে, ১৯৮৬-তে। কোচবিহারের বাসিন্দা হিসেবে ডুয়ার্সকে খুব কাছ থেকে চিনি। তাই নতুন জেলা আলিপুরদুয়ারের এডিএম পদে যোগ দিয়ে কাজ করতে কোনও অসুবিধা হয় না। সংসার সামলেও এত বড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে চলতে কোনও সমস্যাই হয় না। কারণ কাজ করার ইচ্ছে থাকলে যে কোনও পরিস্থিতিতেই তা করা যায়। আর আমি নিজে কাজ করতে ভীষণ ভালবাসি।

ডুয়ার্সের প্রকৃতি, মানুষ দারুণ সুন্দর। আর সব থেকে সুন্দর এখানকার জঙ্গল। এই জঙ্গলের টানে এখানে প্রচুর পর্যটক আসেন। জনগণ ও প্রশাসনের তালমিলে ডুয়ার্স তার জঙ্গল ও প্রকৃতিকে নিয়ে গড়ে উঠতে পারে পৃথিবীর এক অনন্যসুন্দর পর্যটনস্থল হিসেবে। সারা পৃথিবীর পর্যটন মানচিত্রে ডুয়ার্সকে ল্যান্ডমার্ক হিসেবে গড়ে তোলাটাই আমার স্বপ্ন বলতে পারেন। সম্ভব কি না বলছেন? অবশ্যই সম্ভব। একা জনসাধারণ যেমন এ কাজ করতে পারবে না, তেমনি প্রশাসনও সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ছাড়া এক পা-ও এগোতে পারবে না। তাই প্রয়োজন দুইয়ের সম্মিলিত প্রয়াস। আর কাজ করার, শুভকাজ করার মানসিকতা থাকলে অবশ্যই তা সম্ভব।

সুমিতা ঘটক

ডিএফও, জলপাইগুড়ি

প্রশাসক হিসেবে সিকি শতক পার করে দিলাম। সংসার সামলানোর কথা বলছেন? আমার তো একার সংসার। মাঝে মাঝে মা-বাবা এসে থাকেন। সত্যি কথা বলতে কী, গত ২৫ বছর ধরে বন্য প্রাণ, অরণ্য, জঙ্গল সাফারি— এসবই আমার সংসারের সদস্য হয়ে উঠেছে। আমি তো এসবের সঙ্গেই থাকি। এরাই আমার পরিবার। তাই সমস্যা নেই কোনও।

আসলে আমি তো দক্ষিণবঙ্গের মেয়ে। কাজের জন্য ডুয়ার্সে আসা। যদি বলেন ডুয়ার্স নিয়ে আমার কোনও স্বপ্ন আছে কি না, তবে বলব, ডুয়ার্স যেন গত ২৫ বছরে একটু একটু করে সতেজতা হারিয়ে ফেলছে। এমন হওয়ার কারণ, আমার বিবেচনা, পরিকল্পনার সমস্যা। ডুয়ার্সের সবুজ গন্ধ পুরোপুরি বজায় রেখে পর্যটনশিল্পকে যদি উন্নত করা যায়, তবে ডুয়ার্স নিয়ে আমি যে স্বপ্ন দেখি তা বাস্তবায়িত হবে। অবশ্য, এ স্বপ্ন তো ডুয়ার্সের প্রতিটি সচেতন মানুষই দেখেন। অনেক কিছুই করা যায় এখানে। কিন্তু তা করতে গিয়ে অরণ্য পরিবেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

জঙ্গল যত ছোট হয়ে আসবে, নগরায়ণ যত বাড়বে, ততই পরিবেশ বিঘ্নিত হবে। আপনারা যাঁরা স্থানীয় মানুষ, তাঁরা তো দেখছেনই ডুয়ার্সের বদল। এর কিছু কিছু আপনাদেরও খারাপ লাগে। সেসব বিষয় নিয়েই চিন্তা করা দরকার।

কাজের সূত্রেই আমি হয়ত এখান থেকে চলে যাব, আবারও ফিরেও আসব হয়ত। ফিরে এসে যদি দেখি ডুয়ার্স তার নিজস্বতা বজায় রেখে সুষ্ঠু পরিকল্পনার কারণে উন্নত হয়ে উঠছে, তবেই বুঝব আমার স্বপ্ন সার্থক হল।

সীমা হালদার

মহকুমা শাসক, জলপাইগুড়ি সদর

কোনও দিনও ভাবিনি প্রশাসনে আসব। চেয়েছিলাম বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করতে। কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়াশোনা। তারপর রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে কেমিক্যাল স্টাডি নিয়ে উচ্চশিক্ষা। পড়া শেষ হতেই চাকরির জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। চাকরি হয়েছিল, দিল্লি ও কেরলে। কিন্তু বাড়ির ছোট মেয়ের বাংলা ছেড়ে যাবার অনুমতি মেলেনি। পরে বন্ধুদের চাপে ডব্লিউবিসিএস-এ বসি। ‘সি’ ক্যাটেগরিতে মনোনীত হয়ে রেভিনিউ অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু। আবার ডব্লিউবিসিএস-এ নতুন করে বসি, এবার ‘এ’ গ্রুপ, পুরুলিয়ার বড়বাজারের বিডিও হিসেবে কর্মজীবন শুরু। এ জেলা-ও জেলা, এ ব্লক-ও ব্লক করে এই সেপ্টেম্বরে জলপাইগুড়ির সদর এসডিও হিসেবে যোগদান।

মধ্যমগ্রামের ছোট্ট সীমা এখন সদর এসডিও সীমা হালদার। নিজের নেশা, ভাললাগা, মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ, হিউম্যান স্টাডি করার সব সুযোগ পেয়েছি তিস্তাপারে এসে। ‘ধনধান্যপুষ্পে ভরা’ গানটা কতটা সার্থক— কোনও দিন জানতেই পারতাম না তিস্তাপারে না এলে। ডুয়ার্স নিয়ে বিস্তর ভাবনা রয়েছে— বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে নিয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার, পর্যটনশিল্পের সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আর ইচ্ছে চা-বাগান, বনবস্তির মেয়েদের সেল্‌ফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সঠিক পথ খুঁজে দেওয়া।

মমতা রায়

বিধায়ক, ধূপগুড়ি

রাজনৈতিক জীবন শুরু হওয়ার পর আর বাকিদের মতোই ধাপে ধাপে এগিয়েছি, কারণ রাতারাতি কিছু হওয়া সম্ভব নয়। বিধায়ক হয়েছি ২০১১-তে। কিশোরী বয়স থেকেই রাজনীতিতে নেমেছি। পরিবারে বামপন্থী রাজনীতির চর্চা ছিল। নিজে আইসিডিএস-এর কর্মী ছিলাম। তাই রাজনীতি আর সমাজসেবার সঙ্গে জড়িয়ে থাকাটা আমার অনেক দিনের এবং সেটাই আজ আমাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে।

সংসার সামলানোর প্রশ্নটা আমার ক্ষেত্রে খাটে না। সংসার বলতে আমার দাদা আর বউদি। মা-বাবা ছিলেন এই সে দিনও। তাই সংসারের কোনও টেনশন আমাকে নিতে হয় না। ওটা দাদা-বউদিই সামলায়।

ডুয়ার্স নিয়ে আমার স্বপ্ন অনেক। আমি জানি যে ডুয়ার্সের উন্নতির জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা হলে টাকার অভাব নেই। চা-বাগানের সমস্যাটা সমাধানের ব্যাপারে আগে বাস্তব উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আমার অনেক ভাবনা আছে, কিন্তু এখনই কিছু করার নেই আমার। অবশ্য সুযোগ যে আসবে তা আমি জানি। পর্যটনশিল্প এখানকার সম্পদ। এর জন্য টাকার সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেটা নিয়ে ঠিকমতো ভাবছে কি কেউ? যে যার মতো চলছে। আমাদের কথা শুনছে কে? কৃষিতে ডুয়ার্সের প্রচুর সুনাম হওয়ার কথা। কত রকমের ফল, শাকসবজি হয় এখানে। মেডিসিনাল প্ল্যান্টও অনেক হয় এদিকের মাটিতে। অথচ পুরো ব্যাপারটা অবহেলিত অনেকটাই। এখানেও চাই পরিকল্পনা। দুম করে লোক দেখানো কিছু করে লাভ নেই। আমার বিশ্বাস, একদিন এই স্বপ্নগুলি পূরণ করার সুযোগ খানিকটা হলেও মানুষ আমাকে দেবে। এর জন্য আমি সবসময় তৈরি থাকি। এখন ইচ্ছে থাকলেও করতে পারছি না। কিন্তু এ দিন বদলাবে। ডুয়ার্সের যথার্থ উন্নতি হবে।

রেবা কুণ্ডু

চেয়ারপার্সন, কোচবিহার পৌরসভা

জন্ম ধানবাদে, এর পর কলকাতার বারাকপুরে বড় হয়ে ওঠা, মামাবাড়িতে। পরবর্তীতে কোচবিহারে পড়াশোনা। মামাবাড়ি ও নিজের বাড়ি সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক পরিবেশ। স্বামী প্রয়াত বীরেন কুণ্ডু রাজনৈতিক মানুষ ছিলেন। প্রায় দুই দশক ছিলেন তিনি কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান। কলেজজীবনে ছাত্র পরিষদ, এর পর মহিলা কংগ্রেসে যোগ দিই। ঘর সামলে স্বামীর সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকতাম। যেমন পুরভোট পরিচালনার দায়িত্ব সামলানোর সঙ্গেই চলত ঘর-সংসার। একই সঙ্গে পুরসভায় স্থায়ী কর্মী ছিলাম। খুব অল্প বয়সে পদ্মজা নাইডুকে ফুল দিয়েছিলাম মনে আছে। দাদু ক্ষিতীশ সেনগুপ্ত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। অনুশীলন সমিতির কর্মী, পিসি প্রতিমা দাশগুপ্ত ছিলেন সক্রিয় রাজনীতিক। বাবা সুরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্তও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই রাজনীতি রক্তে আছে বলতে পারেন। দায়িত্ব সামলাতে সংসার ফাঁকির প্রশ্ন নেই। যদিও এখন পুত্রবধূকেই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুত্র শুভজিৎ কুণ্ডুও এই পুরসভার কাউন্সিলার। সংসার, স্বামী, সন্তান, পুরকর্মচারীর দায়িত্বের সঙ্গে রাজনীতিটা করতাম মন দিয়ে। কিন্তু খুন্তি নাড়ার কর্মটি ছিল নিয়মিত। বীরেন কুণ্ডুর মতো তিনিও মানুষকে খাওয়াতে ভালবাসতেন এবং সেটা নিজে রেঁধে। ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, সৌমেন মিত্রও এক সময় আমার হাতের রান্না খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলেন। ডুয়ার্সের অন্যতম মুখ কোচবিহার। তাই রাজ-ঐতিহ্যের এই শহরকে একটি আধুনিক শহর তৈরি করাই আমার একমাত্র ভাবনা বলতে পারেন।

পাপিয়া পাল

উপ-পৌরপ্রধান, জলপাইগুড়ি পুরসভা

প্রশাসকের ভূমিকায় আমি ইনিংস শুরু করি ২০১০-এ। কাউন্সিলার হিসেবে নির্বাচিত হই প্রথমবার। তারপর এ বছরও জিতলাম। উপপৌরপতি হিসেবে শপথ নিলাম। আসলে আমার যে রাজনীতিতে আসার ইচ্ছে আগাগোড়াই ছিল, এমন নয়। বিয়ের পর দেখলাম আমার স্বামীর একটি রাজনৈতিক বিশ্বাস রয়েছে। তিনি তখন পৌরসভার কাউন্সিলার। ফলে বিয়ের পর থেকে এক ধরনের রাজনৈতিক আবহাওয়ার সঙ্গে আমি জড়িয়ে যেতে শুরু করি।

তবে পরিবারকে তো সময় দিতেই হবে। আমার সুবিধা হল, শ্বশুরবাড়িতে যৌথ পরিবার। শাশুড়ি মা খুবই সহযোগী। এখনও অবধি তেমন কোনও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। উপপৌরপতি হওয়ার পর আরও সময় দিতে হচ্ছে শহরের কাজে। কিন্তু পরিবার সামলাতে কোনও অসুবিধা নেই।

আমি তো ডুয়ার্সেরই মেয়ে। এই শহরেই জন্ম। ডুয়ার্স নিয়ে অনেক স্বপ্ন। তবে সে স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আমাদের জননেত্রী অত্যন্ত আন্তরিকভাবে উদ্যোগ নিচ্ছেন। তাঁর পদক্ষেপগুলি ডুয়ার্সের পর্যটনশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমার মনে হয় যে, তিনি চলচ্চিত্রশিল্পে ডুয়ার্সকে ব্যবহার করার জন্য যে ভূমিকা পালন করছেন, তা অনেক স্বপ্নপূরণে সহায়তা করবে।

আরেকটা স্বপ্ন হল, আমার শহর জলপাইগুড়িকে পর্যটনের একটি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। তিস্তার পাড়কে সাজানো হচ্ছে। পরিকল্পনামাফিক কাজ করার পর দেখবেন, ওটা দারুণ আকর্ষণীয় স্থান হবে পর্যটকদের কাছে। রাজবাড়ির দিঘির সংস্কার হচ্ছে। তিস্তা উদ্যান তো আছেই। এসব সাজিয়ে-গুছিয়ে আমরা ঠিক করে নিতে পারলেই জলপাইগুড়ি শহর পর্যটনের ঘাঁটি হিসেবে খুব একটা কম যাবে না। আর সেটা আমরা করছিও। একটু সময়ের অপেক্ষা কেবল। উপপৌরপতি হিসেবে এই স্বপ্নপূরণের জন্য আমি যা করার অবশ্যই করছি এবং করব।

আমিনা আহমেদ

উপ-পৌরপ্রধান, কোচবিহার পৌরসভা

আপাত গৃহিণী মনে হলেও পুরোপুরি রাজনীতিক। ছেলেমেয়ে দু'জনই আইন বিষয় নিয়ে পাঠরত। মাইথনে জন্ম, আসানসোলে পড়াশোনা হলেও, কলকাতা থেকে ১৯৯১ সালে বিবাহসূত্রে আসি কোচবিহারে। ২০১০ সালে তৃণমূলের প্রতীকে লড়াই করে প্রথম পুরসভা নির্বাচনে জিতে কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ডের ভাইস চেয়ারপার্সন হই। ২০১৫-তেও তৃণমূলের নেতৃত্বে গঠিত পুরবোর্ডের ভাইস চেয়ারপার্সনের দায়িত্বে পেয়েছি।

ঘর-সংসার সামলাবার প্রশ্নে আমার বক্তব্য, প্রকৃতিগত কারণেই নারীকে বিশেষ কিছু ক্ষমতার অধিকারী করে দেন ঈশ্বর। তাই কোনও অসুবিধাই হয় না সংসারজীবনে। ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব সামলানো নিয়মিত রুটিনের মধ্যে পড়ে। পোলাও, বিরিয়ানি রান্না করে লোক খাইয়ে বোধহয় কম খ্যাতি লাভ করিনি। কোচবিহার তথা ডুয়ার্স নিয়ে নিজস্ব ভাবনার কথা যদি বলি, আমাদের এই রাজনগরকে একটি আধুনিক পরিকল্পিত শহরে পরিণত করাই আমার অন্তরের ইচ্ছে। যা বাস্তবে সম্ভব বলেই মনে করি।

রুমা চ্যাটার্জি

উপ-পৌরপ্রধান, আলিপুরদুয়ার পৌরসভা

ডুয়ার্সের কন্যা হিসেবে বাবার হাত ধরে সেবামূলক কাজে পথ চলা শুরু। জনসেবা থেকে আজ কাঁধে তুলে নিয়েছি জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব। ১৯৯৮ সালে প্রথম কাউন্সিলার হিসেবে জয়ী হই। সেই থেকেই জনসেবার কাজে নিযুক্ত। তবে সংসার সামলে এত বড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে চলতে অসুবিধা হয় না, অভ্যাস হয়ে গেছে। স্বামীও সাহায্য করেন। দু'জন মিলেই সংসার সামলে সেবামূলক কাজে ব্যস্ত থাকি। ডুয়ার্স নিয়ে অনেক কিছু করা যায়। এখানে চা-বাগাননির্ভর শিল্প গড়ে তোলা এবং তার সঙ্গে পর্যটনশিল্পকেও তুলে ধরা যায়। চা-বাগানের সমস্যা আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা তো করছিই, বিভিন্ন ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। আর যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটলে ডুয়ার্সের পর্যটনে জোয়ার আসা সম্ভব। এতে হাজার হাজার বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানও সম্ভব হবে।

প্রতিবেদন ঃ পিনাকী মুখোপাধ্যায়, শুভ্র চট্টোপাধ্যায়, তমাল গোস্বামী ও শুভব্রত কুণ্ডু

বদলে যাচ্ছে মালবাজার !

উত্তরে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা গিরিরাজ হিমালয়। তারই পাদদেশে গাঢ় সবুজ ইউনিফর্মে প্রার্থনারত ছাত্র-ছাত্রীর মতো সারিবদ্ধ অসংখ্য চায়ের গাছ, আর সেই চা-গাছসমূহকে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য মাথায় ছাতা ধরে থাকা প্রচুর শেড-ট্রি বা ছায়া বৃক্ষ ডুয়ার্সের যে শহরটিকে উত্তর-পশ্চিমে ঘিরে রেখেছে এবং হিমালয়ের কোল থেকে নেমে আসা স্বর্গের নৃত্যরতা অপ্সরার মতো সুন্দরী মাল নদী যে শহরের পূর্ব সীমান্ত ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে সেই শহরই হল পশ্চিম ডুয়ার্সের রানি— আমাদের প্রিয় মালবাজার।

শুধু সৌন্দর্যে নয় সামাজিক দিক দিয়েও মালবাজারের গুরুত্ব অপরিসীম। মালবাজার এমন এক শহর যেখানে বছরের পর বছর ধরে বাঙালি, বিহারি, মারোয়ারি, নেপালি, আদিবাসি, রাজবংশী প্রভৃতি জাতি হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ পাশাপাশি বসবাস করছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা নিজেদের সামাজিক আচার-আচরণ থেকে শুরু করে ধর্মীয় উৎসব পর্যন্ত সম্মিলিত ভাবে পালন করে আসছে। হিন্দুদের দুর্গা পুজো থেকে মুসলিমদের ঈদ, বৌদ্ধদের বুদ্ধ জয়ন্তী থেকে খ্রিস্টানদের বড়দিন কিংবা আদিবাসি সমাজের করম পুজো, মালবাজারের সব উৎসবই সার্বজনীন। হিন্দুদের দুর্গা পুজো বা দেওয়ালিতে যেমন মুসলমান নারী-পুরুষরা সেজেগুজে ঠাকুর দেখতে বেরোয়, তেমনই মুসলমানদের ঈদে সেওয়াইয়ের পায়েস আর বিরিয়ানি চেটেপুটে খায় হিন্দু বন্ধুর দল। আবার বড়দিনের কেক যেমন হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রিস্টান এই শহরে ভাগ করে খায় তেমনই লক্ষ্মী পুজো সেরে এই শহরের হিন্দু রমণীরা ছোটে বুদ্ধ মন্দিরে ফানুস ওড়াতে। ভারতবর্ষের বৈচিত্রের মাঝে ঐক্যের সেরা বিজ্ঞাপন হল ডুয়ার্সের মালবাজার। আর তাই তো মালবাজারকে বলা হয় ভারতবর্ষের এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপ।

মালবাজারের এই অখণ্ডতাকে অটুট রাখতে সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্বপন সাহার নেতৃত্বাধীন মাল পৌরসভা। আর এই কাজে মাল পৌরসভা প্রতি মুহূর্তে পাশে পাচ্ছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেব, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ সৌরভ চক্রবর্তী এবং অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বার বার ডুয়ার্সে ছুটে এসে, এই অঞ্চলের মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুঝেছেন মালবাজার শহরের এই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এই শহরের সার্বিক উন্নতি দরকার। শহরের সৌন্দর্য্যায়নের পাশাপাশি প্রয়োজন পরিকাঠামোগত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।

আর তাই সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে দ্রুত বদলে যাচ্ছে মালবাজার। এ বছর একুশে ফেব্রুয়ারির পর যারা মাল শহরে আসেননি তারা আজ মালবাজারে এলে হয়তো ভাববেন এ কোন শহরে এলাম! এই কি আমাদের মালবাজার! বিশেষত ভাষা শহিদ চক, যেখানে এসে দাঁড়ালে মনেই হয় না এটাই পুরনো ক্যালটেক্স মোড়। ভাষা শহিদ স্মরণে নির্মিত

উন্নত নাগরিক পরিষেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

মালবাজার পৌরসভা

স্বপন সাহা, চেয়ারম্যান, মালবাজার পৌরসভা

এই ত্রিকোণ স্থানটির সৌন্দর্য্যায়ন যেন ভোজবাজির মতো বদলে দিয়েছে ক্যালটেক্স মোড়কে। শহিদ স্মারক নির্মাণের পাশাপাশি শহরের সৌন্দর্য্যায়নের অঙ্গ হিসেবে বহু বছর যাবৎ ওই স্থানে পূজিত হয়ে আসা ছোট্ট কালী মন্দিরটিকেও সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

এ ছাড়া জাতীয় সড়কের দু'ধারের অব্যবহৃত খালি জায়গা ঢালাই করে চওড়া করার পাশাপাশি মহকুমা শাসকের দপ্তর, থানা, হাসপাতালের মতো শহরের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অত্যাধুনিক যাত্রী প্রতিক্ষালয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এভাবেই রাস্তা, নালা, মাঠ, পথবাতি, রোগ নির্মাণের মতো শহরের সৌন্দর্য্যায়নের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ— পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় স্বপন সাহার নেতৃত্বে যৌবনের প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর মাল পৌরসভার উদ্যোগে শহরের সর্বাঙ্গীন বিকাশ তথা উন্নয়নের লক্ষ্যে মালবাজার শহরবাসীর আশীর্বাদ নিয়ে অপ্রতিহত গতিতে ছুটে চলেছে মাল পৌরসভা।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

হরিমালিকের দুর্গাপুজো দেড়শো বছর পেরিয়েও উজ্জ্বল

আজ থেকে প্রায় একশো পঁচাত্তর বছর পূর্বে অধুনা উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার ছাতা গ্রাম থেকে ভাগ্যান্বেষণে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে বাংলা প্রদেশের পশ্চিম ডুয়ার্সের ক্ষুদ্র জনপদ ডামডিমে এসে পৌঁছেছিলেন এক অল্পবয়সি তরুণ— ভিখারি শা। তারপর কিছুদিন এখানে থাকতে থাকতেই জায়গাটিকে তাঁর ভাল লেগে যায়। কারণ মালবাজার, ওদলাবাড়ির চেয়েও গুরুত্বে ডামডিম তখন অনেক এগিয়ে। তাই ভিখারি শা ঠিক করলেন, এখানেই পাকাপাকি ডেরা বাঁধবেন। পরবর্তীকালে নিজের আদি গ্রাম ছাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও আর সেখানে ফিরে যাননি। ডামডিমেই থেকে যান এবং ব্যবসা শুরু করেন। তখন থেকেই শা পরিবার ডামডিমের স্থায়ী বাসিন্দা। সেই শা পরিবারের দুর্গাপুজোই ডুয়ার্সের পুরনো পুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে ভিখারি শা-র তিন পুত্রসন্তানের অন্যতম বালগোবিন্দ শা ডামডিম পোস্ট অফিসের পাশে শা পরিবারের নিজস্ব জমিতে ডুয়ার্সের অন্যতম প্রাচীন এই দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। বালগোবিন্দের পর তাঁদের পারিবারিক দুর্গাপুজোকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব এসে পরে তাঁর ছেলে উত্তিমচাঁদের উপর। ইতিমধ্যে ব্যবসায়, বিশেষ করে গাঁজার ব্যবসায় প্রভূত সাফল্য আসে। ডামডিম এবং সংলগ্ন এলাকায় শা পরিবারের ব্যবসা এবং দুর্গাপুজোর জৌলুস অনেকাংশে বেড়ে যায়। প্রচুর জমি-জায়গার মালিক হয়ে ওঠা জোতদার হরিহরপ্রসাদকে এলাকার মানুষ তখন হরিমালিক বলেই সম্বোধন করত। তখন থেকেই শা পরিবারের পারিবারিক দুর্গাপুজো হরিমালিকের পুজো নামে খ্যাত হয়। সাতের দশকের গোড়ায় হরিহর প্রসাদ শা প্রয়াত হবার পর থেকে তাঁর সন্তানরা এই গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন। যদিও শা পরিবারের সেই রমরমা এখন অস্তমিত। তবুও পুজোর জৌলুস এতটুকু কমেনি। বর্তমান প্রজন্ম অর্থাৎ হরিহরপ্রসাদ শা-র চার ছেলে অনিলপ্রসাদ, সুনীলপ্রসাদ, রাজকুমারপ্রসাদ এবং সুশীলপ্রসাদ শা যৌথভাবে ডামডিম তথা ডুয়ার্সের ঐতিহ্যশালী এই দুর্গাপুজোকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অনিলপ্রসাদ শা-র সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে, মহালয়ার পরদিন সম্পূর্ণ বৈদিক মতে শা পরিবারের দুর্গাপুজো শুরু হয়। তার আগে মৃৎশিল্পীরা প্রতি বছর পুরনো মূর্তি ভেঙে নতুন করে একচালার দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করেন। কারণ শা পরিবারের এই দুর্গাপুজোয় প্রতিমা বিসর্জন হয় না, শুধুমাত্র ঘট বিসর্জন দেওয়া হয়। এই পুজোর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বলি। ষষ্ঠীতে বেল গাছকে পুজো করে বলির জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সপ্তমীতে প্রথম বেল ফল বলি দেওয়া হয়। তারপর হয় পাঁঠাবলি।

অষ্টমীতে রাত বারোটায় হয় চালকুমড়ো বলি এবং নবমীতে পরিবারের বাইরের ভক্তরা তাঁদের মনস্কামনাপূরণে মায়ের সামনে পাঁঠা, চালকুমড়ো ইত্যাদি বলি দেবার সুযোগ পান। গত তিন বছর ধরে নবমীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় কুমারীপুজোও হচ্ছে। নবমীর দিন প্রায় দু'হাজার ভক্তের জন্য পুরি-তরকারি, মিষ্টান্ন সহযোগে বিশেষ প্রসাদ বা ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি এবং নবমীতে কীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। দশমীতে ঘট বিসর্জনের মাধ্যমে পুজোর সমাপ্তি হয়। এর পর লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন দুর্গাপুজোর সকল অনুষ্ঠান মঙ্গলমতো সম্পন্ন করার জন্য এক বিশেষ যজ্ঞের আয়োজনের মাধ্যমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

ডামডিমে বেশ কয়েকটি বারোয়ারি পুজো অনুষ্ঠিত হলেও এখনও ডামডিম এবং সংলগ্ন অঞ্চলের দুর্গাপুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হরিমালিকের দুর্গাপুজো। ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখনও পুজোর তিন দিন শয়ে শয়ে দর্শনার্থী আসেন ডুয়ার্সের ইতিহাসের সাক্ষী এই দুর্গাপুজোয় শামিল হতে।

সুধাংশু বিশ্বাস

প্রশাসনিক উদাসীনতায় উদ্বাস্তু হতে হয়েছে বাংলাদেশে ভারতীয় ছিটবাসীদের

ছিট চুক্তি কিংবা জনসমীক্ষার কাজ শেষ। কিন্তু বাংলাদেশে ভারতীয় ছিটবাসীদের অন্তর থেকে ভূমিদস্যু কিংবা মৌলবাদি শক্তির মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের অত্যাচার কি মুছে ফেলা গিয়েছে? আজকের **চতুর্থ কিস্তিতে** পড়ুন সেই করুণ কাহিনি।

১৯৯২ সালের ২৬ জুন, ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমা চুক্তির ১৪ নং অনুচ্ছেদের ১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়নের আনুমানিক ২.৬৪ বর্গমাইল এলাকা ভারতের অধীনে থাকার বিনিময়ে বাংলাদেশের দু'টি বৃহত্তম ছিটমহল দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতাকে সে দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিন বিঘা করিডর লিজ কার্যকর হয়। দু'দেশের সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশের লক্ষ্যে হয়ত বা ভারত সরকার ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির দায়বদ্ধতা পালনে আন্তরিকতা দেখিয়েছিল। আন্তর্জাতিক চুক্তির আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা। যদিও সে দিন তিন বিঘা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে উঠেছিল হাজারো প্রতিবাদ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসীমা রাও এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দৃঢ়ভাবে এই চুক্তি রূপায়ণে ছিলেন বদ্ধপরিকর। হয়ত প্রত্যাশা ছিল দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি। কিন্তু তিন বিঘা লিজ কার্যকরের অব্যবহিত পর থেকেই যে সকল ঘটনা সীমান্ত এলাকায় ঘটতে থাকল তা এক কথায় হৃদয়বিদারক।

দহগ্রামে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (পড়ুন হিন্দু সম্প্রদায়) বেশ কিছু বাড়িতে রাতারাতি অগ্নিসংযোগ করা হল। পুড়িয়ে দেওয়া হল বসতভিটা, ধানের গোলা, গোয়ালঘর ইত্যাদি। এক বস্ত্রে জীবন বাঁচাতে সেই সকল বাড়ির পুরুষ-মহিলারা তাঁদের সন্তানদের হাত ধরে পালাতে শুরু করলেন মেখলিগঞ্জের দিকে। কেউ কেউ কুচলিবাড়ির দিকে আস্তানা গাড়লেন। নতুন করে উদ্বাস্তু হলেন বেশ কিছু মানুষ। কোথায় সৌহার্দ, কোথায় সম্প্রীতি? সবকিছু যেন সোনার পাথরবাটি। যেন নতুন করে দেশভাগের যন্ত্রণা। আবার দ্বিজাতি তত্ত্বের পদধ্বনি। এক ভয়ংকর পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের জীবন-সম্ভ্রম বাঁচাতে দহগ্রাম ছেড়ে আসা কালাচাঁদ রায় পোদ্দারের কথায়, ১৯৯২ সালে

তিন বিঘা হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত দহগ্রামে পাটগ্রাম থানার পরিচালনায় নির্বাচনের মাধ্যমে তিনজন সদস্য নির্বাচিত করা হত। সেখানে নির্বাচকমণ্ডলীর মোট সদস্যর মোটামুটি ৭০০ জন ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। বাকি ভোটারদের মধ্যে প্রায় ১২০০ জন ছিলেন স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় এবং প্রায় ৫০০ জন ছিলেন ভাটিয়া মুসলমান সম্প্রদায়। কালাচাঁদবাবুর বয়ান অনুযায়ী ওই সময়কালে নির্বাচিত তিনজন সদস্য হলেন ললিতচন্দ্র রায় পোদ্দার, মহম্মদ মইনুদ্দিন মিঞা ও তফিজুল হক। ১৯৮০ সালে তিন বিঘা আন্দোলন পর্বে সুবীর রায় মারা যাবার পর দহগ্রামে বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের পর পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ক্রমশ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করে। চুরি-ডাকাতি, লুঠ ইত্যাদি হয়ে ওঠে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বাড়ির মহিলাদের লাঞ্ছনা, অপহরণ কোনও কিছুই বাদ যায় না। অগত্যা হিন্দু সম্প্রদায় ধীরে ধীরে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা ত্যাগ করতে শুরু করে। পুলিশ ক্যাম্পই হয়ে ওঠে তাদের কাল, রক্ষকই যেন ভক্ষক।

এর পর ১৯৯২ সালের ২৬ জুন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তিন বিঘা করিডর উন্মোচিত হওয়ার পর দহগ্রামে সর্বগ্রাসী হামলা চালাতে উদ্যত হয় সেখানকার মৌলবাদী শক্তির মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা। শুরু হয় নির্বিচারে লুঠ ও অগ্নিসংযোগ। সেখানকার 'বল্লোর বাড়ি' নামক পাড়ার প্রফুল্ল রায়, বিদ্যামন রায়, বাঙরু রায় প্রমুখ ২০টি সম্পন্ন পরিবারের বাড়ি রাতারাতি পুড়িয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। ওই দিন অপরাহ্ণে সীমান্ত থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকে বাগডোগরা, কুচলিবাড়ি কিংবা মেখলিগঞ্জ শহরের মানুষজন। দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার পোদ্দারপাড়া, টেপার ভান্ডানি, নাউয়ারটারি, হাড়িপাড়া, কালারডাঙা, কলোনিটারি ইত্যাদি এলাকার অন্তত ৫০-৬০টি বাড়িতে চলে লুঠতরাজ। দহগ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবার বলে পরিচিত ললিতচন্দ্র রায় পোদ্দার, জলধর রায় পোদ্দার, তারাকুমার রায় পোদ্দার, নিরোদ রায় পোদ্দার প্রমুখও রোষের শিকার হন। তাঁদের ধনসম্পত্তি লুঠ করে দুষ্কৃতীরা।

অগত্যা সিংহভাগ হিন্দু পরিবার প্রায় নামমাত্র মূল্যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল্য ছেড়ে দিয়ে জীবন-সম্ভ্রম বাঁচাতে ভারতীয় ভূখণ্ড মেখলিগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। বর্তমান সময়কালে বাংলাদেশি ছিট দহগ্রাম-আঙ্গারপোতায় মাত্র ৫টি হিন্দু পরিবার সীমান্ত ঘেঁষে বসবাস করছে। কালাচাঁদ রায় পোদ্দারের কথায়, এর মধ্যে তিনটি পরিবার পুরনো এবং দু'টি পরিবার বাংলাদেশ মূল ভূখণ্ড থেকে এসে বসবাস করছেন। হয়ত এঁরা অপেক্ষা করছেন ভারতে আসবার জন্য। তিন বিঘা আন্তর্জাতিক করিডর আজ পর্যটকদের জন্য দ্রষ্টব্য। সন্ধ্যায় আলোকসাজে সজ্জিত তিন বিঘা করিডরের শোভা অপরূপ। দূর থেকে দেখে মনে হয় স্বপ্নপুরী। নতুন কোনও আগন্তুক এই আলোর রোশনাই দেখে নিজের অজান্তেই ছড়া আওড়াতে পারেন, '...ওপারেতে স্বর্গসুখ আমার বিশ্বাস।' কিন্তু প্রদীপের নিচের জমাট অন্ধকারের খবর রাখে ক'জন?

তিন বিঘা করিডর উন্মোচনের উত্তর পর্বে হলদিবাড়ি থানার অন্তর্গত ভারতীয় ছিটমহলগুলির স্বরূপ তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তৎকালীন কোচবিহারের সাংসদ অমর রায় প্রাধান। তিনি 'রুল অব জঙ্গল' নামক পুস্তিকা ছেপে তুলে ধরেছিলেন কাজলদিঘি, শালবাড়ি, পুটিমারি, নাজিরগঞ্জ, নটকটকা, বেউলাডাঙা ইত্যাদি ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দাদের মর্মস্পর্শী কাহিনি। তাঁর বয়ান অনুসারে, ১৯৯২ সালের ২৬ জুন তিন বিঘা লিজ সম্পর্কিত বিষয়টি কার্যকর হবার পর স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল যে, ভারত-বাংলাদেশের সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও মজবুত হবে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে শান্তি বিরাজ করবে। ছিটমহলের প্রকৃত রায়তরা তাদের বেদখল হওয়া জমি ফিরে পাবে। অন্তত ছিটমহলগুলিতে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে মানুষ যেটা প্রত্যক্ষ করল তা হল, বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে চুরি-ডাকাতি, লুট, অগ্নিসংযোগ, নারীলাঞ্ছনা ইত্যাদি ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। সর্বত্র এক আতঙ্কের পরিবেশ। ছিটবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও হেলদোল নেই ভারতীয় প্রশাসনের। সেখানকার ভূমিদস্যু বা জমি মাফিয়া এবং মৌলবাদী শক্তি জামাতের প্রত্যক্ষ মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা ভারতীয় প্রশাসনের নির্লিপ্ততার সুযোগ নিয়ে ছিটমহলগুলিতে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। জমি মাফিয়ারা ছিটমহলগুলিতে সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। নাগরিক কমিটির আড়ালে ভূমিদস্যুরা অনেক ছিটমহলেই সামন্ততান্ত্রিক শাসন কায়েম করতে উদ্যত হয়। প্রতিবাদী শক্তিকে ছলে-বলে-কৌশলে নিকেশ করতে প্রতি মুহূর্তে তারা ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে। প্রকৃত ছিটবাসীদের উৎখাত করে ছিটমহলগুলি ক্রমশ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ইত্যাদি জেলা থেকে আগত ভাটিয়া মুসলমানে ভরে যেতে থাকে। প্রমাদ গুনতে শুরু করে সেখানকার আদি বাসিন্দা হিসেবে পরিচিত রাজবংশী হিন্দু ও মুসলমান (পড়ুন নস্য শেখ) সম্প্রদায়সহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষজন।

এরকম এক অরাজক পরিস্থিতিতে ১৯৯২ সালের অগাস্ট মাসে পূর্বোল্লিখিত ছিটমহলগুলিতে দুষ্কৃতীরা তাণ্ডবলীলা চালায়। ৩১ অগাস্ট সংঘটিত এই তাণ্ডবলীলায় ছিটমহলগুলির শিশু-মহিলাসহ ৬৭ জন ভারতীয় খুন-জখম হন, সহস্রাধিক বাড়িতে লুঠ ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। শতাধিক মানুষকে অপহরণ করে দুষ্কৃতীরা। প্রয়াত সাংসদ অমরবাবুর কথায়, এত বড় একটি নারকীয় ঘটনা ঘটার পরেও কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে সরেজমিনে পরিদর্শন ও যথাযথ তদন্ত তো দূরের কথা, ওই এলাকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের জীবন-সম্পত্তি রক্ষায় কোনও প্রকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমনকি ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারগুলি কোনও প্রকার আর্থিক সহায়তাও পায়নি। অনন্যোপায় এই মানুষরা তাঁদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বাড়িঘর, বিষয়-সম্পত্তি, খেত ভরতি ফসল, পুকুরের মাছ ফেলে মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। তখনও সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মিত না হওয়া হয়ত বা শাপে বর। কাঁটাতারের বেড়া থাকলে কী হত তা কল্পনাতীত। বিষয়টি শিউরে ওঠার মতো।

যা-ই হোক, মূল ভূখণ্ডে পালিয়ে এসেও যে তাঁরা খুব একটা লাভবান হয়েছেন তা নয়। তাঁরা সরকারি সাহায্যলাভের আশায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেরিয়ে কোনও প্রকার সাহায্য না পেয়ে অবশেষে উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করতে থাকেন। কেউ কেউ নিকট আত্মীয়-পরিজনের বাড়িতে, কেউ বা ভিক্ষে করে, কেউ কেউ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে থাকেন। হলদিবাড়ি, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মাটিগাড়া, একতিয়াশাল, আঠারখাই, ফুলবাড়ি ইত্যাদি স্থানে এই সকল মানুষেরা মাথা গোঁজবার চেষ্টা করেন। কারও ঠাঁই হয় জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির রাজপথে। এইভাবে বছরখানেক কাটানোর পর দুর্দশাগ্রস্ত ছিটবাসীদের এক প্রতিনিধিদল শাহিদুল ইসলাম ও তাহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৯৯৩ সালের ১৬ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁদের দুরবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। ছিটবাসীরা তাঁদের জীবন, সম্পত্তি ও সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য কাতর আবেদন জানান। কিন্তু

১৯৯২ সালের অগাস্ট মাসে এই ছিটমহলগুলিতে দুষ্কৃতীরা তাণ্ডবলীলা চালায়। ৩১ অগাস্ট সংঘটিত এই তাণ্ডবলীলায় ছিটমহলগুলির শিশু-মহিলাসহ ৬৭ জন ভারতীয় খুন-জখম হন, সহস্রাধিক বাড়িতে লুঠ ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। শতাধিক মানুষকে অপহরণ করে দুষ্কৃতীরা। ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারগুলি কোনও প্রকার আর্থিক সহায়তাও পায়নি।

দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনওরূপ সহায়তা লাভে সমর্থ হননি। এইভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনওরূপ ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে ছিটবাসীদের একাংশ নিজ নিজ ছিটমহলে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হতভাগ্য এই সকল ছিটমহলবাসী নিজ ভূমে ফেরার অব্যবহিত পরেই তাঁদের দলের প্রধান শাহিদুল ইসলাম বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের হাতে পৈশাচিকভাবে খুন হন। অন্যান্যরা আতঙ্কে যে যেদিকে পারেন নিরাপদ আস্তানার সন্ধানে ছুটতে শুরু করেন। আবার কেউ কেউ সেখানকার ভূমিদস্যুদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ছিটমহলগুলি ক্রমশ ভূমিদস্যুদের স্বশাসিত ভূমিতে পরিণত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এদের জোট তাকে এক অন্য মাত্রায় উন্নীত করে। অন্যান্য যে সকল ছিটবাসী এই অসম লড়াইয়ে পর্যুদস্ত হলেন, তাঁরা মূল ভূখণ্ডে কপালে উদ্বাস্তুর তিলক এঁকে শুরু করলেন এক নতুন জীবনযুদ্ধ। যাঁরা পালিয়ে আসবার সময় নিজ নিজ ভূমি সম্পর্কিত নথিপত্র দলিল-দস্তাবেজ সঙ্গে এনেছিলেন, তারা তা আঁকড়ে ধরে স্বপ্ন দেখতে থাকেন, সরকার বাহাদুর হয়ত একদিন এর বিহিত করবেন। আর যাঁরা তা রক্ষা করতে পারেননি, তাঁরা প্রকৃত অর্থেই হয়ে পড়লেন সর্বহারা।

দেবব্রত চাকী

(ক্রমশ)

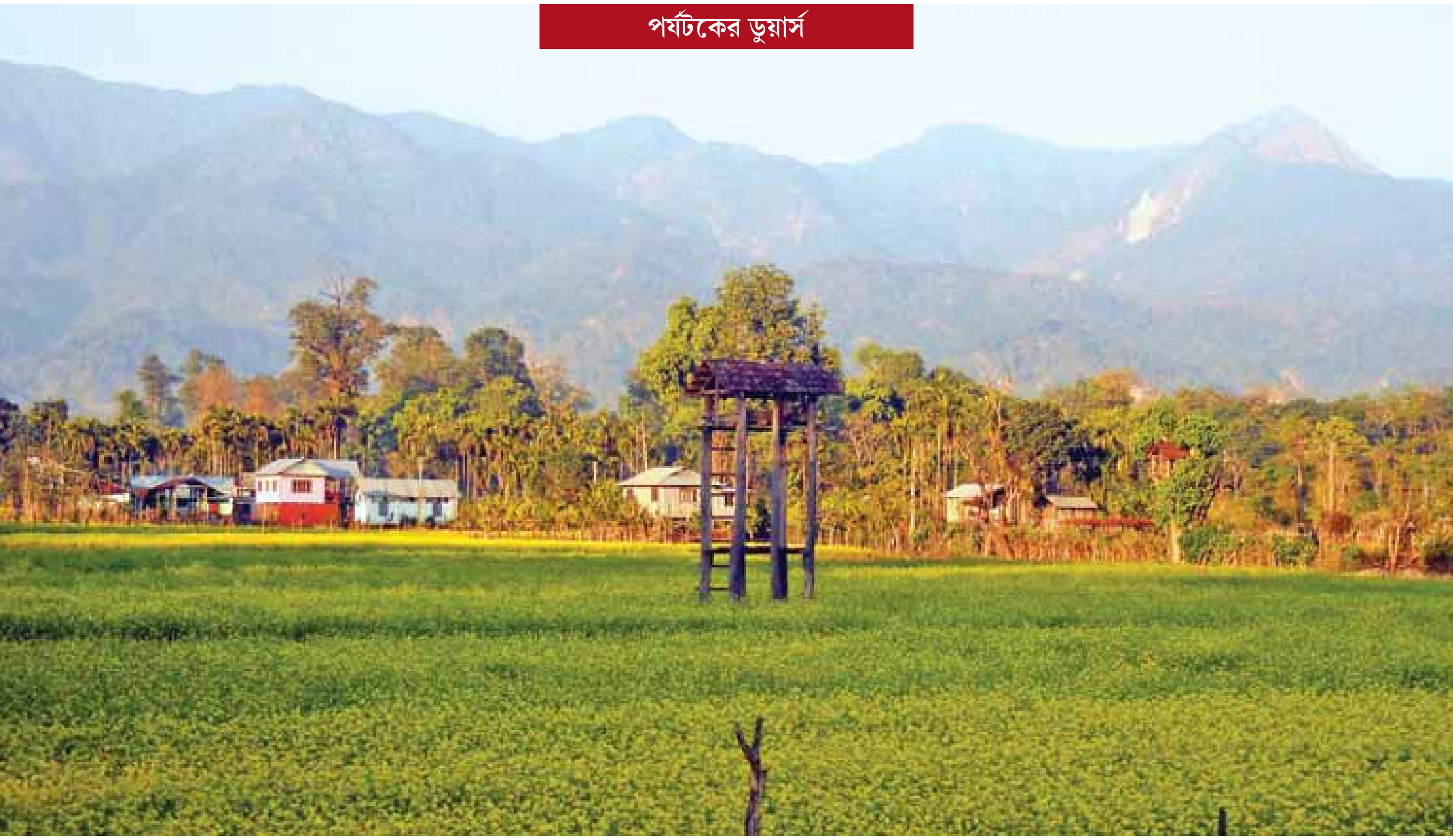

বাঘের ঘুম ভেঙে যাবে

সুরক্ষা নয় বদলে অবাধে লুঠ হয়েছে বনসম্পদ। অস্তিত্ব বিপন্ন কাওলা গাছ থেকে শুরু করে বন্য জানোয়ারদের। ভেঙে পড়েছে বন্যপ্রাণী ও বনবাসীদের যোগাযোগের সেতু। স্থানীয় মানুষ খিদের তাড়নায় জড়িয়ে পড়েছে জন্তু পাচার চক্রে। ফলে হল না বনরক্ষা, না গড়ে উঠল ইকো পর্যটন।

এক যে ছিল ভয়ংকর জঙ্গল। এত ঘন যে মানুষ তো দূরের কথা, সুয্যিদেবও ভেতরে ঢুকতে বড় একটা সাহস পেত না। সেই জঙ্গলে ছিল বিশাল বিশাল সাপ, বাঘ, ভালুক আর হাতিদের রাজ্য। আর সেই রাজ্যের চারদিক ঘিরে ছিল বিভিন্ন বানভাসি মানুষের যত বসতি— কোনওটা রাভাদের, কোনওটা কোচ বা কোনওটা মেচদের, আর জঙ্গল যেখানে সমতল থেকে গভীর হতে হতে পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে উঁচুতে উঠে গিয়েছে— সেখানে, পাহাড়ের বিভিন্ন উপত্যকায় ছিল টোটো ও ডুকপাদের বাস।

এরা বনের মানুষ আর জীবজন্তুরা সকলেই কিন্তু জীবনের তাগিদে ছিল বননির্ভর। এই দুই ধরনের প্রাণীদের জীবনই জড়িয়ে ছিল সেই গভীর বনের সঙ্গে।

তাই এই বননির্ভর জীবনযাত্রায় পশু আর মানুষে যে ঠোকাঠুকি ছিল না তা নয়। মুখের স্বাদ পালটাতে হাতি বা বাঘ যেমন চলে আসত মানুষের শিবির এলাকায়, তেমনই বনবাসীরাও কখনও-সখনও বনের হরিণ-শুয়োর দিয়ে তাদের দৈনন্দিন খাবার তালিকায় একটু উপাদেয়তার ছোঁয়াচ লাগাত— এভাবেই চলত। কিন্তু মোটের উপর একে-অপরকে নির্ভর করে বেশ সুখে-শান্তিতে কাটিয়ে দিচ্ছিল বংশপরম্পরায়।

বাদ সাধল রাজারা!

যে ক'টা বনের পশুকে মারত প্রতিবেশী মানুষের পেটের তাগিদে, বেঁচে থাকার তাগিদে— রাজারা মারত তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি— মজা করে খেলার ছলে। এপার-ওপার দুই পারেরই রাজারা খেলতে খেলতে মেরে ফেলত বাঘ, হরিণ, শুয়োর, এমনকি হাতিও— শিকার খেলার নামে।

এই হত্যালীলা আরও প্রবল হয়ে উঠত যখন যুদ্ধ লাগত। দুই পারের রাজার যুদ্ধ— দুই পারে শিবির— আর যুদ্ধশিবিরের মহাভোজে বলিদান, বন্য প্রাণীর। কথায় বলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। এর পর এল সাহেবসুবোরা— বিদেশি রাজারা! আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠল শিকার খেলা। আমদানি হল নানা রকমের বন্দুক আর তা পরীক্ষা করা হত বন্য প্রাণের উপর নানাভাবে— কারণে-অকারণে, ক্ষমতার প্রকাশে, খেলার অবকাশে। কেবল অন্য পশুই যে শিকার করা হত তা-ই নয়, দু'-চারটে 'জংলি' বনবাসীও ছিল ওই তালিকায়। যা হোক, রাজরাজড়ার থেকে সাহেবসুবো পর্যন্ত এত শিকার হয়েছে যে, একদিন এই

শিকারিরাই খেয়াল করল যে শিকার কমে গিয়েছে।

ব্যাস! রাজাদের মাথা খারাপ! শিকার খেলায় প্রাণীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে (যেন খেলনাঘরে পুতুলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে)। কেন? কে চুরি করছে?

না— চোর, পাজি ওই বনবাসীরাই— ওরাই বনের সমস্ত পশুকে মেরে সাবাড় করেছে!

উপায়?

শিগগির আলমারি বানাও। পুতুলদের সব আড়াল করো (আলমারিতে পোরো বন্য প্রাণীদের)। আইন বানাও— যাতে ওই বন ও বন্য প্রাণ ওই বনবাসীদের নাগালের বাইরে থাকে।

অতএব ১৮৭৭-৭৮-এ কেবলমাত্র রাজা ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্য তৈরি হল বক্সা বন বিভাগ (Buxa Forest Division)। কেননা বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে! কেননা শিকার কমে যাচ্ছে!

স্বাধীনতার পর, বনের বাসিন্দাদের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কারণ, দেশি সাহেবরা আরও কঠোর, আরও নির্মম। কারণ, পূর্বতন সাহেবদের শিক্ষায় শিক্ষিত দেশি সাহেবদের বদ্ধমূল ধারণা যে, সব বাঘ তো বনবাসীরাই চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু বক্সা বনাঞ্চলকে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন জনজাতির ৩৭টি বনবস্তি (মতান্তরে ৪২টি)— যাদের জীবনযাত্রা ঐতিহ্যগতভাবে বনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। তাই জীবন ও জীবিকার স্বার্থে বনকে রক্ষা করা, বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব প্রাচীনকাল থেকে এরাই কাঁধে তুলে নিয়েছিল। বন্য পশুদের সঙ্গে বনবাসীদের তৈরি হয়েছিল এক আত্মিক যোগাযোগ।

এই ব্যাপারটা দেশি সাহেব ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের পছন্দ নয়। কারণ, ক্ষমতাবলে বনের মালিক তারা, আর সম্পদ ভোগ করবে ওই (অসভ্য) বনবাসীরা? বনসম্পদকে সম্পূর্ণভাবে কুক্ষিগত করে ভোগ করতে হলে বনবাসীদের উচ্ছেদ করতেই হয়। তাই দেখা গেল, একই বনের বিভিন্ন তকমা লাগানো শুরু হল।

১৯৮৩-র ১৬ ফেব্রুয়ারি বক্সা বনকে পরিণত করা হল 'বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প' (ভারতের ১৫তম ব্যাঘ্র প্রকল্প)-এ এবং সম্পূর্ণ বনাঞ্চলকে (৭৬০.০৯ বর্গকিমি) আনা হল সংরক্ষণের আওতায়। জঙ্গল বাঁচানোর অজুহাতে ওই একই বনাঞ্চল কখনও জাতীয় উদ্যান (১১৭.২৩ বর্গকিমি), কখনও অভয়ারণ্য (২৭৩.৩৫ বর্গকিমি) বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল (৩৭৪.৮০ বর্গকিমি) ইত্যাদি নানা নামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে নানা আইনের বেড়াজাল তৈরি করা হল সাধারণ বনবাসীদের বন থেকে দূরে রাখতে— উচ্ছেদ করতে। অজুহাত? না বাঘের ঘুম ভেঙে যাবে!

ট্রেকিংয়ে গাইডের বাড়িয়ে দেওয়া হাত

মহাকাল থেকে ফেরার পথে জয়ন্তী নদীর উপর

কিন্তু কী হল লাভ?

১৯৮৩-১৯৯৩— মাত্র ১০ বছরে সেই বিশাল ও গভীর বক্সা বনকে কঙ্কালে পরিণত করলেন দেশি সাহেবরা, প্রকৃতিপ্রেমীরা।

বন দপ্তর সংরক্ষণের নামে ভেঙে ফেলেছে বন্য প্রাণী ও বনবাসীর মাঝে যোগাযোগরক্ষাকারী সেই আত্মিক সেতুটাও। যার ফলে আজ বন্য প্রাণী ও মানুষ একে অপরের চিরশত্রু। হাতি মানুষ মারছে, মানুষ চিতা বাঘকে মারছে, বনবস্তি তো দূরের কথা, খাবারের খোঁজে গ্রাম-শহরেও ঢুকে পড়ছে বনের প্রাণীরা।

বক্সা-জৈন্তি (Jainti) রেল লাইন, যা আলিপুরদুয়ার মহকুমার ‘বাণিজ্য সেতু’ ছিল (কাঠ, বোল্ডার, স্টোনচিপস, দুধ, মধু ও পর্যটক ইত্যাদি আর্থিক আদানপ্রদানের কারণে), উপড়ে দিয়ে কেবলমাত্র বক্সা-জৈন্তিকেই পৃথ্বী থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলেনি— ওই অঞ্চল তথা আলিপুরদুয়ারের অর্থনীতিতেও আঘাত হেনেছে (১৯৯০)।

সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণের নামে জৈন্তি ও অন্যান্য নদী থেকে বোল্ডার উত্তোলন এবং জৈন্তির ডলোমাইট কারখানা বন্ধ করে দেওয়া ছিল বনের উপর এক সর্বনাশা অভিশাপ (১৯৮৪-৮৫-তে তখন বক্সার বাঘবনের ফিল্ড ডাইরেক্টর পুণ্ডরীকাক্ষ)। এর ফলে ভুটানের পাহাড়ি নদীগুলো থেকে ধুয়ে আসা বোল্ডার, নুড়ি, বালি, পাথর জমতে থাকে বক্সা বনাঞ্চলের নদীখাতগুলোতে, যা নদীর বহন ক্ষমতা হারাতে বাধ্য কবে— নদীখাত অগভীর হয়ে পড়ে।

ফলস্বরূপ ১৯৯৩-এ বক্সা বনাঞ্চল তথা আলিপুরদুয়ার মহকুমাকে গ্রাস করে এক ভয়ংকর বন্যা। আর এই বন্যা ধ্বংস করেছে বক্সার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলকে।

বংশপরম্পরায় চলে আসা বক্সা পাহাড়ের প্রধান অর্থকরী ফসল ‘কমলালেবুর চাষ’কে ধ্বংস করে দিয়ে ডুকপা জনজাতির অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেয়। সংরক্ষণের নামে (১৯৯৪?)।

বনগ্রামগুলির ঐতিহ্যগত গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস করে, সমাজ ও কৃষ্টিকে বিকৃতি করে, রুজিরোজগারহীন করে— সবশেষে বনবাসীদের টাকাপয়সার লোভ (শোনা যায় পুনর্বাসনের নামে পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা দেবে বন দপ্তর) দেখিয়ে এদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের পরিকল্পনাতেই ব্যস্ত থাকে বন বিভাগ সংরক্ষণের নামে।

আসলে খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে, বক্সাতে বন বিভাগ বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার অজুহাতে মনোযোগ দিয়ে ওই অঞ্চলগুলির অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে, যার লক্ষ্য ছিল স্থানীয় স্বাধীন ও পরিবর্ত অর্থনৈতিক কাঠামোগুলোকে ধ্বংস করা, যাতে তারা বাধ্য হয় তাদের প্রাচীন বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে। তাহলেই তো আর বাধা থাকবে না সম্পূর্ণ বনসম্পদকে বিশেষ এক শ্রেণির ভোগ্যপণ্য করে তুলতে। এভাবে এক-একবার এক-একজন বন বিভাগের সাহেব এখানে এসেছেন আর তাঁদের ব্যক্তিগত ফায়দা তুলতে এক-একটা কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

অজুহাত একটাই, বাঘের ঘুম ভেঙে যাবে

কিন্তু বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে বন বিভাগের কর্তারা শুধু ওই অঞ্চলই নয়, ধ্বংস করেছেন সমগ্র ডুয়ার্সের অর্থনীতিকে। ঠেলে দিয়েছেন স্থানীয় মানুষদের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের পথে। ফলে, আজ লুঠ হয়ে যাচ্ছে বনসম্পদ— অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে ‘কাওলা’র মতো গাছ থেকে ভালুক, বন, মহিষ ইত্যাদির মতো বহু বন্য প্রজাতির! কাজের অভাবে, ক্ষুধার তাগাদায় স্থানীয় মানুষরা জড়িয়ে পড়ছে জংলি জানোয়ার পাচার চক্র থেকে নানা অপরাধমূলক কাজে।

ডুয়ার্স তথা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের তিনটি প্রধান অর্থকরী ফসল (চা, কাঠ ও তামাক)-এর মধ্যে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় তামাক চাষের অবনতির পর কাঠ বা টিম্বার শিল্পর ক্ষতি বন দপ্তর নিজেই করেছে। এর পাশাপাশি চা-শিল্পে ভরাডুবি ডুয়ার্সের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলে। ’৯০-এ ডুয়ার্সে ডাকাতি, চুরি-ছিনতাই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এইরকম পরিস্থিতিতে বিকল্প অর্থনীতির খোঁজে সাধারণ মানুষ থেকে সরকার-রাজনীতিবিদ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। সম্ভবত এই সময়েই শ্রদ্ধেয় জগন্নাথ বিশ্বাস, হরিশংকর থাপার মতো ব্যক্তিরা বক্সা দুর্গ ও পাহাড়কে ঘিরে পর্যটনের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তাঁরা সাফল্য লাভ করতে না পারার পিছনে একদিকে যেমন বন দপ্তরের যথেষ্ট ভূমিকা, অপর দিকে পেশাদারিত্বের অভাবও দায়ী ছিল।

সম্ভবত ১৯৯৯-২০০০ সালে ‘সিনচুলা ট্রেকস অ্যান্ড ট্রাভেলস’ নামে একটি সংস্থাই দিল ছকা (বক্সা ফোর্ট গ্রাউন্ড), লপচাখা এবং রাইমাটাং নামে বক্সা পাহাড়ের তিনটি বনগ্রাম নিয়ে বক্সা দুয়ার অঞ্চলে প্রথম পেশাদারি পর্যটনের সূচনা করে এবং এই অঞ্চলে পর্যটনকে পরিবর্ত অর্থনীতি রূপে প্রতিষ্ঠা করে।

একই সঙ্গে কালচিনি অঞ্চল শাসক (BDO) কালকূট বনবস্তি ও জৈন্তিতে পর্যটনের প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। কিন্তু এই সংস্থাটি ততদিনে Integrated Cooperative Development Project ও পাহাড়ের বাসিন্দাদের (চেনডোজি ডুকপা, গোপাল ডুকপা, পুষ্পরাজ থাপা, প্রকাশ থাপা, পাশাং ছিরিং ডুকপা, পিন্টসু ডুকপা, সরজু কার্কি, নিমা ডুকপা ইত্যাদি) নিয়ে কালচিনির মোহন শর্মা এবং আলিপুরদুয়ারের তৎকালীন বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক, সর্বোপরি বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মনের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘হোম টুরিজম প্রকল্প’ নামে বক্সা পাহাড়ে পর্যটনের সাড়া ফেলে দেয়। ২০০৫-এ পর্যটনকে পরিবর্ত অর্থনীতি রূপে ডুয়ার্সের এই অঞ্চলে তুলে ধরার জন্য প্রথম ডুয়ার্স উৎসবে সংস্থাটি আলিপুরদুয়ার প্রেস ক্লাব দ্বারা নির্বাচিত হয়ে বিশেষ বেসরকারি সংস্থার পুরস্কার পায়।

ইতিমধ্যে ২০০৫-এ জৈন্তিতে পর্যটনের প্রসার ঘটে এবং জৈন্তি একটি অন্যতম পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়। তারপর ধীরে ধীরে আজ দমনপুর, সিকিয়াঝোরা, রাজাভাতখাওয়া, পোরো, নিমাতি ইত্যাদি বহু বনবস্তি পর্যটনস্থলে পরিণত হয়েছে। আদমা, চুনাভাটি, পানিঝোরা, পানবাড়ি, ডুংরিঝোরার মতো আরও নতুন জায়গা পর্যটনের কারণে গড়ে উঠছে। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের উল্লেখযোগ্য পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে এই অঞ্চল বিখ্যাত হবেই।

আর হবে না-ই বা কেন? এখনও যেটুকু আছে তাতেই—

বক্সা বন, পাহাড় ও পর্যটকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গেলে আগের সান্ডার্স সাহেবের বিবরণ ধার করতে হয়, যিনি প্রায় ১২০ বছর আগে আলিপুরদুয়ারের বক্সা ফিডার রোডের বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন, যা আজও প্রায় একই—

‘No better idea of the forests in the Duars can be obtained then that which you may get almost throughout the year along the Alipur-Buxa road. ...Loiter on this road... during the months of April to September, butterflies, with gorgeous colours, float all over the road and forest and round about you. ....

Move further northward and gradually the scene changes. In March and April the orchids bloom and frequently make the trunks of trees a bouquet of flowers. The trees appear taller, their leaves more fresh and green; the under wood less dense; and glimpses of the forests on all sides are easily obtained. ...

Further north, near Buxa, a cool air blows on your face and all around and above you birds with beautiful plumae whistle, especially in the cold weather and fill the forest with music which is only interrupted by the bark of a deer or occasionally the chatter of a monkey.’

বক্সা দুয়ারের পর্যটন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এক কথায় বলতে হয়, প্রকৃতি এখানে পর্যটকদের জন্য নানা বাহারের ডালি সাজিয়ে রেখেছে। জেলা শহর আলিপুরদুয়ার থেকে মাত্র ৩৬ কিমি দূরত্বে বক্সা অল্প উচ্চতার পাহাড়, ঘন অরণ্য, অজস্র ঝরনা, উপত্যকায় ভরা এক রহস্যময় পর্যটনের খনি। ভুটান হিমালয়ের সিনচুলা রেঞ্জের অন্তর্গত এই বক্সা ডলোমাইট সিরিজ পাহাড়টিতে যেমন রয়েছে ডুকপা জনজাতি— তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি; তেমনই আছে নানা প্রজাতির গাছ, অর্কিড, প্রজাপতি, পাখি এবং প্রাণী। পাকদণ্ডী বেয়ে যতই উপরে ওঠা যায়, ততই যেন

প্রাকৃতিক দৃশ্য আর মেঘের রহস্যময় ঘনঘটার হাতছানি। ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে নতুন করে খুঁজে পেতে পারেন সদর বাজারের অলিগলিতে বা পাথর বাঁধানো প্রাচীন ভুটান-তিব্বত রাস্তায়। পাশাখা জং বা টার্শিগাও গুম্ফার পাথরের শিলালিপিতে কে জানে খুঁজে পেতে পারেন হয়ত বা অতীশ দীপংকরের কোনও অলিখিত বৌদ্ধ প্রচার কাহিনিও। এত কিছুর সঙ্গে আবার বক্সা বাঘবনের অমোঘ আকর্ষণ তো আছেই।

বক্সা বাঘবন

ভারতের ১৫তম ব্যাঘ্র প্রকল্প বক্সা বাঘবনের বিস্তার মোটামুটিভাবে উত্তরে ভুটান থেকে দক্ষিণে কোচবিহার জেলার সীমানা ঘেঁষে পূর্বে অসম থেকে পশ্চিমে প্রায় জলদাপাড়া অভয়ারণ্য (৭৬০.০৯ বর্গকিমি)। এর মধ্যেই ১১৭.২৩ বর্গকিমি এলাকা জাতীয় উদ্যান এবং অভয়ারণ্য হিসেবে স্বীকৃত ২৭৩.৩৫ বর্গকিমি এলাকা। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের এলাকা হল ৩৭৪.৮০ বর্গকিমি অঞ্চল। ভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া, উষ্ণতা এবং বৃষ্টিপাতের তারতম্যে এখানে নানা ধরনের গাছগাছালি ও বন্য প্রাণী রয়েছে। গাছগাছালির ক্ষেত্রে, উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে ইন্দো-মালয়ান প্রকারের এক বিশাল বৈচিত্রময় ভাণ্ডার রয়েছে এই বনে, যার ১০০০টি প্রজাতির মধ্যে ১০০টি প্রজাতিই ভেষজ। প্রায় হাজার প্রজাতির প্রাণীদের বাসভূমি এই বনে, যেমন ইন্দো-মালয়ান জাতিগত চাইনিজ প্যাঙ্গোলিন, রেটিকুলেটেড পাইথন আছে, তেমনি উত্তর-পূর্ব ভারতীয় জাতির ক্লাউডেড লেপার্ড, মার্বেল ক্যাট আছে।

সমতল থেকে পাহাড়ি বনভূমিতে পাখির প্রকারভেদও আলাদা আলাদা। ক্রিস্টেড কিংফিশার, ইন্ডিয়ান রোলার, ক্রিস্টেড সারপেন্ট ইগল, প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার থেকে নানা প্রজাতির হর্নবিল, বিউটিফুল নাটাচ, গ্রিন কোচোয়া বা হিমালয়ান গ্রিফন— বিভিন্ন ধরনের বিরল প্রজাতির নিশ্চিন্ত আশ্রয় এই বক্সা বাঘবন।

কোথাও বন-পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বা শাল-সেগুন-অমলতাস-চিকরাশির ঘন ছাওয়া ঘেরা বনভূমিতে, বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর জায়গায় বন দপ্তরের বনবাংলো আছে। এর মধ্যে যেমন সাউথ রায়ডাক বাংলো একটি অসাধারণ ব্যবস্থাপনাসহ হেরিটেজ বাংলো, আবার নিরিবিলিতে প্রকৃতি উপভোগ করতে হাতিপোতা ও পাহাড়ের মাথায় বক্সা বন বাংলোও আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই বাংলোগুলি সবই বন দপ্তরের Inspection Bungalows— তাই কলকাতা থেকে বুকিং করে এলেও বক্সা বন বিভাগের আলিপুরদুয়ার অফিসে দেখা করে 'বুকিং স্লিপ' সংগ্রহ করে নিশ্চিন্ত হয়ে তবেই যাবেন।

তবে বক্সা বাঘবনের অতিথি হয়েই যদি ঘুরতে চান, তবে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড'-এর রাজাভাতখাওয়ার বক্সা জঙ্গল লজ বা রসিক বিলের লজে থাকতে পারেন।

বুকিং-এর ঠিকানা : West Bengal Forest Development Corporation Limited, KB19 Sector-III, Salt Lake, Kolkata-700 098, Ph. No. : 033 23350064/ 033 23358320.

যোগাযোগ করতে পারেন : DM Buxa Logging, Phone : 255004/ 255022

অনলাইন বুকিং : www.wbfd.com

হাঁটা-পথে পাহাড়ি অরণ্যে

কিন্তু বক্সার ঘন পাহাড়কে নিবিড়ভাবে পেতে হলে হাঁটতে হবে। হাঁটতে হবে অতীশ দীপংকর, উইলিয়াম গ্রিফিথ, গর্ডন ক্যাসর্লে, দলাই লামার পথে। এখানকার মানুষ, জঙ্গল, পাখি, প্রজাপতি, আকাশ আর প্রকৃতিকে জানতে-বুঝতে হলে চরৈবেতি।

বক্সা ডলোমাইট সিরিজের এই পার্বত্য হাঁটা-পথ বা ট্রেকিং রুটকে দু'রকমভাবে উপভোগ করা যায়। প্রথমটি হল, বক্সা বাঘবনের পশ্চিম ভাগের রাইমাটাং পাহাড় থেকে যাত্রা শুরু করে পৌঁছে যাওয়া যায় বক্সা দুয়ারে। আবার সেখান থেকে লপচাখা হয়ে মহাকাল পাহাড়ের ধার ঘেঁষে যাত্রা শেষ করা যায় জৈন্তির জঙ্গলে।

দ্বিতীয়টি বা সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল বক্সা বাঘবনের সন্তলা বাড়ি রেঞ্জ থেকে চরৈবেতি।

প্রথম দিন জিরিয়ে নেওয়া বক্সা দুর্গের মাঠ এলাকা (দিল ছকা)-র ডুকপা হাটে। এই সময় ভাল করে দেখে নিন, বক্সা দুর্গ, হেরিটেজ ডাকঘর, মিউজিয়াম। তারপর এখানেই আস্তানা গেড়ে প্রথমে একে একে দেখে নেওয়া যায় পূর্ব দিকের ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রামগুলোকে— খাটা লাইন, লপচাখা, ওছছলুম। উত্তরে প্রাচীন ভুটানের রাস্তা ধরে চলে যান এই পার্বত্য এলাকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলির পথে— রুপাং ভ্যালি হয়ে পাম-স্যে-লা-র দিকে, আবার ফিরে আসুন দু'দিন পরে ডুকপা হাটে। একদিন মাঝখানে মনে করলে বিশ্রাম নিতে পারেন আগামী ট্রেকের রসদ গুছিয়ে নিতে। কারণ, তারপর একের পর এক পশ্চিম দিকের ডুকপা গ্রামগুলি পেরিয়ে আপনি পৌঁছবেন প্রায় দিন দুই পর রাইমাটাঙে।

বক্সার পাহাড়ি পথে ট্রেক করার সময় আপনি থাকতে পারেন ডুকপাদের বাড়ি অর্থাৎ হোম স্টে-তে। তবে রুপাং ভ্যালি বা বক্সা সার্কুলার ট্রেক করার সময় আপনাকে টেন্টেই বেশি থাকতে হবে। কারণ, সব অঞ্চলে থাকার মতো ব্যবস্থা নেই। তবে চিন্তা নেই। ডুকপাস হাট-এ আগে থেকে বলা থাকলে সবই পেয়ে যাবেন, মায় টেন্ট থেকে স্লিপিং ব্যাগ, ম্যাট্রেস পর্যন্ত। এমনকি রেস্ত খরচ করে আপনি পেতে পারেন পাখি, প্রজাপতি বা স্টার গেজিং-এর জন্য বিশেষজ্ঞ গাইডও।

এই হাঁটা-পথে রাইমাটাং থেকে লপচাখা পর্যন্ত যে গ্রামগুলিতে হোমস্টে বা থাকার ব্যবস্থা আছে, তার বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

বন-জোছনায় রাইমাটাঙে

রাইমাটাং বা রাই-মিয়া-তুং কথার মানে হল রাই (একটি নেপালি গোষ্ঠী)— এরা এখানে ছিল। রাইমাটাং বক্সা বাঘবনের পশ্চিম বিভাগের একটি ছোট বনবস্তি। রাইমাটাং নদী থেকে প্রায় ১৯০০ ফুট উঁচুতে পাহাড়ে ঘেরা শাল-সেগুনের বনে ঢাকা সুন্দর একটি বনগ্রাম। বর্তমানে এখানে মূলত নেপালি জনগোষ্ঠীর কারকি, সারকি, ছেত্রি সম্প্রদায়ের কয়েক ঘর বনবাসীর বাস। পূর্ণিমা রাত্রে রাইমাটাঙের পাহাড়ি ঢালে দাঁড়িয়ে হাজার ফুট নিচের কালিখের, শ্বেতখের আর রাইমাটাং নদীর ঝিকিমিকি রূপ অনেককেই তাক লাগিয়ে দেয়। তবে সাবধান, সঙ্গে গাইড রাখবেন সবসময়— কেননা হাতির দল এই সময় জলকেলি করতে আসে। এ ছাড়াও নানা প্রজাতির পাখি রাইমাটাঙের বিশেষ আকর্ষণ। আলিপুরদুয়ার থেকে রাইমাটাঙের দূরত্ব ৪৮ কিমি। পর্যটকরা কালচিনি স্টেশন (১৬ কিমি) থেকে শেয়ার জিপেও আসতে পারেন।

খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে, বক্সাতে বন বিভাগ বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার অজুহাতে মনোযোগ দিয়ে ওই অঞ্চলগুলির অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে, যার লক্ষ্য ছিল স্থানীয় স্বাধীন ও পরিবর্ত অর্থনৈতিক কাঠামোগুলোকে ধ্বংস করা, যাতে তারা বাধ্য হয় তাদের প্রাচীন বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে।

আদমায় তাঁবুতে রাত্রিবাস

ডুকপাদের বাড়ি

বক্সা ডর্মিটরি

আস্তানা : অরণ্য মহল, কুমার হোম স্টে, পুষ্পরাজ হোম স্টে ছাড়াও রয়েছে এই অঞ্চলের 'হোম টুরিজম প্রজেক্ট'-এর প্রথম ট্রেকার্স হাট সাগুরি ভঞ্জং।

যোগাযোগ : সরজু কার্কি, মোঃ- ৯৭৩৫০৮৫০০১।

ইতিহাস ও বক্সা দুয়ার

১৭৭৪-এর প্রথম ডুয়ার্স-ভুটান যুদ্ধে ইংরেজরা ভুটানের পাশাখা জঙ্গ (বক্সা দুর্গ) দখল করলেও তা ফিরিয়ে দেয় ব্যবসার খাতিরে। কিন্তু সীমান্ত সুরক্ষার কারণে ১৮৬৫-তে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত পাশাখার দখল নিতে। ভুটানের এই দুর্গ বা জঙ্গ পরিণত হয় 'বাকশা' মিলিটারি ব্যারাকে। ব্রিটিশরা এর ব্যবহার করে সীমান্ত দুর্গ হিসেবে, তখন থেকেই পাশাখা জঙ্গ পরিণত হয় বক্সা দুর্গে। এর পর ১৯৩০-৩৭ পর্যন্ত বক্সা দুর্গকে ব্যবহার করা হয় 'ডিটেকশন ক্যাম্প' হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্তরিন করে রাখার জন্য। মাঝখানে সীমান্ত দুর্গ হিসেবে এটি কাজ করলেও এই দুর্গকে বন্দিশিবিরের চেহারা দিতে হয় ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর ফলে। বহু বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দি করে রাখা হলেও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কখনওই এখানে ছিলেন না।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে ১৯৪৮-৫১ পর্যন্ত বক্সা দুর্গ জেল-এ রূপান্তরিত হয় এবং ১৯৫৯-১৯৭০ পর্যন্ত তিব্বতি উদ্বাস্তু শিবির হিসেবে এর ব্যবহার হয়। এই দুর্গের তিনদিকে তিনটি পিকেট তৈরি করা হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনকালে সীমান্তে নজর রাখতে, যার চিহ্ন আজ আর বিশেষ নেই। সদর বাজার গ্রামটিতে কবরখানা ছিল, এখন কিছু এপিটাফ, মেমারি স্টোন পাওয়া যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্মৃতি হিসেবে। বক্সা ডাকঘরটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত। কারণ, কবির (২৫ বৈশাখ, ১৩৮৮) জন্মদিনে বক্সা বন্দিনিবাসের বন্দিরা অভিনন্দনপত্র পাঠালে কবি তার প্রত্যভিনন্দন (১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৯৩৮) পাঠান, যার মাধ্যম ছিল এই ডাকঘর।

আজকের বক্সা দুয়ার ভারতীয় ইতিহাসের এক অহংকারী অধ্যায়কে বুকে নিয়ে টিকে থাকা এক মনোরম পাহাড়ি অঞ্চল, যেখানে বিজয়ী এবং বিজিত একসঙ্গে মিলেমিশে ভারতীয় ঐতিহ্যের 'অতিথি দেবো ভব' কথাটির সার্থক উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছে।

কেবলমাত্র ইতিহাসই নয়, বক্সা দুয়ার এখন বিখ্যাত ট্রেকিং, বার্ডওয়াচিং, বটানি এবং প্রজাপতি ফোটোগ্রাফির জন্য। তবে সম্পূর্ণ ডুয়ার্সের কেবলমাত্র এখানেই পর্যটকদের জন্য রয়েছে স্টার গেজিং বা ডার্ক স্কাই ফোটোগ্রাফি— বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি বলেই এখানে আকাশ আজও অন্ধকার এবং দূষণমুক্ত। তবে চিন্তা নেই, বিদ্যুৎ না থাকলেও সৌর আলো আছে— আর ঝাঁ চকচকে না হলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অ্যাটাচড বাথরুমও আছে।

বক্সায় আসতে হলে আলিপুরদুয়ার থেকে (৩০ কিমি) ভাড়া গাড়ি করে আসুন সান্তলাবাড়ি বা সান্ত্রাবাড়ি। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বক্সা দুর্গ প্রায় ৫ কিমি (দেড় ঘণ্টার হাঁটা-পথ)। কাছাকাছি দুইটি রেল স্টেশন— আলিপুরদুয়ার ও আলিপুরদুয়ার জংশন।

আস্তানা : সদর বাজার— রোভার্স ইন, ইন্দ্রশংকর থাপা, মোঃ- ৯০০২৮৯০২৮৭, হর্নবিল, প্রকাশ থাপা, বক্সা ফোর্ট গ্রাউন্ড (দিল ছকা)— ডুকপাস হাট, সিনচুলা ট্রেকস অ্যান্ড

ধূপগুড়ি শহরের সার্বিক উন্নয়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ডুয়ার্সের অন্যতম শহর ধূপগুড়ির ভৌগলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও দীর্ঘদিনের অনুন্নয়ন ও অবহেলার সাক্ষী ছিল এখানকার পুর এলাকার মানুষ। রাজ্যের ক্ষমতায় দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবার পরে ধূপগুড়ি পুরসভার মানুষও সেই পথ অনুসরণ করেন। নতুন পৌরসভা গঠনের পর থেকেই শুরু হয়ে যায় উন্নয়নের কাজকর্ম। বলাই বাহুল্য, এই কয়েক বছরেই পুরসভার কর্মকাণ্ডের তালিকা ক্রমাগত দীর্ঘ হয়েছে।

উন্নয়নমূলক কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখ্য, কুমলাই ও বামনি নদীর উপর আটটি ব্রিজ, থানা রোডকে ওয়ান ওয়ে করা, রাস্তা চওড়া করা, ১০টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, কুমলাই ড্যাম মেরামত, শ্মশানঘাট মেরামত, নতুন পৌরসভা ভবন নির্মাণ, এরকম আরও অনেক। আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, মায়ের থান থেকে সুকান্ত কলেজ পর্যন্ত উন্নত রাস্তা, বাস টার্মিনাস ইত্যাদি।

ধূপগুড়ি পৌরসভা

আজকের শুভ্র শরতে দেবীর আগমনে আমরা সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গিন মঙ্গল কামনা করি, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকি ধূপগুড়ি শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য।

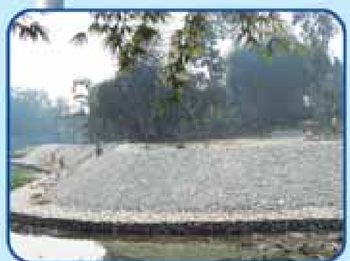

শৈলেন চন্দ্র রায়
চেয়ারম্যান, ধূপগুড়ি পৌরসভা

ট্রাভেলস, মোঃ- ৯৭৩৫০৭৫৮৩১/ ৯৪৩৪০১০৪৯৭।

লপচাখার নিরিবিলিতে

লপচাখা মানে ছোট্ট উপত্যকা। সত্যি অসাধারণ সুন্দর এক পাহাড়ি উপত্যকা, যেখানে খোলা আকাশের নিচে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আদিগন্ত পূর্ব থেকে পশ্চিমে দেখা যায় সম্পূর্ণ ডুয়ার্সকে— নিচে বক্সা বাঘবনের ভেতর দিয়ে ফিতের মতো সমস্ত নদী (প্রায় ১২টি) বয়ে চলেছে আর প্রকৃতি তার সাংসারিক কাজকর্ম সারছে মেঘ-রোদ্দুরের খেলা করতে করতে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই ৩৬০° 'প্যানোরামিক ভিউ' ডুয়ার্সের আর কোথাও পাওয়া যায় না। গ্রামে ঢোকার মুখে শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধ মন্দির (গুম্ফা)-টি শ্বেতশুভ্র এক বৌদ্ধ স্তূপের পাশে— আপনাকে ধ্যানমগ্ন করে তুলতে বাধ্য করবে। ছোট ছোট কাঠের বাড়িতে ঘরকন্নায় ব্যস্ত ডুকপারা— হৃদয়ের সঙ্গে দাবি মিশিয়ে চাইলে স্মিত হাসিতে আপনাকে পৌঁছে দেবে তাদের জাতীয় খাবার— ইমা টাশি, ইজে (রাসায়নিক সার বর্জিত)।

লপচাখা হাঁটা-পথে বক্সা থেকে পাহাড়ি পাকদণ্ডী মাত্র ঘণ্টাখানেকের রাস্তা (প্রায় ২ কিমি)।

আস্তানা : বেহি ওমু হোম স্টে, জাম্বা ডুকপা, ফোন : ০৩৫৬৬-২০৮০০০, লপচাখা ট্রেকার্স হাট, দিলু গাঙ্গুলি, মোঃ- ৯৮৩২১২৮৫৪৭, ডা ছিন, পেনজো ডুকপা, মোঃ- ৯০৯১২৭৭৮০৮।

সমস্যা ও সম্ভাবনা : বক্সায় অ্যাডভেঞ্চার টুরিজমের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলে ট্রেকিং পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পায়ে হাঁটা পর্যটন অনেকটাই নিরাপদ, আবার পাহাড়ের বনবাসীদের আর্থিক সমস্যার সমাধানও— তাই এর সম্ভাবনাও বেশি। বক্সা পাহাড়ে বেশ কিছু বার্ডওয়াচিং জোন, বাটারফ্লাই ওয়াচিং জোন, বাটারফ্লাই স্ট্রিট বা বাটারফ্লাই গার্ডেন করা যেতে পারে। সান্তলাবাড়িতে বা বক্সা ডরমিটারির কাছে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড করা যেতে পারে। চুনাভাটিতে ডুকপাদের হ্যান্ডিক্র্যাফ্ট সেন্টার করা যেতে পারে। পুরাতত্ত্ব বিভাগের মাধ্যমে বক্সা দুর্গকে পুনর্নির্মিত করা বা সংরক্ষণ করা যেতেই পারে। সমস্ত রসদই এখানে উপস্থিত, দরকার কেবল পরিকল্পনা ও তা সফল করার সঠিক চেষ্টা। তবে আজ বক্সার পর্যটন যেখানে পৌঁছেছে, আগামীতে তা আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

সমস্যা : বক্সা দুয়ারে পর্যটনের সবচেয়ে বড় সমস্যা বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের নির্দিষ্ট নীতির অভাব এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে খোলামেলা বোঝাপড়ার অভাব।

বক্সার পর্যটন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে যে বনের ভূমিকা দিয়েছি তা-ই আজকের বক্সা বাঘবন। বর্তমানে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে বাঘ আছে কি নেই, সে আলোচনা এই প্রসঙ্গে অর্থহীন— তবে এই বনে পর্যটনের বিকাশে বন দপ্তরের ভূমিকা ভীষণ সঙিন। প্রথমত, বন আধিকারিকরা খাতায়-কলমে জানাবেন যে তাঁরা বন সংরক্ষণের প্রশ্নে পর্যটনের প্রতি ভীষণ কঠোর। একদম প্রশ্রয় দেন না পর্যটকদের। আবার অন্য দিকে তাঁরা জনসাধারণের রাস্তার উপর চেকপোস্ট বসিয়ে পর্যটকদের থেকে উদাসীনভাবে টাকা আদায় করছেন— The income generated from levying tourist entry fees.

দ্বিতীয়ত, বনের বিভিন্ন জায়গায় (রেঞ্জ বা বিট-এ) বনবাংলো তৈরি করে তাতে শর্তসাপেক্ষে পর্যটকদের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি ভাড়া আদায় করেন।

তৃতীয়ত, বন বিভাগ বাণিজ্যিক দপ্তর (West Bengal Forest Development Corporation)-এর নামে পর্যটন ব্যবসা চালান বনের ভিতর এবং সব থেকে বেশি দামে।

আবার পর্যটনের কারণে বা নামে বক্সাতে যদি অন্য কোনও সরকারি বিভাগের আর্থিক সহায়তায় কোনও খাতে আর্থিক উপার্জনের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে বন দপ্তর নিজেকে সেই অর্থের দাবিদার মনে করে থাকেন। যে কারণে বক্সায় মাঝে মাঝেই দেখা যায় বন দপ্তর সংরক্ষণ ছেড়ে কখনও পিচ রাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত (যা মূলত পিডব্লিউডি দপ্তরের কাজ) বা কখনও পর্যটকদের জন্য উদ্যান বানাতে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে পর্যটন নিয়ে কোনও ঘোষিত নীতি নেই। আসলে বাঘের দপ্তর তো। কিছু নড়লেই ভাবে বুঝি বা শিকার এল।

সমাধান হিসেবে প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে

বক্সা পাহাড়ে যে সমস্ত ট্রেকার্স হাট বা হোম স্টে আছে, তাদের লাইসেন্স দিয়ে বিধিবদ্ধ করা এবং নির্দিষ্ট নিয়মনীতির মাধ্যমে কনজার্ভেশন টুরিজমে পরিচালিত করা।

বন দপ্তরের মাধ্যমে বা রাজ্য পর্যটন দপ্তরের দ্বারা বক্সায় একটি টুরিজম কমিটি গঠন।

ট্রেকিং রুটগুলি চিহ্নিত করে তার ম্যাপ করা এবং সেগুলিকে নিয়মিতভাবে কমিটির মাধ্যমে পরিচর্যা করা। এতে নির্দিষ্ট পথে ট্রেকিং সম্ভব হবে এবং নতুন পথের প্রয়োজন পড়বে না। ট্রেকিং আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

বন দপ্তরের মাধ্যমে বা রাজ্য পর্যটন দপ্তরের মাধ্যমে গাইড ট্রেনিং ও সুযোগ্য যুবকদের পর্যটনের গাইড হিসেবে দায়িত্ব দিলে পর্যটনের সঙ্গে সঙ্গে বনের পাহারার কাজও দেবে।

বন দপ্তরের মাধ্যমে বা রাজ্য পর্যটন দপ্তরের মাধ্যমে বনবস্তি এলাকাগুলিতে সৌর আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা, একটি স্বাস্থ্য ইউনিটের ব্যবস্থা করা, প্রতিটি গ্রামে পর্যাপ্ত স্ট্রেচারের জোগান রাখা এবং স্থানীয়দের First Aid Training-এর মাধ্যমে আপৎকালীন ব্যবস্থা রাখা, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের বাসটিকে প্রতিদিনের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করা, সান্তলাবাড়ি রেঞ্জ অফিসে মোবাইল অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা, বক্সা দুর্গকে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের মাধ্যমে protection and conservation-এর জন্য অতি সত্বর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

দীর্ঘ ৩২ বছরের পথ চলায় বন থেকে বনবাসীদের দূরে রেখে বক্সা বাঘবনের আধিকারিকরা কী লাভ পেয়েছেন জানি না। খুব কাছ থেকে দেখে যেটা মনে হয়েছে যে, বক্সা বাঘবনের উপর একচেটিয়া রাজত্ব করতে চেয়ে বন দপ্তর প্রতিবেশী বনবাসীদের ভরসা হারিয়েছেন, বনের সুরক্ষা করার ক্ষেত্রে সাহায্য পাবার আশা হারিয়েছেন, বন আধিকারিক এবং বনবাসীর সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। দীর্ঘ ১৫ বছর আগে থেকে বনবাসীরা বলে আসছিলেন যে বক্সায় বাঘের সংখ্যা কমেছে— এতদিন ধরে বাঘের সংখ্যা নিয়ে কারচুপি করার পর আজ বন দপ্তর যা ঘুরিয়ে স্বীকার করছে।

বন দপ্তরের এটা বোঝা উচিত যে ব্যাঘ্র প্রকল্প কেবলমাত্র ওঁদেরই সম্পত্তি নয়। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প একটি জাতীয় সম্পদ— বন বিভাগ তার জন্য দায়বদ্ধ, সকলের কাছে, বনবাসীদের কাছেও। তাই সময় থাকতে আসুন, Conservation Tourism & Wildlife Conservation-কে মিলিয়ে কীভাবে বাঘকে বাঁচিয়ে রাখা যায় ভাবা যাক।

পর্যটনে পেট ভরুক বনবাসীর।
বাঘ ভরপেট খেয়ে ঘুমাক।
প্রকৃতভাবে প্রকৃতি পর্যটনের উন্নতি হলে বাঘের ঘুম ভেঙে যাবে না...

উপল বাউলি

বক্সায় মাঝে মাঝেই দেখা যায় বন দপ্তর সংরক্ষণ ছেড়ে কখনও পিচ রাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত বা কখনও পর্যটকদের জন্য উদ্যান বানাতে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে পর্যটন নিয়ে কোনও ঘোষিত নীতি নেই।

অনুপম দৃষ্টান্ত

অনুপমদাকে নিয়ে বলতে হলে একটু আগে থেকে শুরু করতে হবে। বাবা জীবন বিমার কর্মচারী ছিলেন। তাঁর বদলির কারণে আমরা ১৯৬৪ সালে কোচবিহার থেকে জলপাইগুড়ি চলে আসি। তখন আমি ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র। রাজনীতি করার মানসিকতা তখনও তৈরি হয়নি আমার। কিন্তু তখনকার ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় যে প্রভাব আমার উপর পড়েছিল, তা আর আজীবন কাটিয়ে উঠতে পারলাম না আমি। এটা ১৯৬৫ সালের কথা। চিন ভারত আক্রমণ করেছে। কোচবিহারের রাস মেলার মাঠে প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য ত্রাণ তুলতে জাতীয় স্তরের কয়েকজন নেতা এসেছিলেন। যেমন জেনারেল কারিয়াপ্পা, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ। তাঁরা সভা করে ত্রাণের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। আমি তখনও স্কুলেই। কিন্তু ওই সময় আমি সাড়ে সাতশো টাকা ত্রাণ সংগ্রহ করে জমা দিয়ে আসি। আমার মনে হয়েছিল যে, দেশ যারা আক্রমণ করেছে, সেই চিনের যারা সমর্থক, তাদের রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা করতে হবে।

কলেজে গিয়ে আমি সেই ভাবনা থেকে ছাত্র পরিষদ করতে শুরু করি। শুরু করার সময় জানতামও না যে ছাত্র পরিষদ করা মানে কংগ্রেসি রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া। তবে সে সময় কিন্তু ছাত্র পরিষদ বা কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা তলানিতে ঠেকেছে। সমর্থন কমছে হু হু করে। যার ফলশ্রুতি হল ১৯৬৭ সালে রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন। আমি যখন কংগ্রেস করব কি না— এ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত এবং পরিচিতরা ভাবছে যে আমি চাকরি বা ভাল কোনও পদের লোভে কংগ্রেস করার কথা ভাবছি। ছাত্রছাত্রীরাও ছাত্র পরিষদের নাম শুনলে তখন টিটকিরি দিচ্ছে।

ফলে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে কংগ্রেসই করব। তখন আমাদের সংগঠন প্রায় ভেঙে গিয়েছে। নেতৃত্বের অভাব। সংগঠন করার জন্য তরুণ রক্তের তেমন কেউ নেই। আমি সেই সুযোগটাই কাজে লাগালাম। এর ফলে অচিরেই নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আমার পরিচিতি হল এবং সেই সুবাদে জলপাইগুড়ির কংগ্রেসি নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তখন আমরা প্রায়ই শুনতাম যে, শহরে কংগ্রেসের দুটো গোষ্ঠী। একটা খগেন দাশগুপ্তর এবং অপরটি রবি সিকদারের। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যাপারটায় আমি দুঃখ পেতাম।

এই সময়লগ্নে আমি একজনকে পাই, যিনি দুই শিবিরেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলেন

এবং আপাদমস্তক একটি সরল মানুষ হওয়ার কারণে দলমত নির্বিশেষে কাছের মানুষ। ইনিই অনুপম সেন। আমাদের অনুপমদা। শহরবাসীর প্রিয় ডাক্তারবাবু। অচিরেই তিনি আমাদের মতো তরুণ কর্মীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৬৯-এ কংগ্রেস ভাগ হল। ফলে নির্বাচনের প্রশ্ন এল ১৯৭১-এ। জলপাইগুড়ির বিধায়কের প্রার্থীতালিকায় তখন বাঘা বাঘা সব নামের প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু আমরা তরুণরা অনুপম সেনকে প্রার্থী করার জন্য অনশনে বসলাম। তিনি দাঁড়াতে চাননি। এ থেকে বোঝা যায়, গোড়া থেকেই তিনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। অন্য দিকে, আমাদের অনশন থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, তরুণদের কাছে তিনি কতটা প্রিয় ও নির্ভরযোগ্য। আমি জানি যে, তৎকালীন দলের অনেক রাশভারী নেতৃত্ব আমাদের দাবি মানতে চাননি। কিন্তু আমাদের আবেগ এবং শক্তির কথা বিবেচনা করে তাঁরা শেষ অবধি অনুপমদাকে উপেক্ষা করার সাহস দেখাতে পারেননি।

একই সঙ্গে বিধানসভা আর লোকসভা। বিধানসভায় অনুপমদা জিতলেন। আগেরবার ১৫ হাজার মার্জিন ছিল। এবার হল ২২ হাজার। লোকসভায় সিদ্ধার্থশংকর রায় জিতলেন, কিন্তু সরকার নব্বই দিনও টিকল না। ফলে আবার ১৯৭২-এ নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। মনে রাখতে হবে যে, ১৯৭১-এর নির্বাচন হয়েছিল নকশালবাড়ির সন্ত্রাসের বাতাবরণে আর নিরাপত্তাহীনতার আবহাওয়ায়। সেইখানে এই জয়ের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

এর পরেই ঘটল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সেখানে ইন্দিরা গান্ধির জনপ্রিয়তা হয়ে উঠেছিল আকাশচুম্বী এবং নকশালদের সন্ত্রাসও খানিকটা কমানো গিয়েছিল। ফলে রাজ্যে কংগ্রেসের পালে অনুকূল হাওয়া বইল। কংগ্রেস বিধানসভায় পেল ২১৮টি আসন এবং অনুপমদা আবার জিতলেন। এর পরে যেটা ঘটেছিল, তা মানুষ অনুপম সেনকে একবারে চিনিয়ে দেয়। ৫২ বছরের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় ৩৯ বছরের অনুপমদাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিলেন। অনুপমদা সে প্রস্তাব এক কথায় ফিরিয়ে দিলেন, কারণ মন্ত্রী হলে নিজের জায়গায় রোগীদের দেখবে কে? কে জোগাবে গরিব রোগীদের চিকিৎসার ওষুধ আর পথ্য? আজ যখন ক্ষমতার লোভে মানুষ অনায়াসে রাজনৈতিক দল বদলে ফেলছেন, তখন অনুপমদার মতো মানুষদের এই প্রত্যাখ্যান 'অলৌকিক' মনে হয়। এর পরেও তিনি আরও দু'বার বিধায়ক হয়েছেন। আটের দশকে যখন জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় সব বিধানসভা কংগ্রেসের হাতছাড়া, তখন শহর থেকে একমাত্র অনুপমদাই জিতেছেন।

অনুপমদা কি ভাল সংগঠক ছিলেন? না। তিনি রাজনীতির চাইতে রোগীদের নিয়েই মেতে থাকতেন মূলত। ভোটে দাঁড়িয়ে তিনি সারাদিন রোগী দেখে হয়ত বিকেলের দিকে একটু ঘুরে বেড়াতেন প্রচারের জন্য। এতেই কাজ হয়ে যেত। কারণ, তাঁকে যারা ভোট দিতেন, তাঁরা অনুপমদার রাজনৈতিক চিহ্ন বিচার করতেন না, অনুপমদাকে বিচার করতেন। একজন সুচিকিৎসক, বিধায়ক রিকশায় চেপে রোগীর বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। এক-দু'টাকা ভিজিট নিয়ে চেম্বারে রোগীর সমাবেশ সামলাচ্ছেন— এ জিনিস চোখের সামনে দেখেছে বলেই মানুষ তাঁকে ভালবেসেছে। আজকের আত্মপ্রচারসর্বস্ব যুগে এমন প্রচারবিমুখ বিধায়কের জীবন নবপ্রজন্মের কাছে আদর্শ হওয়া উচিত। নির্লোভ না হলে এ জিনিস হয় না।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ধীরাজ সেনের সার্থক উত্তরসূরি ছিলেন অনুপমদা। তিনি নিজেকে দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, রাজনীতি করতে আসা মানুষের আদর্শ কী হওয়া উচিত। কংগ্রেসকে তিনি দিয়েছেন অনেক, কিন্তু কিছুই নেননি।

তিনি নিজেই এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

দেবপ্রসাদ রায়

(জনদরদি চিকিৎসক ও চারবারের বিধায়ক অনুপম সেন ৮৯ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন তাঁর নিজ শহর জলপাইগুড়িতে। তাঁর জন্ম ১৯২৭ সালে, ঢাকায়। তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের ডাক্তারি ছাত্রদের প্রথম ব্যাচ। চিকিৎসাকে সমাজসেবা হিসেবে গ্রহণ করে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। দলমত নির্বিশেষে মানুষ তাঁকে গ্রহণ করেছেন। এই অসামান্য মানুষটিকে স্মরণ রেখেই এই রচনাটি প্রকাশিত হল।)

সোনালি চা-বাগান শ্রমিক সমবায় আন্দোলন চটকল শ্রমিক আন্দোলনেও উৎসাহ জুগিয়েছে

মহাভারতে বালক অভিমন্যুকে বধ করতে কৌরবপক্ষের সমস্ত বীর যোদ্ধা চক্রব্যূহ রচনা করেছিলেন। অভিমন্যু যে বীরত্বে প্রবীণ যোদ্ধাদের থেকেও বীর ছিলেন, তার প্রমাণ, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় ধর্ম বিসর্জন দিয়ে এক বালক যোদ্ধাকে হত্যা করতে কৌরবপক্ষের সমস্ত যোদ্ধাকে একযোগে আক্রমণ করতে হয়েছিল। অভিমন্যু একা সেই আক্রমণকে বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করেও শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন। মহাভারতে অভিমন্যু নিহত হয়েও এক বীরগাথা হয়ে আছেন। একই কথা বলা যায় রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে প্লেটোর রিপাব্লিকাকে মনের ভিতর গেঁথে নিয়ে স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ যাত্রা। নিহত হয়েছিলেন স্পার্টাকাস বিশাল রোমান সেনার হাতে। কিন্তু জন্ম দিয়ে গিয়েছেন হাজার হাজার ভবিষ্যৎ স্পার্টাকাসের।

স্পার্টাকাসরা সৃষ্টি করে যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে একে একে উঠে আসে ভবিষ্যৎ গড়ার প্রেরণার সেনাবাহিনীরা। চা-বাগানের শ্রমিক ইতিহাসের স্পার্টাকাস যে সোনালি চা-বাগানের এই সমবায় গঠনের কারিগররা।

সোনালি চা-বাগান আয়তনের বিচারে কোনও বড় চা-বাগান নয়। এটি একটি মাঝারির থেকেও ছোট বাগান। টি-বোর্ডের সংজ্ঞায় ১০.১২ হেক্টর জমি পর্যন্ত ক্ষুদ্র চা-বাগিচা বলা হয়। সারা দেশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চা-বাগিচার সংখ্যা ২০০৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল ১,৫৯, ১৯০টি। ডুয়ার্সে বৃহৎ চা-বাগিচার সংখ্যা ১৭২টি। চা-বাগিচা সাম্রাজ্যের ভিড়ে সোনালি চা-বাগানের মতো একটা মাঝারি মাপের চা-বাগান বন্ধ হয়ে গেলে কারও মাথাব্যথার কোনও কারণ ছিল না। সমস্যাটা হল, এই বাগানটিকে বন্ধ করে দেওয়াকে মেনে না নিয়ে সেখানকার শ্রমিকদের এই সমবায় গঠন।

দাস প্রথা যখন চালু ছিল, তখন একজন, দু'জন বা দশজন দাস পালিয়ে গেলে দাস মালিকেরও বিচলিত হবার কারণ ছিল না। তবু পলাতক দাসের সংখ্যা একজন হলেও তাকে খুঁজে ধরে আনতে দাস মালিকরা বিশাল অনুসন্ধানকারী দল পাঠাত। কারণ তারা জানত, মুক্তির বাতাস নিতে যদি একজন দাসও সক্ষম হয়, তবে সেই তা ঝড়ের মতো অন্য দাসদের মনেও এনে দেবে মুক্ত বাতাসের আহ্বান।

সোনালি চা-বাগানের সমবায় যে শ্রমিকের জীবনে সেই প্রত্যয়ী মুক্তির বাতাস। এই ভয়টা শুধু ফাটকাবাজ চা-বাগিচা মালিকদের বিচলিত করে তা নয়। এর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এই ফাটকাবাজির উষ্ণ হাওয়ায় যারা পকেটকে উষ্ণ করার সুযোগ পায়, ট্রেড ইউনিয়নের নামে শ্রমিকদের নিয়ে যারা ট্রেডের কারবার ফেঁদে বসেছে, আমলারা যারা মালিকের চুরির ভাগ পায়, রাজনৈতিক নেতা যারা এইসব মালিকের মাথায় ছাতা ধরার বিনিময়ে নিজেদের সুখের ইমারত গড়ে, তাদের মনের মধ্যে। দেখা গেছে, সৎ মানুষরা ঐক্যবদ্ধ হতে যত সময় নেয়, তার থেকে অনেক দ্রুত ক্ষমতালোভী ও অসৎ মানুষরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ গড়ে তুলতে পারে। তাদের মধ্যে থাকে একই রকম আতঙ্ক— এই বুঝি তাদের লুঠের প্রাসাদ আক্রান্ত হয়ে ধসে পড়ে।

সোনালি চা-বাগানটিকে বন্ধ করে দিয়ে বাগানের মালিকরা শ্রমিক ও বাগানটিকে কী অবস্থায় রেখে চলে গিয়েছিল, সেই আলোচনা আগেই করা হয়েছে। বাগানের শ্রমিকরা ১৯৭৩ সালে নিজেদের স্বেচ্ছাক্রমে এর জীবনদানের প্রতিজ্ঞা নিয়ে সমবায় গঠন করেছিলেন। তখন ছিল সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা। বাম দর্শনের বিচারে যে শ্রেণিতত্ত্ব, তাতে বলা যায়, শ্রমিক-কৃষক স্বার্থ বিরোধী বুর্জোয়া সরকার। অথচ সেই সরকারের আমলারা বাগিচা শ্রমিকদের এই উদ্যোগকে তাঁদের পদমর্যাদায় সমর্থন জানিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ শ্রম কমিশনারের কাছে রাজ্যের অতিরিক্ত শ্রমাধ্যক্ষ এন সি কুণ্ডু ১৯৭৫ সালের ২০ মার্চ যে সুপারিশপত্র পাঠিয়েছিলেন, তাতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ওই চিঠিতে লেখা হয়েছিল—

মহাশয়,
১৯৭৩ সালে সোনালি টি এস্টেট কিছুকাল পরিত্যক্ত থাকে। আর্থিক সংকটের কারণে কোম্পানির দুই ডিরেক্টর ভি কে খেমকা ও কে কে খেমকা বাগানটি চালাতে অক্ষমতা জানান। শ্রমিকদের বহু মাসের মজুরি বন্ধ রাখেন, তারপর গোপনে বাগানের অস্থাবর সম্পত্তি সকল সরিয়ে ফেলেন। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে বাগানের ৩৮৯ জন শ্রমিক 'সাও গাঁও টি অ্যান্ড অ্যালায়েড প্লান্টেশন ওয়ার্কার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি' নামে চিন্ময় ঘোষের নেতৃত্বে একটি সমবায় গঠন করে। ৩.১২.৭৩ সমবায়টির রেজিস্ট্রি হয়। তখন থেকে বাগানটি সুষ্ঠুভাবে চলছে। ২৮.০২.৭৫ তারিখে আমি ওই বাগানটিতে যাই। সমবায় সমিতির সদস্যগণ ও চিন্ময় ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করি। সে সময় সকল শ্রমিকই সমবায়ে যোগ দিয়েছেন। বিগত

এক বছরের পরিশ্রমের ফলে কাঁচা পাতা নিকটবর্তী চা-বাগানে বিক্রি করে সমবায়টি উল্লেখযোগ্য মুনাফা করেছে। সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান ব্যাঙ্কের পাসবই খুলে দেখালেন সমিতির খাতে জমার অঙ্ক। দেখা গেল, ০৬.০২.৭৫ তারিখে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের জলপাইগুড়ি শাখায় (অ্যাকাউন্ট নম্বর ১৬২৩) সমিতির নামে
১,৯৩,৯৬৬.৬৬ টাকা জমা আছে। জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পাসবুকে ১,৪০,০০০ টাকা জমা আছে। আমাকে বলা হল শ্রমিকদের প্রতিদিন ৩.১২ টাকা হারে মজুরি দেওয়া হয়, রেশন ও জ্বালানি কাঠও নিয়মিত পাওয়া যায়। উৎপাদিত পাতার পরিমাণ বছরে ৪ লক্ষ টাকার। এটি ৬৫-৯০ পয়সা কিলো হিসেবে লিজ রিভার টি এস্টেটে বিক্রি করা হয়। আমি দেখলাম একটি ডিসপেনসারি আছে। এক মেডিক্যাল অফিসার পাকাপাকিভাবে বহাল এবং সেটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। সমবায় সমিতির সংগঠকরা জানালেন, বকেয়া খাজনা সমবায় তরফে জমা করে জলপাইগুড়ির উপমহাধ্যক্ষের কাছ থেকে তাঁরা লাইসেন্স পেতে চেষ্টা করছেন। সমিতির তেমন আর্থিক জোর নেই, বাগানের এলাকায় তৈরি চা-বাগানের উদ্দেশ্যে ফ্যাক্টরি বানানোর ক্ষমতা তার নেই।

সোনালি টি এস্টেটের শ্রমিকরা সমবায় সমিতি গঠন করে তার সহায়তায় বাগানটি চালানোর ব্যাপারে সফল হয়েছে। এক পরিত্যক্ত চা-বাগিচার শ্রমিকদের এই পরীক্ষানিরীক্ষা অনন্য। শেষে সরকারের অবগতির জন্য এটি জানানো হল।

—আপনার অনুগত
স্বাক্ষর- এন সি কুণ্ডু
অতিরিক্ত শ্রমাধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ

সে দিন রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত শ্রমাধ্যক্ষই যে সরকারের কাছে প্রচণ্ড শক্তিশালী চা-বাগিচা মালিক ও তাঁদের লবিকে অগ্রাহ্য করে সমবায় গঠনের পক্ষে জোরালো সুপারিশ করেছিলেন তা নয়, তৎকালীন রাজ্য সরকারের কোঅপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্ট্রার ভি কে ঘোষ আইএএস রাজ্য মন্ত্রীসভার কাছে এই বাগান মালিকদের নানা অপকর্মের কথা উল্লেখ করে সোনালি চা-বাগান শ্রমিকদের এই সমবায় গঠনের প্রতি সুপারিশপত্র পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সেই সুপারিশে বলা হয়েছিল—

১) জলপাইগুড়ির 'The Great Gopalpur Tea Co.'-টির অন্তর্গত কয়েকটি চা-বাগানের মালিকানা বি সি ঘোষের। জলপাইগুড়ি জেলার মাল থানার অন্তর্গত মৌজা সাও-গাওয়ের সোনালি চা-বাগানটি তারই। ১৯৭২ সালে কলকাতা নিবাসী ভি কে খেমকা ও কে কে খেমকা এই কোম্পানিটির শেয়ারের সিংহভাগ কিনে নেন। যথাক্রমে তাঁরা কোম্পানিটির ডিরেক্টর, চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টরের পদে আসীন হন। কোম্পানি তখন প্রায় ২৮ লক্ষ টাকার ঋণে ডুবে আছে। নতুন ডিরেক্টরেরা কোম্পানির উন্নয়নের কোনও প্রচেষ্টা তো করলেনই না, উপরন্তু কোম্পানির ঋণের অঙ্ক এক বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াল।

২) ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর দুর্গাপূজার মাত্র কয়েকদিন আগে বাগান শ্রমিকদের বকেয়া মাইনে, পুজো বোনাস, প্রসূতি কল্যাণ প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত কোনও ব্যবস্থা না নিয়েই খেমকারা বাগান থেকে সরে পড়লেন। শ্রমিকদের পাওনার অর্থমূল্য ছিল আনুমানিক ৩.৭৫ লক্ষ টাকা। বাগান মজুর ও খেমকাদের সেই শেষ দেখাদেখি।

৩) চায়ের বাজার তখন মন্দা। উপবাসী শ্রমিকরা তিন মাস অসীম ধৈর্যের সঙ্গে খেমকাদের ফিরে আসার আশায় অপেক্ষা করল। অবশেষে ১৯৭৩ সালের ১০ ডিসেম্বর শ্রমিকরা মিছিল করে জলপাইগুড়ি গিয়ে জেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে নতুন একটি পরিচালক সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৩ ডিসেম্বর চা-বাগানে ফিরে এসেছিল।

৪) চা-পাতা তোলার পরবর্তী মরশুমের আগে আরও চার মাস মজুররা উপবাসে কাটাল। সোনালি চা-বাগান ছিল 'দ্য গ্রেট গোপালপুর টি কোং'-এর একটি আউট ডিভিশন এবং এর নিজস্ব কোনও ফ্যাক্টরি ছিল না। তার কাঁচা পাতার থেকে চা-পাতা তৈরি হত রুপালি চা-বাগান বা অন্য কোনও চা-বাগানের ফ্যাক্টরিতে। কর্মীরা পেটের ভাত জোগানোর জন্য পার্শ্ববর্তী চা-বাগানগুলিতে কাঁচা পাতা বিক্রি করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর এই শ্রমিকরা একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন এবং তখন থেকে এই সমিতিই বাগানটি চালাচ্ছে।

৫) ঘটনাচক্রে এই সমিতি গঠন হবার পর চা-বাজার তৈরি দেখা যায়। সমিতি তখন মজুরদের শুধু নিয়মিত বেতনই দিত না, ভাতার ভরতুকি এবং চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থাও করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এ বাবদ সমিতি বাগানের সীমা বিস্তার, নার্সারি তৈরি, একটি ট্রাক্টর ও জিপ কেনা, শ্রমিকদের জন্য থাকার ঘর নির্মাণ ইত্যাদি প্রসারণমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজ চালাতে থাকে। এই সমস্ত খরচা মিটিয়েও ১৯৭৫ ও ১৯৭৬— এই দু'বছরে সমিতির হাতে যথেষ্ট বাড়তি অংশ থাকে। জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে এটির বর্তমান আমানত পাঁচ লক্ষ টাকারও বেশি।

৬) খেমকাদের বাগান ছেড়ে যাওয়ার সময় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত বাগান শ্রমিক এই সমিতির সদস্যের পদ পান। সমিতির বর্তমান সদস্যসংখ্যা প্রায় ৪০০-র কাছাকাছি।

৭) বাগান ছেড়ে যাওয়ার পর খেমকারা পরিচালক পর্যদের একটি বৈঠকে বাগানটি শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার একটা কপি নিম্নে প্রদত্ত।

৮) উপরের কপির দু'নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বৈঠকের দিন থেকেই সোনালি চা-বাগানের মালিকানা ও দেখাশোনার ভার কর্মীদের। মালিকানা হস্তান্তরের এই খবরটি কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের অধীক্ষক, আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার, জলপাইগুড়ির ডিসি এবং শ্রমিক ইউনিয়ন ভিন্ন আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

৯) পরিমল মিত্র ছিলেন জলপাইগুড়ি মালের চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। 'দ্য গ্রেট গোপালপুর টি কোং'-এর রুপালি ও আরও কয়েকটি চা-বাগান ছিল এই ইউনিয়নের অনুগত।

১০) ইতিমধ্যে চিন্ময় ঘোষ নামে এআইটিইউসি-র এক স্থানীয় নেতা সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকদের নেতা হয়ে ওঠেন ও সমবায় সমিতি গঠন করতে সবচেয়ে বেশি মদত দেন। বাগানের প্রসারণ ও উন্নয়ন কৃতিত্বেরও তিনি দাবিদার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমমহাধ্যক্ষ এন সি কুণ্ডুর ২০.০৩.৭৫-এ লেখা চিঠির একটি কপি নিম্নে প্রদত্ত হল। চিঠির বিষয়বস্তু, বিশেষত ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে বাগান পরিচালন সমিতির সাফল্যের গুরুত্ব সহজেই বোধগম্য।

১১) ১৯৭৫ সালের গোড়া থেকেই সরকারের সমবায় বিভাগ জলপাইগুড়ির মহাধ্যক্ষ ও উপমহাধ্যক্ষর সঙ্গে কথা বলেও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (এই ব্যাঙ্কটি 'দ্য গ্রেট গোপালপুর টি কোং'-কে টাকা ধার দিত)-র মত নিয়ে সোনালি চা-বাগানটিকে সমবায় সমিতি ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সমিতির মঙ্গলকারী এসব কোনও পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হয়নি।

১২) ইতিমধ্যে ইউবিআই 'দ্য গ্রেট গোপালপুর টি কোং'-এর বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ির উপবিচারকের আদালতে মামলা রুজু করেছে। চা কোম্পানির অংশ হিসেবে এই সমবায় সমিতিও মামলায় জড়িয়ে পড়ে। আদালত খেমকাদের অবিলম্বে আদালতে ২ লক্ষ টাকা জমা দিতে বলে ও আদালতের দ্বারা নিযুক্ত লোকের হাতে চা-বাগানটি তুলে দিতে সমবায় সমিতিকে নির্দেশ দেয়। খেমকারা টাকা নিয়ে এল না। শুধু তা-ই নয়, উচ্চ আদালতে সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা করল।

১৩) শেষ পর্যন্ত আদালতের মত নিয়ে রুপালি চা-বাগানটি বিক্রি করে ইউবিআই তাদের ক্ষতিপূরণ করে। ব্যাঙ্কের তরফ থেকে সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হয় ও তারা জলপাইগুড়ির উপমহাধ্যক্ষকে জানিয়ে দেয় যে, সোনালি চা-বাগান আর বন্ধক নেই। সেটি যেন 'দ্য গ্রেট গোপালপুর টি কোং'-কে ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ০৬.০৭.৭৬-এ পশ্চিমবঙ্গের সমবায় বিভাগের মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আয়োজিত মিটিংয়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের একেবারেই বিপক্ষে যায়। 'দ্য গ্রেট গোপালপুর টি কোং' ১৯৬৯ সাল থেকে ইজারা কর দেয়নি। সুতরাং উপমহাধ্যক্ষের উচিত ছিল ইজারা বন্ধ করা। ইউবিআই-এর কাছ থেকে ১৯৭৬ সালে বকেয়া কর গ্রহণ করা তার উচিত হয়নি। এতে শুধুমাত্র খেমকাদের দাবি আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

১৪) বারবার সমবায় বিভাগ ব্যাপারটি উপমহাধ্যক্ষের কাছে আলোচনার জন্য উপস্থিত

করার পরেও তা তাঁর দ্বারা সম্যক গুরুত্ব ও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। হিল্লা চা-বাগানের ক্ষেত্রে কিন্তু উপমহাধ্যক্ষ ওই একই পরিস্থিতিতে ইজারাদাররা বাগান ছেড়ে চলে গেলেই ইজারা বন্ধ করে দেন। এ ক্ষেত্রে সোনালি চা-বাগানের মতো হিল্লা চা-বাগানের মজদুর সংগঠনকে পাঠানো একটি চিঠিতে তিনি সব খুলে বলেন। অবশ্য আগের ইজারাদাররা উপমহাধ্যক্ষের আদেশের বিপক্ষে আদালতে আরজি পেশ করে। উপমহাধ্যক্ষ তার আগেই ইজারা বন্ধ করে দেন ও নতুন লোককে ইজারা দেবার পরিকল্পনাও নেন। আগের ইজারাদাররা এই সময় আদালতের রায় নিয়ে এলেন, কিন্তু পুরনো ইজারাদারদের নামের জায়গায় নতুন কোনও নাম আনা আর সম্ভব হল না।

১৫) ৩১.০৫.৭৮-এর আলোচনায় উপমহাধ্যক্ষ সমবায় সমিতির নিবন্ধককে আশ্বাস দেন যে, তিনি সরকারি উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন এবং এও বলেন যে, যদি তাঁর উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা না থাকে তাহলে তিনি খেমকাদের ইজারা বন্ধ করার সবরকম ব্যবস্থা নেবেন এবং সমবায় সমিতিকে নতুন করে ইজারা দেবেন।

১৬) টি-বোর্ড ইতিমধ্যে কিন্তু 'দ্য গ্রেট গোপালপুর টি কোং'-এর কাছ থেকে পাওনা আদায় করার জন্য উচ্চ আদালতের কাছ থেকে একটি আজ্ঞপ্তি পায়। আজ্ঞপ্তিটি নির্বাহ করার দায়িত্ব ছিল জলপাইগুড়ি আদালতের উপর। এ ব্যাপারে টি-বোর্ডের সভাপতির কাছে যাওয়ার পর তিনি বলেন যে, নিলামে সমবায় সমিতিও অংশ নিতে পারে। তবে তিনি এও বলেন যে, একমাত্র জলপাইগুড়ি কোর্ট আদেশ দিলেই বাগান নিলাম করা যাবে। তার আগে নয়।

১৭) খেমকারা কিন্তু এই মুহূর্তে গায়ের জোরেও বাগান দখল করার কথা ভাবেন, কেননা সমিতির দ্বারা বাগানের অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং তার অর্থমূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপরীতে সমিতির সব কর্মী সদস্যও খেমকাদের হাতে বাগান না তুলে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

১৮) তথ্যানুযায়ী খেমকারা স্থানীয় পুলিশমহলকেও হাত করার চেষ্টা করে। আগে তাঁরা কিছু স্থানীয় গুন্ডা ভাড়া করে। বাগান দখলের জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু শ্রমিকরা রুখে দাঁড়িয়ে গুন্ডাদের তাড়িয়ে দেয়। খবর এও বলে, এআইটিইউসি-র বিপক্ষ দলগুলি বাগানে গোলযোগ বাধানোর চেষ্টা করে। এমনকি কংগ্রেস (আই) নেতাও সমিতির নিবন্ধককে অনুরোধ করেন, সমিতি যেন বাগানটিকে এই ভদ্রলোকের হাতে তুলে দেয়। এই ভদ্রলোক নাকি খেমকাদের কাছ থেকে বাগানটি কিনে নিয়েছেন। ৩০.০৫.৭৮-এ জায়গাটি পরিদর্শনের সময় নিবন্ধক মশাইয়ের মনে হয়, এই বাগান কেনার ব্যাপারটি অলীক।

১৯) সমিতির নিবন্ধক উত্তরবঙ্গের পুলিশের উপমহাপরিদর্শকের সঙ্গে দেখা করে বাগানের শান্তি যাতে বহিরাগতদের দ্বারা বিঘ্নিত না হয় তা দেখতে অনুরোধ করেন। উপমহাপরিদর্শক কথা দেন যে, পুলিশ পূর্বস্থিতি রক্ষার্থে যথাসম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কখনওই বাগান জবরদখল হতে দেবে না।

২০) হলদিবাড়ি টি এস্টেট সোনালি চা-বাগানের পাতা কিনত। কিন্তু খেমকাদের ছলনায় হাই কোর্টের আদেশে তা বন্ধ হয়ে যায়। অন্য একটি চা-বাগানকে বিক্রি করার চেষ্টা হয়। কিন্তু হাই কোর্টের ভয়ে তাও আর হয়ে ওঠে না।

২১) সমবায় সমিতিকে সরাসরি সমর্থন করা খুবই আবশ্যক। এ ব্যাপারে সরকারি সাহায্য দরকার। পুলিশ কর্তৃপক্ষকেও এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া দরকার। জলপাইগুড়ির উপমহাধ্যক্ষকেও 'দ্য গ্রেট গোপালপুর টি কোং'-এর ইজারা বন্ধ করতে খোলাখুলি নির্দেশ দেওয়া দরকার। একই সঙ্গে সমবায় সমিতিকে নতুন করে ইজারা দেবার কথাও ভাবতে হবে।

২২) সমবায় সমিতিতে এখন টি-বোর্ড এবং সরকারের সমস্ত পাওনা মেটাবার ব্যবস্থা আছে। এর মধ্যে আছে ইজারা কর, বাড়ি বা নির্মাণের যান ইত্যাদি।

২৩) আমাদের দেশের বাগিচাশিল্পে সমবায়িকতা আনার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এ এক অনন্য পরীক্ষা। এই পরীক্ষাকে সফল করতেই হবে। বাগিচা শ্রমিক, যাদের অধিকাংশই আদিবাসী, তাদের গঠিত এক সমবায়কে ইজারাদাররা উত্ত্যক্ত করছে ও চাপ দিচ্ছে, আর সরকার নিশ্চেষ্ট বসে থেকে তা দেখে যাবে, এ হতে পারে না। এই ইজারাদাররা বকেয়া পাওনা না মিটিয়ে মালিকানা এবং পরিচালনার দায়িত্ব বাগিচা শ্রমিকদের হস্তান্তরিত করেনি, তারা চলে যায় যখন লাভে মন্দা পড়ে। শ্রমিকরা তখন কঠোর কষ্ট সহ্য করে কঠিন শ্রমে বাগানের অবস্থার উন্নতি করলেন। এঁরা এখন তার মালিকানা এবং পরিচালনা ফিরে পেতে চান।

২৪) এ বিষয়ে মন্ত্রীসভা পর্যায়ে এক নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া দরকার। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে এই পরীক্ষা সফল করার জন্য সরকারের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া উচিত।

—ডি কে ঘোষ
রেজিস্ট্রার অব কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ,
পশ্চিমবঙ্গ

'দ্য গ্রেট গোপালপুর টি কোং' যে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের পরিত্যক্ত এই সোনালি চা-বাগানটিকে শ্রমিকদের হাতে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার প্রতিলিপির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল—

দ্য গ্রেট গোপালপুর টি কোম্পানি
তাঃ- ২৭.০৯.১৯৭৩, রেজি. নং জিসি/৭৩ ডি লিঃ

দ্য সুপারিনটেন্ডেন্ট অব সেন্ট্রাল এক্সাইজ
মাল রেঞ্জ, জেলা- জলপাইগুড়ি
প্রসঙ্গ- **রুপালি ও সোনালি টি এস্টেট**

মহাশয়,
উপরোল্লিখিত টি এস্টেটগুলির ম্যানেজমেন্ট আজ থেকে আমরা হস্তান্তরিত করলাম শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নকে। আজ থেকে আমরা সেন্ট্রাল এক্সাইজ সম্পর্কিত কোনও কাগজে সই করব না। ওদের প্রতিনিধি সে কাজ করবে। আশা করি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি আপনার সঙ্গে অচিরে এ বিষয়ে যোগাযোগ করবেন। এ প্রসঙ্গে বোর্ডে গৃহীত সিদ্ধান্তের একটি সার্টিফায়েড কপি এই সঙ্গে দেওয়া হল।

—আপনার অনুগত
স্বাক্ষর (অবোধ)
দ্য গ্রেট গোপালপুর টি কোম্পানি লি-এর
জেলা চেয়ারম্যানের পক্ষে

তৎকালীন রাজ্য সমবায় মন্ত্রীর ঘরে বিভিন্ন পক্ষের উপস্থিতিতে ০৭.০৭.৭৬ তারিখে যে সভা হয়েছিল, তার সিদ্ধান্তগুলি নিচে দেওয়া হল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ওই সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন তৎকালীন সমবায়মন্ত্রী স্বয়ং।

সেই সভার সিদ্ধান্ত—

১) সোনালি চা-বাগান নয়, শুধু রুপালি চা-বাগানকেই নিলামে তোলা হোক। এই মর্মে ইউবিআই জলপাইগুড়ি আদালতে এক প্রার্থনা জানাবে। সমগ্র টি এস্টেটের জন্য গৃহীত ৩০ লক্ষ টাকার অংশ বণ্টন সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে রুপালি টি এস্টেট নিলাম হবার পরে অনাদায়ী ৩০ লক্ষ টাকার যতটা বকেয়া থাকবে— আদালত রাজি হলে তা ব্যাঙ্কের কাছে সোনালি টি এস্টেটের ঋণ বলে বিবেচিত হবে।

২) সরকারের কাছে এক গৃহীত সিদ্ধান্ত পাঠিয়ে সোনালি চা-বাগান শ্রমিক সমিতি অনুরোধ জানাবে— যেন সরকার ইউবিআই-এর বিশ্বাসভাজন এমন কয়েকজন পরিচালককে মনোনীত করেন, যাঁরা কর্মদক্ষতা উন্নয়নে এবং ঋণ পরিশোধে সমিতিকে সঠিক পথে চালনা করবেন। ইতিমধ্যে যথাসময়ে এমন তিনজন অতিরিক্ত ডিরেক্টর নিয়োগ বিষয়ে ইউবিআই-ও সরকারের কাছে সুপারিশ করবে।

৩) সোনালি চা-বাগান সমবায় সমিতি স্বীয় কর্মদক্ষতা বর্ধনে এবং ইউবিআই-এর ঋণ পরিশোধ যত দূর সম্ভব করবে। এই সিদ্ধান্তের কপি মাননীয় রাজ্যমন্ত্রী দেখলে তা ইউবিআই-এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আর কে দত্তকে পাঠানো হবে।

সদয় বিবেচনার্থে
স্বাক্ষর- পি ভি শেনয়
সচিব, সমবায় দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার
০৭.০৭.৭৬

টি-বোর্ডের সচিব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোঅপারেটিভ সোসাইটিজের রেজিস্ট্রার ডি কে ঘোষকে ১৯৭৮ সালের ৯ মে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেটিও এখানে উল্লেখ করা হল—

প্রিয় শ্রী ঘোষ,

আপনার ডি ও নং ৯৩৭৬-এর জন্য (তাঃ ২১ এপ্রিল ১৯৭৮) আমাদের ধন্যবাদ জানবেন। আমাদের বকেয়া আদায়ের জন্য আমরা 'দ্য গ্রেট গোপালপুর টি এস্টেট'-এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছি। আদালত থেকে ডিক্রি পেয়েছি নির্বহের জন্য উক্ত ডিক্রিকে জলপাইগুড়ি আদালতে স্থানান্তরিত করতে হবে।

১) আপনার প্রস্তাবনা মনে রাখলাম। শ্রমিক সমবায় সমিতিকে জলপাইগুড়ি স্থানীয় আদালতের কার্যক্রম বিষয়ে যোগ রেখে চলতে বলা উচিত হবে। আদালতের হুকুমে সেখানেই বাগানটিকে বিক্রির জন্য তোলা হতে পারে। প্রস্তাবিত বিক্রয়কালে সমিতি যদি দাম বেঁধে বাগানটি কিনে নিতে পারে, আমরা খুশি হব।

সৌজন্য জ্ঞাপনায়
আপনার অনুগত
স্বাঃ- কমলাবর মিশ্র

হায় বিধি, এ কোন বাম?

কমিউনিস্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় একদিন পায়ে পায়ে বস্তিতে ঘুরে ঘুরে এবং জীবন কাটিয়ে শ্রমিকদের পৃথিবীর মালিকানার স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছিলেন। মিখাইল শলোকভের 'Virgin soil upturned' বইটি সমবায় আন্দোলনের বেদ বলে চিহ্নিত হত। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদি হাতিয়ার বলেই চিহ্নিত হয়েছিল সমবায় আন্দোলন। 'লাঙল যার, জমি তার'— এই দাবির পাশাপাশি তো একদিন সেই স্বপ্নও দেখানো হত, শ্রমিকের পেশিই কারখানার জীবনীশক্তি। তাই তো সাম্যবাদের লাল পতাকার কেন্দ্রভূমিতে শুধু কাস্তে নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাতুড়ি। ঘোষণা করা হয়েছিল কৃষক ও শ্রমিকরাজের।

কংগ্রেস রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে বলতে গেলে প্রায় এক আকস্মিক রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে বামফ্রন্টকেই হতচকিত করে রাজ্যের জনতা কংগ্রেস বিরোধী রথের সারথি রূপে বামফ্রন্টের জন্য লাল দিঘির সেই ক্ষমতার কেন্দ্র লাল বাড়ির সিংহফটককে খুলে দিল। যদিও এই প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ নেই। তবু বলতে হয়, জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে জনতা পার্টি সারা ভারতে যে ইন্দিরা গান্ধি তথা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনজোয়ারের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল, সেই ঘটনার দম্ভে পশ্চিমবঙ্গের জনতা দল তাদের ক্ষমতার পরিধিকে পরিমাপ করতে ভুলে গিয়েছিল। তাই বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে যখন জনতা পার্টিকে ৫১ শতাংশ আসন ও তাদের জন্য ৪৯ শতাংশ আসন বরাদ্দ করার অনুরোধ করেছিল, প্রফুল্ল সেন সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ধরে নিয়েছিলেন, সারা ভারতে জয়প্রকাশ নারায়ণের জোয়ারের নৌকায় পশ্চিমবঙ্গেও তাঁরা একচ্ছত্র শাসন কায়েম করতে পারবেন। ভুলে গিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে একটা বামপন্থী হাওয়া বরাবরই শক্তিশালী ছিল। মনে রাখা দরকার, বামপন্থী বলতে কিন্তু শুধু কমিউনিস্ট দল বা মার্কসবাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ঘোষকদেরই বোঝায় না। কংগ্রেসের মধ্যেও ছিল বহু বামপন্থী অর্থাৎ শোষণের অবসানে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত প্রাণ এমন মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। তাঁদের অনেকেই রাজ্যের ঘোষিত বাম দলগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁদের শাসনকালেই ঘোষিত হয়েছিল জমিদারি প্রথা বিলোপ। যাক সে কথা। সে দিন প্রফুল্ল সেনদের সেই ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই যে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসাতে সাহায্য করেছিল, তার দ্বিমত প্রকাশের কোনও সুযোগ নেই।

বামফ্রন্ট কৃষক-শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। ছয়ের দশকে যে শিশুরা আঁতুড়ঘরে মায়ের গর্ভের রক্তে ভেজা কাপড়ে শুয়ে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিল, তাদের অনেকেই যে পায়ে পায়ে হেঁটে যৌবনে উপনীত হবার পথে সেই রক্তবর্ণ দলীয় পতাকার মধ্যে তাদের জন্মক্ষণের রক্তভেজা কাপড়টার স্পর্শ পেত। সেই যুবকদের মধ্যে ছিল সোনালি চা-বাগানের সাইমন ওরাওঁদের মতো অনেকেই। ধরে নিয়েছিল তাদের আপনজনরাই এবার ক্ষমতার আসন দখল করেছে। কংগ্রেস রাজত্বে গঠিত সমবায় সমিতির প্রতি কংগ্রেসি মন্ত্রীদের পরোক্ষ সমর্থন পেয়ে এগোতে পারলেও এবার বিশ্বাস করেছিল, খাঁটি কৃষক-শ্রমিকের দল বামফ্রন্ট সরকার যখন রাজ্যে ক্ষমতা অধিকার করেছে, তখন মৃতপ্রায় সোনালি চা-বাগানটির এবার আইনি অধিকার কায়েম করতে আর কোনও অসুবিধা থাকল না।

এই চা-শ্রমিকরাই মালবাজার কেন্দ্র থেকে সিপিএম প্রার্থী পরিমল মিত্রকে নির্বাচনে জয়ী হতে সর্বস্ব পণ করে লড়াই করেছেন। পরিমলবাবু হয়েছেন মেহনতি সরকারের বন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী। তাঁদের নেতা-মন্ত্রী। আপনজন। মেহনতি মানুষের স্বপ্নপূরণের জাদুকর। কানে কানে পদাতিক কবির সেই 'নবযুগ আবার প্রত্যয়ী' কথাগুলি যেন রক্তে এনে দিচ্ছে পৃথিবীর মালিকানার বার্তা।

এক বছরের মধ্যেই একটা সংশয় নির্বাচনের সময় মনকে ধাক্কা দিতে চাইলেও তাকে প্রতিক্রিয়াশীলের প্রচার বলে অগ্রাহ্য করলেও তা যে এমনভাবে নগ্ন সত্য বলে হাজির হবে তা তারা কল্পনাতেও জায়গা দিতে পারেনি। শুনতে পেয়েছিল, খেমকারা এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে সিপিএম প্রার্থী পরিমল মিত্রকে নানাভাবে সাহায্য করছে। বিশ্বাস করতে চায়নি। দেখতে পেয়েছিল গৌরীশংকর আগরওয়াল। কিছুদিন আগেও প্রতিদিন স্থানীয় ডিপো থেকে দু'টিন কেরোসিন এনে সারাদিন ধরে বিক্রি করে কোনওমতে সংসার চালাতেন। তাঁর পুত্র রাধেশ্যাম আগরওয়াল রাতারাতি পেট্রোল পাম্প-সহ এখানে বিশাল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক হতে পেরেছিল— সে গুঞ্জনের ঢেউ সোনালি বাগানের শ্রমিকদের কানে এসে পৌঁছলেও সেই গুঞ্জন নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি।

তাদের কাছে ব্যাপারটা জোরালোভাবে উপস্থিত হল, যখন দেখা গেল '৭৮ সালের ১০ জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের এক অস্থায়ী আদেশকে কার্যকরী করতে বামফ্রন্ট সরকারের ১২ লরি বোঝাই পুলিশবাহিনী নিয়ে খেমকাদের উকিল স্বপনকুমার মল্লিক সমবায় সমিতির অফিস দখল করতে এসেছিলেন। সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকরা তাঁদের সমিতির অফিসঘরের দরজা খোলা রেখে দূরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভাবা হয়েছিল তাঁরা লাঠি, তির, ধনুক নিয়ে বাধা দেবেন। শ্রমিকদের এই শান্তিপূর্ণ অবস্থানে তাই বামফ্রন্ট প্রশাসনকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হল। সোনালিকে সামনে রেখে আরেকটি মতবাদী নকশাল আন্দোলন বলে প্রচারের সুযোগ পেল না।

শ্রমিকদের কাছে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল, যখন তাঁরা দেখলেন, খেমকাদের উকিল হাই কোর্টের রিসিভার রূপে বনমন্ত্রীর একান্ত কাছের লোক রাধেশ্যাম আগরওয়ালকে বাগান পরিচালনার জন্য তাঁর এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করে গেলেন।

বামফ্রন্টের বিজয়ের পর পরিমল মিত্র মন্ত্রী হবার পর সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকরা কিন্তু প্রথমেই গিয়েছিলেন তাঁদের সেই চেনা নেতা-মন্ত্রী পরিমল মিত্রের কাছে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায়। এবার নিশ্চয়ই বামফ্রন্ট সরকার বেনামি মালিকদের হাত থেকে বাগানটিকে উদ্ধার করে শ্রমিক সমবায় সমিতির হাতে হস্তান্তর করবে। কংগ্রেসি মন্ত্রী গোপালদাস নাগ ও জয়নাল আবেদিন এই সমবায় গঠনে সহযোগিতা করেছিলেন। রাজ্য সরকারের আমলারাও তাই শ্রমিকদের পক্ষে সুপারিশ করার সাহস দেখাতে পেরেছিলেন। বামফ্রন্ট তথা কমিউনিস্ট দল ব্যক্তি মালিকানার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের কথা ঘোষণার মাধ্যমে শ্রমিক ও কৃষক রাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। বামফ্রন্টের মন্ত্রী পরিমল মিত্র কিন্তু সে দিনের প্রথম সাক্ষাৎকারে বলে দিলেন, শ্রমিকরা কোন অধিকারে বাগান চালাতে পারেনি তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা মুশকিল।

এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্নেই হাই কোর্টের মামলাতে উঠে এসেছিল মালিকানার নামে নানা কারচুপির ঘটনা। অথচ মালিকানার এই কারচুপির পক্ষেই বামফ্রন্টের শাসনকালে প্রশাসন একের পর এক প্রশ্রয় দিয়ে কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যু বধের মতো ডুয়ার্সের চা-শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে বন্ধ চা-বাগান চালু করার জন্য শ্রমিকের সমবায় আন্দোলনকে হত্যা করেছিল। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কোনও কোনও হত্যা জন্ম দেয় আরও নতুন প্রত্যয়। এক স্পার্টাকাসের পরিবর্তে জন্ম নেয় হাজার স্পার্টাকাস। সোনালি চা-বাগান শ্রমিকদের এই শ্রমিক আন্দোলন যে সেই ইতিহাস। আজ তাই বন্ধ চা-বাগানে কর্মহীন শ্রমিকদের জন্য পাকস্থলী যখন অভুক্ত শ্রমিকদের বেঁচে থাকার শক্তি জোগাতে অসমর্থ হয়, তখন অনাহারে মৃত্যুর মিছিলে আরেক অনাহারক্লিষ্ট ক্লান্ত শ্রমিকের কণ্ঠস্বরে 'রামনাম সত্য হ্যায়' ধ্বনিটি যতই ক্ষীণ আওয়াজ তুলুক না কেন, তা কিন্তু পৌঁছে যায় কালাহান্দি থেকে আমলাশোলে।

সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকের এই বাঁচার প্রতিজ্ঞা কানোরিয়া চটকল শ্রমিকদের সমবায় গঠন করতে উৎসাহ জুগিয়েছিল। এখানেও যে একই রকম অভিমন্যু বধের ইতিহাস। তবু মানুষ বিশ্বাস রাখে নতুন দিনের নতুন প্রত্যয়ের উপর। তাই আন্দোলন সেখানেই শেষ হয় না। রাস্তা করে দেয় আর এক আন্দোলনকে। সোনালি কানোরিয়া যে সেই ইতিহাস।

সৌমেন নাগ

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

১০

বর্মা থেকে ফেরার পথে গোপাল ঘোষ ভেবেছিলেন, জীবনে টাকাপয়সা অনেক হলেও দেখা হল না। ব্যবসার খাতিরে রেঙ্গুন আর কলকাতা ছাড়া তিনি গেলেনই বা কোথায়? এবার যখন জলপাইগুড়ি থেকে রেঙ্গুনের পথে বেরিয়েছিলেন, তখনই ভেবে রেখেছিলেন যে, কাজ ঠিকঠাক উতরোলে একটু বেরিয়ে আসবেন। তা কাজ ভাল তো হয়েছেই, বরং একটু বেশিই ভাল হয়েছে। তাই চট্টগ্রাম থেকে বাড়িতে তার করে দিয়ে তিনি সোজা পাড়ি দিলেন মুম্বই। সেখানে দিন পনেরো কাটিয়ে ফেরার সময় পুরনো জিনিসের দোকানে ক্যামেরাটা দেখে কিনে ফেলেছিলেন তিনি। শহরে যাঁদের ক্যামেরা আছে, তাঁদের কারও কাছেই এ জিনিস দেখেননি গোপাল ঘোষ। দোকানদার বলেছিল সে ক্যামেরার নাম 'লাইকা ওয়ান'। গোপাল ঘোষ ক্যামেরা বিষয়ে ঘোরতর অজ্ঞ হলেও তাঁর মনে হয়েছিল, সে ক্যামেরা থাকলে ইজ্জত বেড়ে যাবে। মোটরগাড়ি কেনার কথা তিনি প্রায়ই ভাবেন। কিন্তু শেষ অবধি সাহস করে উঠতে পারেন না। লোকের চোখে বেশি করে লাগবে বলেই সাহস হয় না তাঁর। সেদিক দিয়ে এই লাইকা ওয়ান তাঁর কাছে নিরাপদ মনে হয়েছিল। বাদামি রঙের চামড়ার খাপে মোড়া জিনিসটা তাঁর দেখা ক্যামেরাগুলোর মতো বাক্স-বাক্স চেহারার নয়। বরং বেশ ছোটখাটো। এতে বড় বড় ফিল্ম কীভাবে ঢুকবে, সেটা জিজ্ঞেস করায় দোকানদার একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বাংলা-হিন্দি মিলিয়ে বলেছিল, 'বড়া ফিলম কা জমানা চোলে গেলো বাবু। ছোটা নিগেটিভ কাসিট মে আতা আজকল। এক কাসিট ঘুসিয়ে দিবেন তো চালিশ পিকচার খটাখট খিঁচে দিবেন। একদম নই মডেল। অসলি জরমানি কা মাল।'

তা ফিল্মের 'কাসিট' আর ক্যামেরা মিলে খরচটা কম হয়নি নেহাত। গোপাল ঘোষের কপাল ভাল যে 'হুন্টিন সাব' বিলেত যাওয়ার তাড়ায় জিনিসপত্র বেচে চলে গেলেন। নইলে এই দামে এই জিনিস কী করে পেত সে? ফিল্মের যে 'কাসিট' একখানা পেল গোপাল ঘোষ, এটাই কি কম কথা! তামাম ইন্ডিয়াতে এমন 'কাসিট' চাইলেই মেলে না। মিললেও দাম শুনলে কাস্টমার ঘাবড়ে যায়।

অতএব ফিল্মের ক্যাসেট সমেত ক্যামেরা কিনে গোপাল ঘোষ কলকাতা হয়ে দার্জিলিং মেল চেপে জলপাইগুড়িতে ফিরেছেন দিন তিনেক হল। ক্যামেরা ছাড়া আরও একটা জিনিস মুম্বইতে দেখে তিনি মোহিত হয়েছিলেন, সেটা হল রেডিয়ো। বাক্সের মধ্য দিয়ে অমন কথা আর গান বার হয় দেখে তখনই কেনার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ফস্টার সাহেব তাঁর উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ওটা কেবল মুম্বই আর কলকাতার মেম্বাররাই শুনতে পায়। জলপাইগুড়িতে ওটার কোনও দাম নেই। 'বেটার টু কিপ আ উডেন বক্স ইন ইয়োর

ড্রয়িং রুম। বোথ উইল বি সাইলেন্ট।' ফ্যাচফ্যাচ করে হেসে বলেছিল সে। ফলে রেডিয়োকে বাদ দিতে হয়েছিল।

শহরে গোপাল ঘোষের ইয়ারদোস্তদের মধ্যে রাজু মুখুজ্জে ক্যামেরা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞানী। হেমন্তের এক ম্লান বিকেলে তিনি গোপাল ঘোষের বৈঠকখানায় বসে বেশ খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'এক্সেলেন্ট পিস। এই টাউনে এই জিনিস আর কারও কাছে নেই। আই অ্যাম শিয়োর।'

'ফোটো তুলতে পারবি না?' গোপাল ঘোষ সাগ্রহে জানতে চান। কিন্তু রাধু মুখুজ্জে তাঁকে হতাশ করে দিয়ে জানান যে, ব্যাপারটা মোটেও সোজা নয়। লেন্সের সামনে-পেছনে যে চাকা দুটো রয়েছে, তা মেলাতে হবে। তারপর ফিল্ম ভরার ব্যাপারটা তো আছেই। ক্যাসেটটা ঠিক কীভাবে ক্যামেরার পিছনটা খুলে সেট করতে হবে, সেটাও আরেকটা জটিল দিক। তা ছাড়া এই ফিল্ম কি আর জলপাইগুড়িতে ডেভেলপ হবে?

সব সমস্যা শোনার পর গোপাল ঘোষ ঠিক করলেন যে, তিনি ক্যামেরাটা একটা কাচের বাক্সের মধ্যে ভরে বৈঠকখানাতে সাজিয়ে রাখবেন। এতে আসল কাজটা হবে। শহরে ক্যামেরাটার খবর ছড়াতে বেশি দেরি হবে না। দেরি অবশ্য হল না। দিন পনেরোর মধ্যে একদিন গোপাল ঘোষকে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান খগেনবাবু তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, 'শুনেছি কী একটা লাইকা ক্যামেরা ঘরে বাঁধিয়ে রেখেছ! ওসব কি সাজিয়ে রাখার জিনিস? বেচে দিয়ে টাকাটা কংগ্রেসি ফান্ডে জমা করে দাও।'

পরের সপ্তাহেই সিভিল সার্জেন ইয়ুং সাহেবের এক বন্ধুকে ক্যামেরাটা বেচে দিয়ে গোপাল ঘোষ নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর ঠিক করলেন গাড়ি কিনবেন। কারণ খগেনবাবু বলেছেন, দেশের কাজে গাড়ির দরকার আছে। কংগ্রেসের কাজে নামলে ফোটো তোলার লোকের অভাব হবে না। বেনারস থেকে কৃষ্ণমোহন সেন পাম্পিং স্টেশনের জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে দশ হাজার টাকা দেবেন বলেছেন। গোপাল ঘোষের উচিত অন্তত একটা গাড়ি কিনে দেশের কাজে লাগানো।

কথাটা ভালোই মনে ধরেছে গোপাল ঘোষের। জলপাইগুড়ি শহরে এখন রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। ব্যবসা করেন বলে গোপাল ঘোষের পক্ষে সরাসরি কংগ্রেসের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় সমস্যা আছে। কিন্তু গাড়ি তো একটা কিনে সাহায্য করতেই পারেন। বোম্বে থেকে ফেরার পর তিনি শুনেছেন যে বিপ্লবী যতীন দাস লাহোর জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করায় শহরে বিরাট শোকসভা হয়ে গিয়েছে। বড়-মেজ নেতারা প্রায়ই যাওয়া-আসা করছেন শহরে। টাউনের বাইরে গ্রামগঞ্জেও দারুণ উত্তেজনা। এদিকে তাঁর বয়সি চারুচন্দ্র মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য হয়ে গিয়েছেন। সমবয়সি আরও অনেকে চুটিয়ে রাজনীতি করছে। ধরণী মজুমদার, দেবেশ ঘোষের মতো বন্ধুলোকেরা নেমে পড়েছে কংগ্রেসের কাজে। এই উত্তেজনার আঁচ এখনও ভালমতো পোহাতে পারেননি গোপাল ঘোষ।

এসব ভাবতে ভাবতে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে পড়েন গোপাল ঘোষ। বৈঠকখানায় গড়গড়া টানতে টানতে ইয়ারদের কাছে ব্যক্ত করেন তাঁর অভিলাষ। সুগন্ধি তামাকে ঘর ভরিয়ে দিয়ে তিনি ঊরুতে চাপড় মেরে বলেন, 'স্বদেশি কাজের জন্য আমার একটা গাড়ি কেনা উচিত, কী বলো নিশিকান্ত?'

নিশিকান্ত বিষয়ী মানুষ। ইদানীং চা-বাগানে টাকা লাগিয়েছেন। গোপাল ঘোষের কাছ থেকে কাঠের ব্যবসার গলিঘুপচি জানার জন্য প্রায় দিনই আসেন সন্ধ্যার দিকে। গোপাল ঘোষের উত্তেজনা লক্ষ করে তিনি শান্ত স্বরে বললেন, 'তা তো কিনতেই পারেন আপনি। তবে দেশবন্ধুর ব্যাপারটা মনে আছে তো?'

'কোন ব্যাপারটা বলো তো?'

'ওই সেবার জলপাইগুড়িতে এসে গাড়ি চেপে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। উকিলপাড়ার গাছে গাড়িটা ভেঙে গেল। তিনি চিৎপাত হয়ে পড়লেন রাস্তার উপর।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ!' উত্তেজনায় প্রায় দাঁড়িয়ে গেলেন গোপাল ঘোষ। 'কী গাড়ি ছিল সেটা? ঘোড়ার গাড়ি! এই জন্যই তো আমি মোটরগাড়ি কিনব বুঝলে? দেশবন্ধু পড়ে যাওয়ার পর কী হল, সেটাও নিশ্চয় মনে আছে আপনার? জলপাইগুড়ির সব মোটরগাড়ির মালিক নিজেদের গাড়ি ওই বিষ্ণু মিশ্রর বাড়িতে দিয়ে এসেছিল দেশবন্ধুর জন্য।'

নিশিকান্ত চুপ মেরে গেলেন। তাঁর খেয়াল ছিল না যে ভেঙে যাওয়া গাড়িটা ছিল ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

'কিন্তু দেশবন্ধু তো সেবার স্বরাজ্য দল খুলেছিলেন, তা-ই না?' গোপাল ঘোষ আবার জানতে চান। 'কংগ্রেসের সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল নাকি ওঁর?'

'সেটাই তো ব্যাপার।' আবার দিশা খুঁজে পেলেন নিশিকান্ত। 'এটাই তো পলিটিক্সের সমস্যা। এই যে সতীশ দাশগুপ্ত চেয়ারম্যান হলেন পুরসভার। সে বোর্ডে তো আবদুস সাত্তারও আছেন। এই দু'জনের মধ্যে কেমন দা-কুড়ুল রিলেশন, সেটা কি আপনি জানেন? শহরের মুসলিমদের বড় অংশ যে মুসলিম লিগের পক্ষে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে— এটাও তো শুনেছেন আপনি। গাড়ি কিনলে কাকে

উপেনের সমস্যা আরও গভীর। সে ঠিক কংগ্রেসের আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়। তার ইচ্ছে জলপাইগুড়ি থানায় বোমা মারা। নিদেনপক্ষে কোনও সাহেবকে পরলোকে পাঠানো। এ জিনিস মামার বাড়িতে থেকে সে করবে কীভাবে? এমনিতে শহরে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রায় মগডালে বিচরণ করে। শহরকে কেন্দ্র করে গোটা জেলায় ছড়িয়ে যাচ্ছে সে উত্তেজনা।

দেবেন ভেবে দেখুন। একে দিলে সে অসন্তুষ্ট হবে। এ ছাড়া সাহেবদের ব্যাপারটাও ভাবা উচিত আপনার। তাঁদের বিষ-নজরে পড়লে হাতি দিয়ে আপনার এ বাড়ি ভেঙে দিতে কতক্ষণ?

নিশিকান্ত থামলেন। গোপাল ঘোষ নীরবে গড়গড়া টানতে টানতে মনে মনে হতাশ হয়ে পড়লেন আবার। তাঁর মনে হল, ক্যামেরাটাই বোধহয় গাড়ির চেয়ে ভাল ছিল। শেষে রাতে খাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে তাঁর মনে হল সম্পূর্ণ আলাদা একটা কথা। তিনি স্ত্রী তারাসুন্দরীকে বললেন, 'ভাবছি তীর্থে যাব।'

বিচক্ষণ তারাসুন্দরী মুচকি হেসে বললেন, 'এটা কংগ্রেস করার চেয়ে মঙ্গল।'

১১

১৯৩০ সালের পয়লা জানুয়ারি শহর জলপাইগুড়ির দক্ষিণে সাহেবপাড়ায় যখন নববর্ষ পালনের ক্লান্তি ঘুম হয়ে নেমে এসেছে, তখন বেলা এগারোটা নাগাদ কিং সাহেবের ঘাট থেকে নৌকোয় উঠল হিদারু আর উপেন। শীতের তিস্তার অর্ধেক জল আর বাকিটা বালি। জলের ধারা অবশ্য শহর ঘেঁষে বইছে বলে নৌকা ছাড়ছে এপাশ থেকে। তারপর আধ মাইলটাক পুবে এগিয়ে থমকে যাচ্ছে ঘাসে ঢেকে যাওয়া চরার সামনে। ঘাস কোথাও কোমর সমান, কোথাও দেড় মানুষ। ফাঁকে ফাঁকে বেলে হাঁসের যাওয়া-আসা। দূরে একটা চমৎকার সাজানো নৌকো। ওটা কোনও

সাহেবের হবে। নির্ঘাত বন্দুক নিয়ে চরে এসেছেন হাঁস শিকারে। হিদারুর মা কচি বাঁশের কুচি দিয়ে হাসের মাংস রান্নায় ওস্তাদ। ছোটবেলায় হিদারু অনেকবার শীতে তিস্তার চরায় এসে হাঁস শিকার করেছে গুলতি কিংবা তির-ধনুক দিয়ে।

ওরা যাচ্ছে রথেরহাট। বার্নিশ ঘাটে নেমে গড়তলি জল্পেশ হয়ে যাবে ওরা। সিদ্ধান্তটা উপেনের। জলপাইগুড়ি শহর থেকে কংগ্রেসের কাজে খুব বেশি জড়িয়ে পড়া সম্ভব ছিল না হিদারু আর উপেনের। যদিও টুকটাক সভাসমিতিতে যাওয়া-আসা নিয়ে তেমন আপত্তি ছিল না হিদারুর পরিবারের। কিন্তু উপেনের সমস্যা আরও গভীর। সে ঠিক কংগ্রেসের আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়। তার ইচ্ছে জলপাইগুড়ি থানায় বোমা মারা। নিদেনপক্ষে কোনও সাহেবকে পরলোকে পাঠানো। এ জিনিস মামার বাড়িতে থেকে সে করবে কীভাবে? এমনিতে শহরে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রায় মগডালে বিচরণ করে। শহরকে কেন্দ্র করে গোটা জেলায় ছড়িয়ে যাচ্ছে সে উত্তেজনা। স্থানীয় রাজবংশীরা গ্রামগঞ্জে আন্দোলনে নেমেছে। বোদা, পচাগড়, ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা, ফালাকাটা, কুমারগ্রাম, মৌলানি, পাটগ্রাম— যেখানেই যাও, রাজবংশীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে খেপে আছে। উপেনের মনে হয়েছে, সে এইসব এলাকায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলবে। ডুয়ার্সের গভীর অরণ্যের গুপ্ত পথগুলি সম্পর্কে ইংরেজরা প্রায় কিছুই জানে না। লুকিয়ে বিপ্লবী সংগঠন চালানোর পক্ষে এইসব স্থান হল আদর্শ। উপেন মাসকয়েক আগে মামার সঙ্গে এসেছিল রামশাই। সেখানে গিয়েই তারা টের পেয়েছিল ডুয়ার্সের অরণ্য তার কাজের পক্ষে কতটা আদর্শ। কিন্তু এই অরণ্যের মধ্য দিয়ে টুকটাক চলে যাওয়া পায়ে হাঁটা গোপন রাস্তাগুলিকে হাতের তালুর মতো চেনে, এমন একজনকে খুঁজছিল সে।

তখনই হিদারু তাকে বলেছিল তারিণী বসুনিয়ার কথা। জলপাইগুড়িতে তিনি আসেন প্রায়ই। ধনী মানুষ। মেলা ভূসম্পত্তি। এদিককার ভাষায় 'জোতদার'। নিজের বাড়িতেই কংগ্রেসের পার্টি অফিস বানিয়েছেন। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের গোপন আর শর্টকাট রাস্তাগুলো তাঁর মতো খুব কম লোকই চেনে এই ভূখণ্ডে। সপ্তাহ দুয়েক আগে এই তারিণীর সঙ্গে উপেনের আলাপ করিয়ে দেয় হিদারু। উপেনের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেই তাঁকে বেশ মনে ধরে গিয়েছিল তারিণী বসুনিয়ার। তাঁর সঙ্গে ছিল ধূপগুড়ি থেকে আসা বিড়াল রায় আর টুনিয়া রায়। সে দু'জনের সঙ্গে দেশি ভাষায় কিছু কথাবার্তা বলার পর তারিণী বলেছিলেন, 'ঠিক আছে উপেনবাবু, আপনি আমার রথেরহাটের বাড়িতে চলে আসুন। দরকার হলে থেকে যাবেন।'

থেকে যেতে পারাটা সবচাইতে ভাল ছিল উপেনের কাছে। কিন্তু মামাকে এর জন্য সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে হত তাঁকে। ব্যাখ্যাটা সে দিয়েই বেরিয়েছে আজকে। মামাকে বুঝিয়েছে লালমণির হাটে গেলে তাঁর একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে। সেখানে ইংরেজি জানা একটা ভাল ছেলের খোঁজ করছে এক মুসলিম ব্যবসায়ী। মামা রাজি হয়ে গিয়েছেন। আসলে রাজি হবেন জেনেই লালমণিরহাটে যাওয়ার গল্পটা লিখেছিল উপেন। সেখানে যাওয়ার ট্রেন বার্নিশ থেকেই ছাড়ে। উপেন বলেছে, মাসখানেকের মধ্যেই ঘুরে আসবে আর পৌঁছেই চিঠি লিখবে। ফলে আজ সকালে খেয়েদেয়ে, ঘোড়ার গাড়িতে হোল্ড অল তুলে চলে এসেছিল কিং সাহেবের ঘাট। একটা বড়ো পুঁটুলি হাতে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল হিদারু। তিস্তা পেরিয়ে বার্নেশ স্টেশনের সামনে খানিকটা সময় দু'জনে কাটাল উপযুক্ত কাউকে খুঁজে বার করার জন্য, যে একটা খাম লালমণিরহাট থেকে ডাকে দিয়ে দেবে। সে খামের ভেতর থাকা চিঠিটা হল উপেনের পৌঁছনো সংবাদ। মামা উকিল মানুষ। এমনিতে সন্দেহ করেননি। কিন্তু পৌঁছনো সংবাদেরপত্রের খামে লালমণিরহাট ডাকঘরের ছাপ না দেখলে সন্দেহ শুরু করে দেবেন। অবশ্য লোক পেতে খুব একটা সমস্যা হল না। এক হিন্দুস্তানি ব্যবসায়ী কমলালেবু নিয়ে লালমণিরহাট যাচ্ছিল। উপেন তার কাছ থেকে এক ঝুড়ি লেবু কিনে, চার আনা বকশিস দিয়ে চিঠি ডাকে দেওয়ার ব্যাপারটা পাকা করে ফেলল। সে ব্যবসায়ী খামের উপরে লেখা ঠিকানা পড়তে পারবে না। তাই কোথাকার চিঠি কোথায় ফেলছে, সে নিয়েও মাথাব্যথা নেই তাঁর। 'টিসান থেকে বাহার আসলেই না চিট্টি ফেকার বাসকো।' বলেছিল সে। 'বাসকো মে হামি দেশে কত চিট্টি ভেজলম। হামার পড়েশন আছে না জগলুভাই! বোহত আচ্ছা চিট্টি লিখে হাঁ!'

এরা কথা দিলে রাখে। উপেন নিশ্চিন্ত হয়ে হিদারুর সঙ্গে এগিয়ে যায় গন্তব্যে। রথের হাটের সীমানায় যখন আসে, তখন শীতের হ্রস্ব দিনের প্রায় অবসান। হাড়কাঁপানো ঠান্ডার প্রথম ইঙ্গিত বাতাসে থইথই করছে। উপেন পশমের চাদরটা ভালভাবে জড়িয়ে হাঁটার গতি বাড়ায়। শীতটা এদিকে জব্বর পড়ে। উপেন এখনও ধাতস্থ হয়নি। হিদারু অবশ্য একটা মোটা খদ্দরের ফতুয়াতেই বেশ সামাল দিচ্ছে।

উপেন আর হিদারুকে দেখে তারিণী বসুনিয়া বেশ খুশি হলেন। পাঁঠা কাটার হুকুম দিয়ে তিনি দু'জনকে একটা ঘর ছেড়ে দিলেন। অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তারিণীর বাড়ি। ধানের গোলা, গোয়াল, পেল্লায় রান্নাঘর, বিশাল উঠোন আর মাটির দেয়াল এবং ঘড়ের ছাউনি দেওয়া বেশ কয়েকটা ঘর। মশাল, পেট্রোম্যাক্স আর এন্ডির তেলের আলোয় লোকজনের যাওয়া-আসা। দেখলেই মনে হয় যেন সারা বছর উৎসব চলে। রাত আটটা নাগাদ মোটা চালের সুস্বাদু ভাত, পাঁঠার মাংস আর হাঁসের ডিমের ডালনা দিয়ে পেট পুরে খেয়ে উপেন আর হিদারু বসল উঠোনের এক কোণে সুপারি গাছ ফেঁড়ে তৈরি করা বেঞ্চিতে। উলটো দিকে কাঠের চেয়ারে তারিণী বসুনিয়া। সামনে কাঠের আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে হাত সেঁকে নিতে নিতে উপেন শুনল তারিণী বলছে, 'আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বোমা-বন্দুক নিয়ে লড়তে চান, তা-ই তো?'

'অহিংস আন্দোলনে আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু সেটাই একমাত্র রাস্তা নয়।' উপেন জবাব দিল, 'আপনার যারা এখানকার মূল মানুষ, তারা অনেক যুদ্ধ করেছে। ভুটানিদের বিরুদ্ধে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়েছে। আমার মনে হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরতে পারবে।'

'সে তো তারা লড়ছে। ট্যাক্স বন্ধ করার আন্দোলন করেছে, বিলিতি কাপড় পুড়িয়েছে, অসহযোগ করেছে। সাত-আট বছর আগে ফালাকাটায় গুলি খেয়ে মরেওছে। কিন্তু এরা তো সবাই গান্ধিজির আদর্শে লড়ছে। আপনি চাইলে সংগঠন বানাতে পারেন। আমি আড়াল থেকে সাহায্য করব। কিন্তু মনে হয় না সশস্ত্র আন্দোলনের ব্যাপারে এদিকে সাড়া পাবেন।'

'দশজন পেলেই চলবে আমার।' উপেন দৃঢ় স্বরে জানায়। তারপর ব্যক্ত করে তার অভিপ্রায়। তার আন্দোলনে মিছিল-মিটিংয়ের দরকার নেই। দল বেঁধে ইংরেজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকারও নেই। সরকার আর তার লোকদের উপর দু'-তিনজনের ছোট ছোট দল আচমকা হামলা করে পালিয়ে যাবে। ইংরেজ আর তার পুলিশের ক্ষমতা নেই একবার অরণ্যের আড়ালে লুকিয়ে পড়লে তাঁদের খুঁজে বার করে। শুধু যেটা দরকার হবে তা হল, কয়েকটা বন্দুক-পিস্তল আর কিছু উপকরণ— যা দিয়ে বোমা বানাবে সে।

তারিণী বসুনিয়া সস্নেহে উপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, একে বুঝিয়েসুঝিয়ে কংগ্রেসের সংগঠনের কাজে লাগাতে হবে। ডুয়ার্সে এমনিতেই ইংরেজরাই শেষ কথা। সামান্য অজুহাতে বাড়িঘর তো সবই পৌঁছে যাবে তাদের কাছে। হয় তখন জেলে যাবে, নইলে মেরে নুলো করে দেবে জন্মের মতো। অথচ এদের মতো তাজা হয়ে থাকা দরকার সমাজে। গান্ধিজি এটাই চান। তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

গল্প

প্রাপ্তিযোগ

সাগরিকা রায়

মাত্র তিনদিন হল একটা কথা জানতে পেরেছে সৈকত। আর তারপর থেকেই মনের সুখ, শান্তি, রোমাঞ্চ সব পালিয়ে গিয়েছে। মন কেমন করা গা গোলানো ভাব শরীরের কোনে কোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ কাউকে বলার উপায় নেই। বুকের ভার বুকে চেপে দম আটকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। গভীর রাতে ছাদে উঠে নিচের গহীন অন্ধকারের দিকে শরীর ছুঁড়ে দিতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছে। ঝাঁপ দেওয়া খুব কঠিন। বিশেষত যদি মনের ভেতরে মৃত্যু ভয় থাকে।

মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে সৈকত? নতুন ফ্ল্যাটে নতুন খাটে নতুন বিছানার উপর নতুন বউ পিয়ালি শরীর এলিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর সুন্দর শরীর ঘুমের মগ্নতায় ওঠানামা করছে।

সৈকত শ্বাস নেয়। ঘরের ভেতর অদ্ভুত সুবাস। অন্য দুনিয়া যেন। এই বিছানা, আলমারি, আয়না, টিভি, সোফাসেট, নীল কার্পেট, ওদিকে মডিউলার কিচেন। গ্যারাজে চকচকে বাইক এমনকি বিছানার ঘুমন্ত ইয়েলো পাতিওলা ড্রেসের বউটিও ওর। কোনও ভাগিদার নেই। অথচ...।

সৈকত বোঝে ছাদে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দেবার কথা ভেবে লাভ নেই। আকাশের তারা গুনেও লাভ নেই। ঘুমের জন্য তপস্যা করেও লাভ নেই। মাত্র তিনদিন হল বিয়ে হয়েছে। এরই মধ্যে ঘুমের কথা আসবে কেন? কী এমন অন্যায়টা করেছে সৈকত? সব দোষ মানুবাবুর। খবরের কাগজের অ্যাড দেখে সম্বন্ধ এনেছিলেন তিনি। রহস্যময় হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে কাগজটা মেলে ধরেছিলেন— কেমন? মনে ধরে? ফেস টু ফেস দেখলে বুঝবেন এক্কেবারে হেমা মালিনী। এর আগেও ছ'জন হেমা মালিনীর দেখা পেয়েছে সৈকত। কিন্তু যতক্ষণ না মনটা ক্লিক করছে ততক্ষণ এগোচ্ছে না কিছু। সাত নম্বর হেমা মালিনীর জন্য গড়িয়া স্টেশন থেকে হেঁটে নিউ গড়িয়ায় গিয়েছিল সৈকত। মানুবাবুর সঙ্গে। সাত নম্বর হেমা নাকি ওঁর খুব পরিচিত— ডাঁসা পেয়ারা বুঝলেন? রাজভোগ! বলতে বলতে ঢোক গিলেছিল বলে আন্দাজ করছে সৈকত। আটান্ন বছরের ছেলেপুলের বাপের যদি এই দশা হয় তবে সেই পাত্রীর দিকে হাত বাড়ানো সংগত হবে কিনা বোঝা উচিত ছিল সৈকতের। ইদানীং কাগজে পাত্র-পাত্রীর অ্যাড দেওয়া হচ্ছে ছবি দিয়ে। সাত নম্বর হেমাকে দেখতে বেশ। মিষ্টি ঘরোয়া চেহারা। ছবি দেখেই কাত সৈকত। ফেস টু ফেস দেখে মনটা জমজম করে উঠল। এই হলুদ বসন্তবউরি ওর ঘরে যাবে? ক্লিক! ক্লিক! ইমেজ সেন্সরে হেমা যুধিষ্ঠিরের মতো স্থির হয়ে গেল।

খবর কাগজের সাব এডিটর সৈকতের অফিসে নিয়মিত হাজিরা দেন মানুবাবু। উনি সৈকতের পুরনো পাড়ার লোক। ছেলেকে একটা চাকরি পাইয়ে দিতে অনুরোধের আসর বসিয়ে দেন। কখনও নিজের বাগানের বাতাবি লেবু নিয়ে আসেন। অসুবিধা হল, মানুবাবুর ছেলেটা লেখাপড়া বেশিদূর করেনি। মাধ্যমিকের পর ফুটবলে পা পাকিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। ওতে নাকি চাকরি মেলে। এখনও গোলটা দিতে পারেনি। ইস্ট-মোহনের খেলার দিন লাল-হলুদ গেঞ্জি পরে টিভির সামনে বসে খেলা দেখে। শেষ পর্যন্ত মানুবাবু মোক্ষম চাল চালেন। সৈকতের সম্বন্ধ আনতে শুরু করেছেন। এই বিষয়টাতেই যত দুর্বলতা সৈকতের। সাত নম্বর হেমা মানে পিয়ালিকে দেখে এসে ঘুম হারিয়ে গেল সৈকতের।

সে সব দিন গিয়েছে। যদিও মানুবাবুকে দোষ দেওয়া যায় না। সেদিনও হলুদ শাড়ি পরেছিল পিয়ালি। মাথা নিচু করে শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াচ্ছিল। হলুদ শাড়ির আভায় পানপাতা মুখে মা দুর্গার ছায়া। কে বলেছিল ইয়োলো ইজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট কালার অফ দ্য কালার স্পেকট্রাম! কে জানত গভীর রাতে একা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বারান্দায়!

বড় করে শ্বাস ফেলে সৈকত। বয়স একটু গড়িয়ে গেলেও বিয়ের বয়স পালায়নি ওর। পিয়ালি তেইশ বছরের টগবগে বসন্তবউরি। সব জেনেশুনেই তো এসেছিল ওর কাছে। একা পাত্র, বাপ-মা নেই, তার নতুন ফ্ল্যাট, ব্যাঙ্কের বইও মোটামুটি মোটার দিকেই। দমদমে খানিকটা জায়গা জমিও আছে। দেখেশুনে পিয়ালির বাবা ভারি খুশি। তাড়াহুড়ো করেই বিয়েটা হয়ে গেল। শ্বশুর কি আসলে ভয় পাচ্ছিলেন মেয়েকে? তার ভয়ের ভার শেষ পর্যন্ত সৈকতের কাঁধে চাপিয়ে দিলেন? সৈকত কি মানুবাবুকে ফোন করে ঠেসে কথা শুনিয়ে দেবে? এভাবে কেউ কারও সর্বনাশ করে?

একটু শুতে পারলে হত। কিন্তু এই ফ্ল্যাটে একটাই খাট, একটাই বিছানা। এই বিছানা ওর নয়। কথাটা ভেবেই চমকে উঠল সৈকত। ওর নয় মানে? অন্যের?

মাত্র তিনদিন হল সে কথাটাই জানতে পেরেছে সৈকত। বাসরে সবে সোহাগ দেখাতে গিয়েছে সৈকত। ভ্রু কাঁপিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে পিয়ালি, 'সরি, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। প্রথম কথা হল, আমাকে টাচ করবেন না।'

এই ডায়লগটাও কোনও এক বিখ্যাত বাংলা সিনেমার ডায়ালগ বলেই জানত সৈকত। সেটা কখনও যে ওর উদ্দেশ্যে ইউজ হবে ভাবতেই পারেনি। লাইনার আর শ্যাডো মাখামাখি চোখ দু'টো এভাবে তাকাতে পারে তাও ভাবতে পারেনি। পিয়ালির দৃষ্টি দেখে মনে হল সৈকত একটা লম্পট ছাড়া আর কিছু নয়। তবুও খড়কুটো ধরে ভেসে থাকার চেষ্টা করেছে সৈকত, 'তাহলে? বিয়ে করলে কেন?'

—বাধ্য হয়ে। সুমনকে বাবা পছন্দ করে না। আমরা ব্রাহ্মণ, ওরা কায়স্থ। এসব এখন কেউ মানে? তাছাড়া চাকরি পায়নি এখনও। পুরুষ মানুষ, নিশ্চয়ই বসে থাকবে না।

সৈকত ভেবলুর মতো বসে বসে পিয়ালির নিদারুণ দুঃখের কথা শুনছিল। কিন্তু ওর কী করার আছে বুঝতে পারছিল না। তবু মানুবাবুর কথা মনে হল। মানুবাবুকে এসব কথা আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল পিয়ালির।

—বলেছিলাম। উনি বললেন, এ বিয়ে না হলে ওর ছেলের সর্বনাশ হয়ে যাবে। পিয়ালি বড় করে শ্বাস ফেলে— আমি সুমন ছাড়া আর কারও হতে পারব না।

সৈকত মাথা নিচু করে বসে থাকে। পিসিমা শিখিয়েছিলেন, পরের দ্রব্য না বলিয়া নেওয়া পাপ। সৈকত সে অন্যায় করতে পারবে না। তাছাড়া দ্রব্য এখানে জড় পদার্থ তো নয়। রীতিমতো বিষধর! পাগল ছাড়া একে টাচ করতে যাবে কে?

ঘুটঘুটে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলে সৈকত। বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। নিয়মিত ব্যায়াম করে বলে শরীর টানটান। হালকা সিক্স প্যাকও আছে। কিন্তু কারও উপর জোর খাটাতে ও পারবে না। বরং পিয়ালিকে বললেই হয়— ম্যাডাম এবার বাবার কাছে ফিরে যান। তবে... মনটা খরখরে করে, চিনচিন করে।

২

সুমন শিখিয়েছে— রেগে গেলে ব্যালান্স হারিয়ে ফেল না। কিন্তু যার উপর রাগ হওয়ার ছিল, তার উপর নয়, রাগ হচ্ছে সুমনের উপর। বলেছিল—মেজাজটা তেড়িয়া রেখ। রাগটা উপর উপর দেখাবে। আমি ব্যবস্থা করছি। বলে ফিচেল হেসেছিল—লোকটাকে দেখেছি। এক ধমকে বেডরুমের বাইরে পাঠিয়ে দেবে।

যত বড় বড় কথা। নিজের পাত্তা নেই, অথচ পিয়ালিকে প্রবলেমে ফেলে দিয়েছে। যে ছেলে প্রেমিকাকে অন্যের হাতে তুলে দেয়, তার প্রেমিক-মন নামক পদার্থ আছে কিনা এটাই ভাবনায় ফেলেছে পিয়ালিকে। আর বর লোকটাই বা কী জাতীয় পুরুষ? বউয়ের প্রেমিক আছে শুনেও চুপ? জোর খাটাবে, দাপট দেখাবে, তবে না? সুমন কত বুদ্ধি দিয়েছিল কিছুর দরকারই হল না।

মনটা ভাল নেই পিয়ালির। আমি কার? কে আমার? যা চেয়েছিল তা পাওয়া হল না। যা পাওয়া গিয়েছে তা ও চায়নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে জরিপ করে পিয়ালি। খারাপ তো নয়ই বোধহয় একটু বেশিই ভাল ওকে দেখতে। সব থেকেও আজও ও বড় মনমরা। পিঙ্ক শাড়িতে জিওমেট্রিক স্ট্রাইপ, হল্টারনেক ব্লাউজ, কোমর ছাপানো চুল, চকচকে ত্বক এমন সুন্দরী একা ঘরে দাঁড়িয়ে থাকে নতুন বিয়ের পর? সুমনকে ও বোধহয় ঠিকঠাক বুঝতে পারেনি। মাসখানেক আগে সাদা অল্টোতে চাপিয়ে শপিং মলে নিয়ে গিয়েছিল পিয়ালিকে। দেখেশুনে পিয়ালি যথার্থ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। একটা বাইক পর্যন্ত নেই যার সে কি না অল্টো...। এদিকে চাকরির নামে পাত্তা নেই। বেশি ঘ্যান ঘ্যান করে দাঁত খিঁচুনি খেয়েছিল পিয়ালি। সেদিন সুমন সরাসরি বলেছে, 'চাকরি জোটাতে হলে টাকা চাই, কে দেবে?'

—কত টাকা? পিয়ালি জানতে চায়।

—তুমি পারবে না সে টাকার হিল্লে করতে। পিয়ালির চোখে জল এসেছিল— তাহলে বিয়েটা করে ফেলি?

তখনই বুদ্ধিটা এল। পাত্রটা খারাপ নয়, হাতে পয়সা আছে। তা থেকে কিছুটা হাতিয়ে নিতে হবে। না হলে ফোর নাইন্টি এইট তো আছেই। তো, পিয়ালি পারবে এই ঝামেলা সামলাতে? পারবে পিয়ালি। প্রেমের পথে কাঁটা কি এই প্রথম? কিন্তু চারদিন পার হব হব করছে, টাকা পয়সা নিয়ে কোনও কথাই তো হল না। বরটা বারান্দায় বসে আছে। এ কী রে বাবা! জীবনে একটা পুরুষও কি পাবে না পিয়ালি?

৩

সিকিম বেড়াতে গিয়ে একটা ধ্বস নেমে যাওয়া খাঁ খাঁ পাহাড়ের অংশ দেখেছিল সৈকত গতবছর। সেই হাহাকার টের পায় হৃদস্পন্দনে। কী ভীষণ শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে এই কয়েকদিনেই। অফিসে কথাবার্তা কাজকর্ম কোনও কিছুই অবসাদ থেকে বের করতে পারছে না। প্রুফরিডার সমীর এসে মুখোমুখি বসল, 'কী হয়েছে, বনছে না? বউ কি হেব্বি সেক্সি? না কি শীতলপাটি?

লজ্জা পেল সৈকত। সমীর ওর ভাল বন্ধু। ঠান্ডা মাথার ছেলে। কিন্তু একটা সমস্যা আছে। যে কোনও গোলমাল, তর্কাতর্কি, ঝগড়া বিবাদ ঠান্ডা করতে এগিয়ে যায়, সুন্দর করে বোঝায়। কিন্তু কাজ না হলেই সর্বনাশ। তখন মাথা এত গরম হয়ে যায় যে বাদি-বিবাদি দুই পক্ষকেই তুমুল পিট্টি দেয়। রক্তারক্তি কাণ্ডও ঘটিয়ে দিতে পারে। পুলিশ কেসও হয়ে যায়। শেষে হয়ত দেখা যায়, যারা ঝামেলা করছিল তারা দাঁড়িয়ে দেখছে সমীরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। সৈকত এসব কারণে একটু সমঝে চলে সমীরকে। তাছাড়া যা ঘটেছে সেইসব একান্ত ব্যক্তিগত কথা কি বলা যায়? কিন্তু বলতেই হল। সমীর এমন চাপাচাপি শুরু করল যে আর একটু হলেই লোক জমে যেত। সৈকত চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। মনে মনে গুছিয়ে নেয় কথা। 'গত রাতে চোর এসেছিল ওর ফ্ল্যাটে। দু'জন ছিল। সৈকত জেগে উঠে কে? কে? করায় পালিয়েছে। মনে হচ্ছে ওরা হাল ছাড়বে না। পিয়ালিও ভয় পাচ্ছে! তাই...!'

সমীর মহা উত্তেজিত, 'ব্যাস। আমি, স্বরূপ, শুভ, শান্ত লুকিয়ে থাকব। তোরা নিশ্চিন্তে ঘুমোবি। চোরের আজ হবে। কালসর্প জোগ আছে কমিনোকা। শালার শনির সাড়েসাতি চলছে।' জ্যোতিষ চ্যানেলগুলোতে প্রায় সময় হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে সমীর। সৈকত বোকাটে হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখে। ঘরের কথা পরকে বলা নিষেধ। আজ সেলফোনে প্রেমিকের সঙ্গে সংলাপ চলছিল পিয়ালির। দু'চার বাক্য কানে এসেছে সৈকতের। যেমন— 'সেকি? ফোর নাইন্টি এইটে ফাঁসাতে বলছ? না, না, ভদ্রলোক আমার সঙ্গে এক বিন্দু খারাপ ব্যবহার করেননি। আমি পারব না!.. আচ্ছা রাতে এস। মুখোমুখি কথা হবে। ভুলেই গেছ আমাকে। কেবল টাকা, টাকা...। পেছনের বারান্দায় আমি থাকব...।'

কানের কাছে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া— সব জিবাণু নিয়ে মশার পাল ভনভন করে—'রাতে এস... রাতে এস... আমি থাকব... !' নিজের বউ প্রেমিককে ডাকছে। অথচ শাসন করার মুরোদ নেই সৈকতের। কী হবে মাসলম্যান হয়ে? এই সিচুয়েশনে কী করা যায় ভেবে পেল না সৈকত। অ্যাপার্টমেন্টের অপজিটের পানের দোকান থেকে মোবাইলের ক্যাশকার্ড নিল ও। লোকটা হাসল, 'দাদা, রোজ ক্যাশকার্ড নেন, পাওয়ার তো ভরেন না।'

—ভরব।

ফ্ল্যাটের সিঁড়ির ধাপ ভাঙতে ভাঙতে পানওলার হাসি ভাসছিল চোখের সামনে, 'পাওয়ার ভরুন দাদা।' লোকটা জানে সৈকতের পাওয়ার নেই। কী করে পাওয়ার ভরবে সৈকত? সেদিন সৈকতের হাত দেখে সমীর বলেছিল, 'এমাসেই তোমার একটা প্রাপ্তিযোগ আছে।' প্রাপ্তিযোগ! শব্দটার মানে কী? ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। বেডরুমের দরজা বন্ধ। পিয়ালি কি খেয়েছে? কখন আসবে ওর প্রেমিক? ডাইনিং টেবিলের উপর হটপটে খাবার রেখে গিয়েছে রান্নার মাসি। খিদে নেই। সোফায় শুয়ে পড়ল সৈকত।

বেডরুমের দরজা খুলে পিয়ালি বের হল। চোখ বুজে থেকে সৈকত টের পায় শাড়ির খসখস ওর পাশ কাটিয়ে দরজা খুলে বাইরে বের হল। পেছনের বারান্দায় প্রেম অপেক্ষমান। এসময় সারা আকাশ জুড়ে নাকি রজনীগন্ধা ফুটে ওঠে? শরীর জ্বলে যায়। মন পুড়ে যাওয়ার পোড়া গন্ধ বের হয়।

পেছনের বারান্দায় পিয়ালির মুখোমুখি সুমন—

—টাকার ব্যবস্থা করতে পারছ না? নাকি মায়া জন্মাচ্ছে বরের উপর? একটা কেস ঠুকে দিলেই টাকা। রাজি হচ্ছ না কেন বলত?' ধমক ছিল কথায়।

পিয়ালি তেড়ে উঠল, 'অন্যের টাকাতে বউ পুষবে বলে প্রেম করেছিলে?'

—পালটি খাচ্ছ কেন? কথা তো সেরকমই ছিল। লোকটার প্রেমে পড়ে গেলে না তো? সুমন হাসে। সে হাসিতে কী ছিল,

সৈকতের বুকে আগুন জ্বলে উঠল। পিয়ালি কি এজমালি সম্পত্তি? মনে হল এক চড়ে প্রেমের দফারফা করে ফেলে। এগিয়েই যাচ্ছিল। থেমে গেল। পিয়ালি হাসছে।

এরপর ৫৯ পৃষ্ঠায়

ডুয়ার্স পাম রিসর্ট

এক দিকে হাতের নাগালে গরুমারা ন্যাশনাল পার্কের গেট, অন্য দিকে খানিক এগলেই মূর্তি পেরিয়ে চাপড়ামারি অভয়ারণ্য। চালসা-ময়নাগুড়ি হাইওয়ের উপরেই এক ফালি চা বাগানের মধ্যিখানে এই রিসর্টে পৌঁছনো বোধহয় সবচাইতে সোজা। শিলিগুড়ি, মালবাজার, আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহার যে কোনও প্রান্ত থেকেই পৌঁছতে সময় লাগে দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টা। কেবল পুজো বা বড়দিন কিংবা দোলের ছুটিতেই নয়, যে কোনও উইকএন্ডে পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে থাকলে ডুয়ার্স পাম রিসর্ট হতে পারে আপনার পছন্দের ঠিকানা।

DOOARS
PALM RESORT
LODGING | FOODING | PACKAGE TOUR

• Comfortable Rooms (AC/Non-AC) • Running Hot & Cold Water
• Multi Cuisine AC Restaurant • Conference Hall

Centrally located between Gorumara NP & Chapramari WLS

East Batabari, Chalsa, Dist. Jalpaiguri
Phone: 9775065000, 9775265000, 9775365000
Mail: dooarspalmresort@gmail.com

ছিল যে পরানের অন্ধকারে

শাঁওলি দে

মালবাজার! নামটা শুনেই বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। খুব চেষ্টা করেই মুখের হঠাৎ বদলে যাওয়া অভিব্যক্তি সবার অলক্ষ্যে রাখল মৈনাক। বাথরুম যাওয়ার অছিলায় চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় বার করতে পারল না ও। নিজেকে ধাতস্থ করতে বেশ কিছু সময় লেগে গেল মৈনাকের। ফিরে এসে দেখে তখনও স্টাফরুম জুড়ে হাসির রেশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। নিজেকে এই পরিবেশে খাপ খাওয়ানো বড্ড কষ্টের বলে মনে হচ্ছিল। অথচ ক্লাস আছে বলে বেরিয়েও যাওয়া যাচ্ছে না। এই ফিফ্‌থ পিরিয়ডে ওদের গ্রুপের প্রায় কারওই ক্লাস থাকে না, শুধু সৃজনী ছাড়া। তাই এই পিরিয়ডটাকেই ওরা আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছিল। মিথ্যে হাসির আবরণ দুই ঠোঁটের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখতে হল অগত্যা। সৃজনী থাকলে ঠিক ধরে ফেলত। অথচ নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়টা ওকেও বলা চলত না, যদিও সৃজিনীর চেয়ে ব্যক্তিগত এই মুহূর্তে আর কেউ আছে বলেও ভেবে পেল না মৈনাক।

প্রায় পাঁচ বছর হল মৈনাক নদিয়ার শান্তিপুরের এই হাই স্কুলটাতে সহশিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছে। সৃজনীর সঙ্গে আলাপও এই স্কুলেই। প্রাণখোলা ছটফটে আপাত সহজ এই মানুষটাকে মন দিতে বেশি সময় লাগেনি সৃজনীর। পরিচয়ের বছরখানেকের মাথায় বিয়েও করে ফেলে ওরা। সমবয়সি ক'জনের একটা গ্রুপও তৈরি হয়ে যায় দেখতে দেখতে। পিকনিক, সিনেমা দেখা, এমনকি পুজোর ছুটিতে বড়সড় টুর— সব কিছুই একসঙ্গে চলতে থাকে। হইহই করে কাটতে থাকে মৈনাকদের জীবন। শুধু কখনও কখনও কোনও এক ক্লান্ত অবসরে মৈনাকের মন ছুটে চলে যায় কয়েকশো কিলোমিটার দূরের এক শান্ত সবুজে ঘেরা ছোট্ট গ্রামে। গলার কাছে কী যেন একটা আটকে থাকে টের পায় ও। শরীর জুড়ে এক অদ্ভুত অস্বস্তি শুরু হয়। সৃজনী ওর শরীরের যত্ন নেয়। মনের হদিশ পায় না।

২

অন্যান্যবারের মতো এবারেও সৃজনী-মৈনাকদের স্কুলের গ্রুপটা পুজোয় কোথায় যাওয়া হবে, তা-ই নিয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিল। এই ক'বছরে উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারতের অনেকটা আর গত বছরে রাজস্থানটাও ঘোরা হয়ে গিয়েছে ওদের। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর যখন 'এবার ডুয়ার্সের দিকটায় যাওয়া হোক'— এতেই বেশি ভোট পড়ল, বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠেছিল মৈনাকের। নিজেরও যে এত বছর ওদিকটায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তা নয়। তবুও মনের ভেতর কোথায় যেন একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন অস্থির করে তুলেছিল মৈনাককে। জোর গলায় বলতেও পারছিল না

সবাইকে যে না ওখানে সে যেতে চায় না, কিছুতেই না। পুজোর ছুটি যত এগচ্ছিল, মৈনাক তত কেমন যেন মুষড়ে পড়ছিল। চোখের কোণে হালকা কালির ছায়া ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল। সৃজনী বারবার জিজ্ঞেস করছিল, 'কী গো, শরীর-টরির খারাপ নাকি? যাওয়ার আগে একবার চেক-আপ করিয়ে নাও না!' ওর এত উৎসাহ দেখে কিছুই বলতে পারল না মৈনাক। শুধু এক অনির্দিষ্টের অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগল। বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাস বুকেই আটকে থাকল। ঝড়ের খবর কেউই পেল না। সৃজনীসহ অন্যান্য কলিগ ও তাদের স্ত্রীরা বারবার এর বাড়ি-ওর বাড়ি করে নানা প্ল্যানিং করতে লাগল অন্য বছরগুলোর মতোই। প্রতিবারের মতো এবারও মৈনাকের উপর দায়িত্ব ছিল ম্যাপ দেখে সম্ভাব্য দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখে নোট করা। মৈনাক তা-ই করছিল; ম্যাপ দেখে জায়গা বার করছিল, আর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল টুকরো টুকরো ফেলে আসা স্মৃতি। কেউই জানল না, ডুয়ার্স ঘোরার জন্য মৈনাকের অন্তত ম্যাপের সাহায্য নিতে হবে না। ডুয়ার্স যে ওর হাতের রেখার চেয়েও চেনা। ডুয়ার্স যে ওর জন্মস্থান।

ওর মুখ, এমনকি ওর চলন-বলন, সাজগোজ সবটাই। আজ প্রায় কুড়ি বছর পর মৈনাক আবিষ্কার করে, যাকে ভোলার জন্য এই পালিয়ে বেড়ানো, তাকেই এতদিন সযত্নে বুকে লালন করেছে সে। নতুন করে নিজেকে খুঁজতে শুরু করে মৈনাক, এত বছর পরেই। দু'চোখের কোল বেয়ে জলের রেখা গড়িয়ে পড়ে পাম্প বালিশটার উপর। ট্রেন দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে তার গন্তব্যে। লক্ষ্যে অবিচল। মুহূর্তে কর্তব্য ঠিক করে ফেলে মৈনাক। উপর বাঙ্ক থেকে নেমে আড্ডায় ঢুকে পড়ে। বন্ধুরা খুশি হয়। ভাল লাগে সৃজনীরও। ও ঠিক বুঝতে পারছিল কোথায় যেন তাল কেটে গিয়েছে। মৈনাক জানে, ও না বললে কিছুতেই জানতে চাইবে না অভিমানী সৃজনী। ইশারায় কাছে ডেকে নেয় স্ত্রীকে। অনেকদিন পর মন খুলে সব কথা বলতে ইচ্ছে করে। উঠে গিয়ে দরজার কাছটাতে দাঁড়ায় ওরা। ট্রেনের আওয়াজ, লোকজনের কথার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে মৈনাকের কথা। সৃজনী অপেক্ষা করে। বুঝতে পারে, হয়ত মৈনাকের কোনও গোপন অতীত দাঁড়িয়ে আছে দরজার মুখে। সৃজনী জানে, ও ঠিক পারবে ওর ভালবাসা দিয়ে মৈনাকের অপূর্ণতা ভরিয়ে দিতে।

৩

সপ্তমীর সকালটা বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই কাটল সবার। কাল যাওয়া, গোছগাছ প্রায় শেষের দিকে, এখন শুধু পরীক্ষার আগের লাস্ট মিনিট সাজেশনের মতো সবকিছু ঝালিয়ে নেওয়া, ব্যাস। সবাই উত্তেজিত। ব্যতিক্রম মৈনাক। সে যেন থেকেও নেই। অথবা খুব বেশিই আছে! নিজের মনকেই অচেনা বলে মনে হয় মৈনাকের। সবার আনন্দে কিছুতেই সে শামিল হতে পারে না। কিছুতেই না। পরদিন সকাল হতে না হতেই গাড়ি চলে আসে। সদলবলে রওনা দেয় ওরা। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে এনজেপি... তারপর গাড়ি করে সোজা ডুয়ার্স। থাকা হবে লাটাগুড়ির এক রিসর্টে। সেখানে থেকেই সব জায়গায় যাওয়া।

ট্রেনে উঠেই উপর বাঙ্কের একটা সিট দখল করে মৈনাক। মাথা ধরার অজুহাতে নিজেকে মুহূর্তে আলাদা করে ফেলে ও। চোখ বুজে প্রার্থনা করে, যেন কোনও কিছুই আর মনে না পড়ে। অথচ চোখ বুজতেই সামনে ভেসে আসে মূর্তি নদীর তীর, সবুজ গাছপালায় ঘেরা ছোট্ট গ্রাম ডামডিম, পাখির ডাক, ফাঁক পেলেই জঙ্গল সাফারি আর সেই মহিলাটা, যাকে অনেক বয়স অবধি 'মাসি' বলে ডাকত মৈনাক। হঠাৎই ভীষণ অবাক হয়ে গেল ও। যাকে ভুলতে সব বন্ধন ছেড়ে এত দূর চলে যাওয়া আর তারপর একবারও পেছনে না তাকানো, তাকে তো এতটুকু ভোলা হয়নি। দিব্যি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে

৪

ট্রেন থেকে নেমে জলখাবার সারতে সারতেই গাড়ি হাজির। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই লাটাগুড়ি। এখানে সেন্টার করেই ঘোরাফেরা। সবাই উত্তেজিত। রিসর্টে ঢুকে যে যার ঘর পেতেই ফ্রেশ হবার পালা। আজ আর কোথাও বার হওয়া নয়। রেস্ট আর আড্ডা। কাল থেকে শুরু হবে দৌড়ঝাঁপ। সবাই ক্লান্ত, তবু খুব খুশি। শুধু মৈনাকদের ঘরে শীতল নিস্তব্ধতা। সৃজনী স্নান সেরে নেয় চটপট। মৈনাক একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে যাচ্ছে। সৃজনী পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরে মৈনাককে। জলে ভরে আছে দু'জনের চোখ। সৃজনী বলে, 'রেডি হয়ে নাও। চলো আজই বেরিয়ে পড়ি। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে মৈনাক। সে যে তোমার মা।' মৈনাক অবাক হয়। সৃজনী আরও বলতে থাকে, 'দোষ যদি কারও থাকেই, তবে তা সময়ের দোষ, আর কারও না। এটা ভুলো না, তিনিই তোমায় পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন। শুধু নিজের কথা ভাবলে কখনওই তিনি তোমার জন্ম দিতেন না।' মৈনাকের মনের থেকে একটা বোঝা নেমে যায় যেন। সৃজনীর কথা মনে গেঁথে যায় ওর— 'কতটা বড় মনের মানুষ হলে একজন মা তার নিজের সন্তানকে দিদির হাতে নির্দ্বিধায় তুলে দিয়ে হারিয়ে যায়!' এই প্রথম ডুকরে কেঁদে ওঠে মৈনাক। সৃজনী রিসেপশনে ফোন করে একটা রিজার্ভ গাড়ির জন্য।

অঙ্কন : সুবল সরকার

প্রাপ্তিযোগ

৫৬ পৃষ্ঠার পর

—ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে চলেছেন। বাবার সঙ্গেও কথা বলবেন।

সৈকত অবাক হয়, বানিয়ে কথা বলতে জানে তো মেয়েটা বেশ!

এদিকে সুমন আশ্চর্য, 'তাই? তাহলে ওকে বল আমি সেকেন্ডহ্যান্ড মাল নিতে ডবল দাম নেব। তোমার উপর যেরকম দরদ দেখছি। হারগিজ আমার কথা মেনে নেবে। একটা মোবাইলের দোকান খুলব। লাখ তিনেক দিতে বল।'

সৈকত নিঃশব্দে ফিরে আসে ঘরে। কোথায় একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। জীবনে সবই আছে অথচ হাহাকার রাস্তা ছাড়ে না। কে পিয়ালি? কী সম্পর্ক ছিল এই নারীর সঙ্গে সৈকতের? ও কি জন্ম জন্ম ধরে অনুসরণ করে যাচ্ছে সৈকতকে? আর হাহাকারে ভরিয়ে দিচ্ছে? ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে মায়ের বুকের ভেতর ঢুকে যায়।

পিয়ালি ডাকছিল, 'এই যে, বুকের উপর থেকে হাত নামিয়ে ঘুমোন। গোঁ গোঁ শব্দ করছেন।'

চোখ খুলে পিয়ালিকে দেখে কথাটা বলে ফেলে সৈকত, 'কত টাকা লাগবে তোমাদের?'

পিয়ালি মন কেমন করা চোখে চেয়ে বলল, 'সুমন আমাকে সেকেন্ডহ্যান্ড মাল বলেছে। যাকে ভালবাসা যায় তাকে কি মাল বলে কেউ? খুব ঠকালাম আপনাকে, তাই বলে টাকা চাইব?'

বাইরে থেকে সুমন ডাকছিল। পিয়ালি বেরিয়ে গেল। ও হাসছিল, 'তোমার চেয়ে বর লোকটাই ভাল। এখনও তাড়িয়ে দেননি। তুমি নিজের ভালবাসাকে অন্যের হাতে তুলে দাও টাকার লোভে। যাও। আর এস না। মনে রেখ আমি এখন অন্যের বউ।'

মশার পাল ফের ভনভন শুরু করল, 'যাও। আর এস না। যাও... এস না... আমি অন্যের বউ, অন্যের বউ... বউ... বউ...! বাপরে! এত মশা এল কোত্থেকে? পাগল করে দেবে যে। চোখ বুজে শুয়ে থাকে সৈকত। শাড়ির খসখস দরজা বন্ধ করল। মটকা মেরে শুয়ে থেকে সৈকত বুঝতে পারে খসখস বেডরুমে যাচ্ছে। বেডরুমের দরজা আজ বন্ধ হল না। বুকটা ধড়াস করে উঠল সৈকতের। ধ্বস নামার জায়গায় ফের নতুন করে বেঁচে উঠছে।

সমীরদের হাতে সুমন ধরা পড়ে যাবে। উঠল সৈকত। দরজা খুলে বের হল বাইরে। চোর বাইরে নেই। চোর এখন ঘরের ভেতরে। সৈকতের হৃদয় চুরি করেছে সে। রজনীগন্ধাও ফুটি? ফুটি? করছিল। প্রাপ্তিযোগ আছে, তারই আভাস চারপাশে।

সুমনকে ফিরিয়ে দিয়েছে পিয়ালি। সমীরদের ফিরিয়ে দিতে চলল সৈকত।

উৎসবের দিনগুলোতে ঝলমলে হয়ে উঠুন

বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড অলংকারে

শরৎ মানে উৎসবের কাল। বঙ্গজীবনে এই উৎসব নিয়ে আসে এক অন্য স্বাদ অন্য গন্ধ। এই সময়েই ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মেয়েরা চায় অপরূপ সাজে সেজে উঠতে। বিশেষ করে পুজোর চারটি দিন সকাল থেকে সন্ধে, পুষ্পাঞ্জলী থেকে ঠাকুর দেখা— প্রতিটি পর্বেই পোশাক যেমন ভিন্ন তার সঙ্গে অলঙ্কারও হবে মানানসই। সেই সাজে গহনাই হল বিশেষ উপকরণ।

গহনা মানে স্বর্ণালঙ্কার। কিন্তু তার দাম তো প্রায় আকাশছোঁয়া। তাই সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না সবার। তা বলে কি মধ্যবিত্ত তনয়া বা বধূরা গহনার সাজে অপরূপা হবে না? উৎসবের দিনে এমন কথা যে কেউই মানতে নারাজ। সোনা না

হয়েও সেই অলঙ্কারের স্বাদ পূরণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন বিশ্বজিৎ পোদ্দার। সাধ্যে যাদের সোনা কুলোয় না তাদের কথা ভেবেই তিনি হাজির করেছেন মাইক্রো গোল্ড। সোনা নয়, তবু সেই মায়াতেই জড়িয়ে থাকে ঝুমকো, কানবালা, আয়ন্তী অথবা কঙ্কন। বাদ যায় না ব্রেসলেট, নেকলেস, চেন, লকেট এমনকি মুক্তো বসানো কারুকার্যখচিত অলঙ্কার। অতএব খাটি সোনার গহনায় পরোয়া নেই। মধ্যবিত্ত তনয়া বা বধূরাও এই অলঙ্কারে অপরূপা হয়ে উঠতে পারেন। বিশ্বজিৎ পোদ্দার আবিষ্কৃত স্বর্ণালঙ্কারের বিকল্প মাইক্রো গোল্ড আজ বাংলার মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের স্বর্ণালঙ্কারের স্বাদ পূরণ করতে পেরেছে ষোলো আনাই। খাটি তামার মধ্যে সোনার নকশা অনুকরণ করে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ২৩ ক্যারেট গোল্ড প্লেটেড থেকে রূপ দেওয়া হয়েছে সেই অলঙ্কারের। উত্তর-পূর্ব ভারতে গহনাকে ফর্মুলার ধরাবাধা খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়েছে বিশ্বজিৎ পোদ্দারের মাইক্রো গোল্ড নকশাকাররা। তারপরই কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে কলকাতার পার্ক সার্কাস, বিরাটি, হাওড়া সহ আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে গিয়েছে একাধিক শো-রুম। অবিশ্বাস্য কম দামের এই গহনা ফ্যাশন দুনিয়াতে এনেছে বিপ্লব। আর সেখান থেকেই মিলেছে আইএসও-র স্বীকৃতি। এখানেই থেমে থাকা নয়, বি পোদ্দারের মুকুটে যোগ হয়েছে আরও একটি পালক। সেটা এই প্রথম রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের নমিনেশন। এই সবই মিলেছে মাইক্রো গোল্ডের গুণ ও মান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের নমিনেশন প্রাপ্ত **বি পোদ্দারের মাইক্রো গোল্ড** পুজোয় দিচ্ছে লোভনীয় অফার। পাইকারী মূল্যে খুচরো বিক্রির এই ছাড় শুধুমাত্র শারদ উৎসব উপলক্ষেই। বঙ্গ তনয়াদের জন্য এর থেকে সুখবর আর কী হতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে মাইক্রো গোল্ড ব্যবসায়ীদের জন্যও লোভনীয় অফার ঘোষণা করেছেন বি পোদ্দার। কেনাকাটায় বিশেষ ছাড় যেমন রয়েছে তেমনই সেই কেনাকাটার উপরে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে কুপন। ক্রেতা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিশ্বজিৎ পোদ্দারের অনুরোধ, তারা যেন নিজস্ব কারিগর দ্বারা প্রস্তুত মাইক্রো গোল্ড গহনার স্ট্যাম্প দেখতে ভুলে না যান। কারণ বাজারে বিভিন্ন ডুপ্লিকেট মাইক্রো গোল্ড গহনা বিক্রি হওয়ায় প্রতারিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

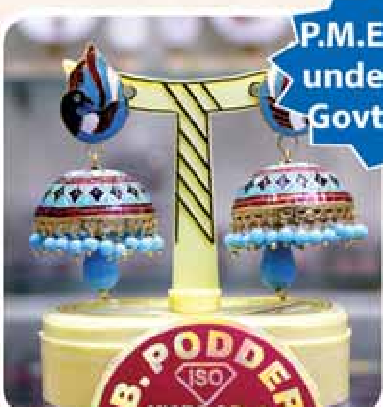

P.M.E.G.P. Unit
under K.V.I.C.,
Govt. of India

B. PODDER MICRO GOLD

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

স্বল্প পুঁজিতে ঘরে বসে ব্যবসায়ে ইচ্ছুকরা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

R. N. Road, Dakshinayan Building 2nd Floor, Cooch Behar, Pin - 736101 (W.B.)
Phone: 03582-228597, 98320 92714, 8967863754

গল্প

লাজমতি

অঞ্জনা ভট্টাচার্য

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ঢল নামে বনজ্যোৎস্নার গায়ে। টিলার উপর দাঁড়িয়ে থাকা চা-বাগানের ছায়াগাছের ঝোড়ো হাওয়ায় মাতাল হয় বনহস্তী। সন্ধে নামতেই কুপি জ্বালা ডেরাগুলিতে উঁকি দিয়ে ওঠে রহস্যের চাঁদ। লড়াইয়ের প্রতিযোগিতায় জেতার আনন্দে লালবস্তির থেকে দিলখুশ হয়েই আজ ফিরল ফাগনা ওরাওঁ। সঙ্গে বুধিয়া, লোটো, রতিশ ও আরও কয়েকজন ইয়ারবকশি। সন্ধে গাঢ় হতেই জমজমাটি আড্ডা চলবে। শালা হারামি লখিয়াটাকে আজ এক হাত দেখে নেওয়া গিয়েছে। হাতে সদ্য জেতা মোরগটাকে ঝুলিয়ে আধা অন্ধকার ঝুপড়িতে ঢুকে ডাক ছাড়ে, ‘লাজমতি, এ লাজমতি। আজ নসিবটা ভাল কাজ করল রে, নে, মালটা ভাল করে বানা। সবাই মিলে খুব মস্তি করা যাবে।’ লাজমতি বুকে লেপটে থাকা ছেলেটাকে আস্তে করে শুইয়ে বেরিয়ে আসে। সারাদিনের ক্লান্ত শরীরটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে চায়। উপায় নেই, না উঠলে এই মুহূর্তের ফুরফুরে মেজাজের ফাগনার লাল চোখ দুটো হিংস্র খাদকের মতো জ্বলে উঠবে। এখনই হাঁড়িয়ার রং চড়তে শুরু করেছে। এই রং যে কত পর্যন্ত চড়বে, লাজমতি কল্পনা করে। এই হাঁড়িয়া, এই নেশাই একদিন ওর সবকিছু কেড়ে নিয়েছিল। চা-বাগানে হাট বসে সপ্তাহান্তে একদিন। এ ছাড়া তলব ডবলি হলে দোকানিরা বাজার বসায়। ক্রেতা বাগানিয়া শ্রমিক আদিবাসী, নেপালি। পাতি তোলার টাকায় চাল, ডাল, আনাজপাতি, কাপড়, গামছা, পাতি তোলার লাঙ্গা (পলিথিনের টুকরো) কিনে হাত ফাঁকা। ধারের টাকায় মদ গিলে বাড়ি ফিরে অনেক সময় আবার দোকানি বাবুর কাছে বাকি খরিদ করে তলব। ডবলি করে দেনা মেটায়। দেরি হলে দোকানি বাবু তাগাদা দেয়। হাঁড়িয়ার মাত্রাটা খুব বেশিই চড়েছিল শুকমীনের। সঙ্গে বুড়ি ধনিয়া। তলবের টাকা মহাজনের হতে তুলে দেবার পরই বউয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দু’জনেই গিয়ে ঢুকেছিল চোলাই মদের ঠেকে। নেশায় জড়িয়ে যাওয়া একজনের পায়ের মধ্যে তখন আর একজনের পা। লালা ঝরা মুখে দু’জনের অসংলগ্ন প্রলাপ। বেসামাল শরীরটাকে কোনওরকমে টেনে ডেরায় ফিরে আসে। বাজার করা সওদাপাতি তখন রাস্তার ধুলোয়। লাজমতি বাইরে বেরিয়ে খালি হাতে দু’জনকে ফিরতে দেখে রাগে গজগজ করে ওঠে। ভেতরের রাগ সাপের ফণার মতো ফুঁসলে উঠে বিষে জর্জরিত করে তোলে ওদের। লাজমতির কথায় যেন শুকমীনের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। যত রাগ গিয়ে পড়ে বুড়ি ধনিয়ার ওপর। নেশার ঘোরে টালমাটাল শুকমীন হঠাৎই হাতের কাছে পাওয়া হাঁসুয়াটা নিয়ে বসিয়ে দেয় ধনিয়ার গলায়। সে রাতেই মারা যায় বুড়ি ধনিয়া। ঘটনার আকস্মিকতায় সংবিৎ হারিয়ে যেন পাথর হয়ে যায় লাজমতি। মতব্বর ফাগনার মধ্যস্থতায় জামিন পায় শুকমীন। এর পর কিছুদিনের মধ্যেই একদিনের জ্বরে মারা যায় শুকমীন। লিভারটা তো আগেই পচেছিল। মদ গিলেই শুয়েছিল দাওয়ায়। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছিল। লাজমতির অভ্যস্ত কান সাড়া দেয়নি। সকালে উঠেই বাপের নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হচ্ছিল, পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে। এক অসীম শূন্যতায় যেন ভাসছে ও। যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যাবে। অথচ আঁকড়ে ধরবার কিছু নেই। ওর চিৎকারেই ছুটে এসেছিল বস্তির লোকজন। ওরাই সব ব্যবস্থা করে।

লাজমতির বড় অসহায় মনে হচ্ছিল নিজেকে। তবুও বাপটা ছিল মাথার উপর। কয়েকদিনের মধ্যেই ম্যানেজারবাবু পাতি তোলার কাজটা দিয়েছিল ওকে। কাজ করতে করতেই লাজমতি বুঝতে পারত, কয়েক জোড়া হায়নার লোলুপ দৃষ্টি ওকে যেন ছিঁড়ে খেতে চাইছে। দিনের আতঙ্ক রাতে ওকে কাঁপিয়ে তুলত। বাগান ফ্যাক্টরিতে কাজ করা ফাগনাই ওকে এই অসহায়তা থেকে বাঁচিয়েছিল। ফাগনাকে ওরও মনে ধরেছিল। উদ্ভিন্নযৌবনা লাজমতির বুকে তখন বহতা ডায়নার মতোই উচ্ছল দুরন্ত ঢেউ। শিরীষের গায়ে জড়ানো বুনো লতার মতো আঁকড়ে ধরেছিল ফাগনাকে। সমাজ মতে ফাগনা বিয়ে করেছিল ওকে। কিছুদিন যেন ওদের জীবনটা স্বপ্নের মধ্যেই কেটেছিল। ফুটন্ত শিমুল ফুলের গনগনে ছোঁয়ায় রক্তিম হয়ে উঠত। কাঁপন ধরা ঠোঁটে ভালবাসার ঢেউ আস্তে আস্তে শিথিল হয়। সোহাগি আলোর রেশ খাঁচা ছেড়ে বাইরে আসতে চায়। কীভাবে বাঁধবে ওকে লাজমতি? হাঁড়িয়ার নেশায় বুদ ফাগনা। হাঁড়িয়া যেন লাজমতির থেকে ওকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে ছেলেটা হল। কত স্বপ্ন লাজমতির চোখে। লেখাপাড়া শেখাবে ছেলেটাকে বাবুদের মতো। ও দেখেছে নাগমণির ছেলেটা কত ভাল স্কুলে পড়ে। ওর মরদটাও ভাল। বাগান অফিসে কাজ করে। নেশাভাং করে না। নাগমণিকে দেখে ভীষণ সুখী মনে হয়। অথচ নাগমণি আর ও একই সঙ্গে পড়াশোনা শুরু করেছিল। নাগমণির মতো ওরও ইচ্ছে ছিল স্কুল ফাইনাল পাশ করবে। কিন্তু বাপ-মা শেখায়নি। ওর নিজের গরজেই আট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে।

তারপর আর হয়নি। বুকের কোথায় যেন একটা ব্যথা উছলে ওঠে। ওর ছেলের জীবন কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না। কিছুতেই না। ফাগনার চিৎকারে ভাবনায় ছেদ পড়ে লাজমতির। উনুনের আঁচে বুক পোড়ে ওর। খড়ি গোঁজা মুখে যেন বড় বেশি খিদে। রান্না করা মাংসের তীব্র সুবাসে গা গুলিয়ে ওঠে ওর। কাঁপা হাতে মাংসের বাসনটা ওদের দিকে এগিয়ে দেয়। রতিশের বাড়ানো হাতের ছোঁয়ায় শিরশিরিয়ে নামে রক্তস্রোত। রাতে হায়েনারা হাসে হি-হি। লাজমতি ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে। ছুটে যায় ঘরের ভিতর। চোখে জ্বলন্ত লাভার স্রোত গলে গলে পড়ে। ভেসে যাওয়া বানের স্রোতে খড়কুটোর মতোই আঁকড়ে ধরে ঘুমন্ত ছেলেকে অসহায়ভাবে।

অঙ্কন: সুবল সরকার

ধারাবাহিক উপন্যাস

বসন্তপথ

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

(**আগে যা ঘটেছে**— তিথি এই প্রজন্মের মেয়ে হয়েও তার বন্ধুদের মতো কেবলমাত্র কেরিয়ার গড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বিভোর নয়। তিথি সুমনকে ভালবাসে। নিজের পরিচিত নিরাপদ পরিবেশ, সমস্ত জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আর্তি তুচ্ছ করে তিথি এগিয়ে এসে হাত ধরে তার ভালবাসার মানুষটির। ডুয়ার্সের এক প্রত্যন্ত গ্রাম পাতাঝোরায় শুরু হয় তাদের যৌথ জীবন। উৎপলেন্দু-মিমি কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি নন সুমনকে। মেনে নিতে রাজি নন তিথির মামা দীপকও। দীপকের স্ত্রী তুলি পারিবারিক চাপে অসহায়। পাতাঝোরা স্কুলের হেডমাস্টার মধুসূদনের সঙ্গে হৃদ্যতা হয় তিথি-সুমনের। পঞ্চায়েতপ্রধান ইয়াসিন সুমনকে তাদের রাজনৈতিক দলে যোগ দেবার প্রস্তাব দিলে বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে সুমন। ভোররাতে সাপের স্বপ্ন দেখে চমকে ওঠে তিথি। দিল্লি থেকে আসা বিমলেন্দু চান পাতাঝোরা গিয়ে সব মিটমাট করে নিতে। রাজি হন না উৎপলেন্দু। তিথির বন্ধুরা প্ল্যান করে পাতাঝোরা গিয়ে তিথিকে চমকে দেবার। সন্ধেবেলা রান্নাঘরে যায় তিথি। উৎপলেন্দু সকালে সুমনের ফোন পান, তিথি আর নেই। তারপর...)

২৫

নার্সিং হোমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে শুয়ে রয়েছেন মিমি। নাকে অক্সিজেন মাস্ক। ড্রিপের বোতল ঝোলানো রয়েছে পাশে। পায়ের বুড়ো আঙুলে তার জড়ানো। চব্বিশ ঘণ্টার হার্ট মনিটরিং পাশের একটি স্ক্রিনে ডিসপ্লে করছে। মিমির মাথার কাছে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়ানো উৎপলেন্দু। মিমির একটু আগে জ্ঞান ফিরেছে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছেন স্বামীর দিকে। উৎপলেন্দু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এ যাত্রা খুব বাঁচা বেঁচে গেলে। খুব সময়মতো তোমাকে নার্সিং হোমে নিয়ে আসা হয়েছিল।'

মিমি ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'তিথি... তিথির কী হয়েছে?'

সুমনের ফোন পাবার পর তিথির কথা ভেবে কোনও অজানা আশঙ্কায় তাঁর নিজেরও বুক টিপটিপ করছে। সেই সংশয়টাকে লুকিয়ে রাখলেন উৎপলেন্দু। অবাক হবার ভান করে বললেন, 'তিথির আবার কী হতে যাবে?'

মিমি বললেন, 'সুমন ফোন করে কী বলল তখন?'

উৎপলেন্দু মিমির মুখের রেখা পড়ার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'কী আর বলবে... ছাড়ো ওসব। শয়তানটার জমানো টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন আর সংসার চালাতে পারছে না। শ্বশুরকে স্কুইজ করে টাকা নিংড়োবে বলে ফোন করেছে। আমি সুমনের কথা এক বিন্দু বিশ্বাস করি না।'

মিমি অস্ফুটে বললেন, 'আমারও তা-ই মনে হয়। তবুও বলছিলাম কী, তুমি একবার পাতাঝোরা থেকে ঘুরেই এসো।'

উৎপলেন্দুর কপালে বাড়তি ভাঁজ পড়ল। চিন্তিত স্বরে বললেন, 'আমিও সেটাই ভাবছিলাম। কিন্তু ডিসিশন নিতে পারছিলাম না। তোমাকে এমন অবস্থায় ফেলে কী করে আমি বাইরে মুভ করব বলো তো।'

মিমি দুর্বল স্বরে বললেন, 'তুমি দীপককে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি ঠিক আছি। আমাকে নিয়ে ভেবো না।'

দীপক আর তুলি ঢুকেছেন আইসিইউ-তে। তুলি মিমির বিস্রস্ত চুল ঠিক করে দিলেন। স্মিতমুখে বললেন, 'উৎপলদা তোমাকে কতটা ভালবাসে, সেটা এবার বুঝলাম। তোমার জন্য টেনশনে মুখ-চোখ কেমন হয়ে গিয়েছে দেখেছ?'

উৎপলেন্দু লঘু গলায় বললেন, 'টেনশন না করে কী করব বলো, আমার যে একটাই বউ।'

হেসে ফেলল সকলে। কিছু জরুরি কথা মনে পড়েছে এমন স্বরে তুলি বললেন, 'উৎপলদা, আপনি দিদিকে নিয়ে নার্সিং হোমে তড়িঘড়ি আসার সময় ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে এসেছিলেন তো?'

উৎপলেন্দু ঘাড় নাড়লেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ করেছি।' তারপর খানিক ভেবে বিব্রত মুখে বললেন, 'ভাল কথা মনে করিয়েছ তো। এই যাহ্, ফ্যান-টিভি তো বন্ধ করে আসিনি।'

তুলি হেসে বললেন, 'উৎপলদার কাণ্ড দেখেছ দিদি? তোমার কিছু হলে উৎপলদার কী হাল হবে বুঝতে পারছ!'

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়েছে। দু'জন নার্স এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। দীপক একবার ঘড়ি দেখলেন। মিমির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডক্টর সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, তোর ইনিশিয়াল ক্রাইসিস কেটে গিয়েছে। আর বিপদের সম্ভাবনা নেই। হয়ত কাল বা পরশু তোকে কেবিনে দিয়ে দেবে। দু'-তিন দিন কেবিনে রেখে তোকে মনিটরিং করবেন ডাক্তাররা। ব্যাস, তারপর ছুটি।'

উৎপলেন্দু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসছি। আজ পাতাঝোরা পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে। আজ আর ফেরা যাবে না। তবে কালকেই ফিরে আসব। তুমি ভেবো না।'

মিমি বললেন, 'সাবধানে যেয়ো।'

আইসিইউ-এর বাইরে বেরিয়ে আসছেন উৎপলেন্দু, তুলি আর দীপক। করিডর দিয়ে হাঁটছেন তিনজন। এক জায়গায় এসে থামলেন উৎপলেন্দু। পকেট থেকে কিছু টাকা বার করে শ্যালকের হাতে দিলেন। বললেন, 'আপাতত এটা রেখে দাও। আর দরকার হলে তুমি কাজ চালিয়ে নিয়ো। আমি ঘুরে এসে...।'

দীপক টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'পাতাঝোরায় এটিএম পাবেন না। টাকাটা এখন আপনার কাছে থাক। ওখানে কখন কী দরকার হয় কে বলতে পারে। আপনি দিদিকে নিয়ে টেনশন করবেন না। এই নার্সিং হোমের ম্যানেজার আমার বন্ধুস্থানীয়। ডাক্তারদের অনেকের সঙ্গেই ভাল চেনাজানা আছে। আমি এদিকটা সামলে নেব।'

তুলি বললেন, 'দিদির যা অবস্থা, তাতে এখন টেনশন অ্যাংজাইটি একদম ঠিক নয়। আমি নিজেও একটু কনফিউজড। সত্যি সত্যিই তিথির কোনও বিপদ হয়নি তো?'

দীপক বললেন, 'নির্ঘাত কোনও ফন্দি আছে সুমনের। তিথিকে কত করে বুঝিয়েছিলাম যে এমন ভুল করিস না। কিন্তু আমাদের মতকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনল না তিথি! দুম করে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিয়ে করে নিল।'

তুলি দীপকের কাঁধ ছুঁয়ে নরম গলায় বললেন, 'ওসব কথা বলে আর লাভ নেই। অহেতুক কষ্ট পাওয়া। ছাড়ো।'

উৎপলেন্দু বললেন, 'প্রতিজ্ঞা করেছিলাম পাতাঝোরা যাব না কোনও দিন। কিন্তু কাল রাতে তিথিকে স্বপ্নে দেখেছি। তারপর থেকেই মনটা কেমন যেন...।'

অনেক পুরনো কথা ফিরে ফিরে আসছে উৎপলেন্দুর মনে। এই নার্সিং হোমেই তো জন্ম

মনে হয় সে দিনের কথা। তিথির কলেজের সেই র‍্যাগিং-কাণ্ডের কথা মনে আছে দীপক? কয়েকজন সিনিয়র প্রথম দিন থেকে ওকে র‍্যাগিং করেছিল। এক গাবলু টাইপ ছেলেকে প্রোপোজ করতে হবে। তিথি চিৎকার করে কলেজ মাথায় করেছিল। আর পড়বেই না ওই কলেজে।

হয়েছিল তিথির। রেশম রেশম চুল, পুতুলের মতো মুখের গড়ন, ছোট ছোট হাতের মুঠো...। মেয়েকে প্রথমবার দেখে যে স্বর্গীয় আনন্দ হয়েছিল, সেই অনুভূতিটাও স্পষ্ট মনে আছে। জন্মের পর হঠাৎ করে একটু শ্বাসকষ্ট হয়েছিল তিথির। তখন ইনকিউবেটর ছিল না এখানে। সে কী টেনশন! ডিসিশন নেওয়া হল চট করে। তিথিকে নিয়ে ছোটা হল শিলিগুড়িতে। দু'দিন শিলিগুড়ির এক নার্সিং হোমে থাকার পর ফাঁড়া কাটল। বাড়ি ফিরল মেয়ে। একটু বড় হয়ে স্কুলে ভরতি হল তিথি। সেই ওয়াটার বটল দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটার ছবিটা চোখ বুজলেই এখনও দেখতে পান উৎপলেন্দু। স্মৃতি টুকরো জড়ো করে কোলাজ বানাচ্ছিলেন উৎপলেন্দু। এর নাম টেলিপ্যাথি। দীপকও সম্ভবত ঠিক একই সময় একই কথা ভাবছিলেন। উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে দীপক বললেন, 'এই নার্সিং হোমেই তো তিথির জন্ম। কী কাণ্ড হয়েছিল... একেবারে যমে মানুষে টানাটানি।'

উৎপলেন্দু বললেন, 'মনে হয় সে দিনের কথা। তিথির কলেজের সেই র‍্যাগিং-কাণ্ডের কথা মনে আছে দীপক? কয়েকজন সিনিয়র প্রথম দিন থেকে ওকে র‍্যাগিং করেছিল। এক গাবলু টাইপ ছেলেকে প্রোপোজ করতে হবে। তিথি চিৎকার করে কলেজ মাথায় করেছিল। আর পড়বেই না ওই কলেজে।'

দীপক হেসে ফেললেন, 'মনে নেই আবার! পরদিন আমরা দু'জনে কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলে, ইউনিয়ন লিডারকে ডেকে ব্যাপারটা ট্যাক্‌ল করেছিলাম...।'

তিনজন নার্সিং হোমের লাউঞ্জে এসে দাঁড়ালেন। নীল, আকাশ, দিয়া, অলিভিয়া পাশাপাশি ফাইবারের চেয়ারে বসে আছে। গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। উৎপলেন্দুদের দেখতে পেয়ে উঠে এল সকলে।

দিয়া বলল, 'কাকিমা কেমন আছে এখন?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'একটা মাইল্ড অ্যাটাক মতো হয়েছিল। সময়মতো এখানে আনাতে এ যাত্রা বেঁচে গেল। ডাক্তার অবশ্য বলছেন, ক্রাইসিস এখনও কাটেনি। বাহাত্তর ঘণ্টা মনিটরিং করে সব ঠিক থাকলে কেবিনে শিফ্‌ট করবে।'

নীল বলল, 'ওসব ডাক্তারদের বাঁধা বুলি। ভেবো না কাকু, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

উৎপলেন্দু হাসলেন, 'তা-ই যেন হয়। তোরা সব ভাল আছিস তো?'

সকলে একসঙ্গে ঘাড় নাড়ল।

উৎপলেন্দু পাশে দাঁড়ানো আকাশের দিকে ফিরেছেন, 'পড়াশোনা কেমন চলছে?'

আকাশ বলল, 'এখন সি ম্যাটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

উৎপলেন্দু কৌতূহলী স্বরে বললেন, 'এর পুরোটা কী রে?'

আকাশ বুঝিয়ে বলল, 'সি ম্যাট হল কমন ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট। অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন-এর নাম শুনেছ? ওরাই এই ন্যাশনাল লেভেলের পরীক্ষাটা পরিচালনা করে।'

উৎপলেন্দু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'পড়াশোনার কত নতুন নতুন লাইন খুলে গিয়েছে এখন। আমরা তো এসবের নাম পর্যন্ত শুনিনি।' একটুক্ষণ চুপ করে স্বগতোক্তি করার মতো করে বললেন, 'তিথিটাও তো পড়াশোনায় কত ভাল ছিল। হায়ার সেকেন্ডারিতে ভাল স্কোর করেছিল। কোথায় এর পর হায়ার স্টাডিজ করবে তা নয়...।'

অলিভিয়া প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল, 'তুমি বাড়ি গিয়ে রেস্ট নাও। বিকেলের দিকে এসো। আমরা পালা করে করে কাকিমাকে দেখব।'

উৎপলেন্দুর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। সুমন সকালে ফোন করে যেটা জানিয়েছে, সেটা কি আকাশদের বলবেন? নাহ্‌, থাক। কথাটার মধ্যে সত্যতা নেই। ছেলেমেয়েগুলোকে শুধু শুধু বিব্রত করার কোনও মানে হয় না।

উৎপলেন্দু বললেন, 'তোরা আছিস বলে আমার সত্যিই চিন্তা নেই। একটা কথা বলি তোদের। আমাকে একটা বিশেষ কারণে জলপাইগুড়ির বাইরে যেতে হবে। খুব সম্ভবত কাল বিকেলে ফিরে আসব। দীপক আর তুলি তো এখানে আছেই, কিন্তু তোরাও যদি পারিস তোদের কাকিমার দিকে একটু নজর রাখিস।'

নীল বলল, 'অব কোর্স রাখব।'

দিয়া ইতস্তত করে বলল, 'কাকিমার শরীর খারাপের কথাটা তিথি শুনেছে?'

উৎপলেন্দু পালটা প্রশ্ন করলেন, 'তোদের সঙ্গে তিথির যোগাযোগ নেই?'

আকাশ বলল, 'পাতাঝোরায় তো মোবাইলের নেটওয়ার্ক নেই, তাই ওর সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া অসুবিধের। তা ছাড়া তিথির শ্বশুরবাড়িতে বেস ফোন নেই। পাতাঝোরা বাজারে একটা এসটিডি বুথ আছে। তিথি সেই বুথে এসে ফোন করেছে কয়েকবার। তখন দু'-একবার কথা হয়েছে।'

উৎপলেন্দু ঘড়ির দিকে একবার তাকালেন। বললেন, 'ঠিক আছে তাহলে। আমি এবার বেরিয়ে পড়ব।'

নার্সিং হোমের লাউঞ্জের ওদিকে ফোনে কথা বলছিলেন দীপক। উৎপলেন্দু একটু গলাটা তুলে ডাকলেন, 'দীপক, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

দীপক কথা শেষ করে দ্রুতপায়ে এলেন উৎপলেন্দুর কাছে। কেজো গলায় বললেন, 'হ্যাঁ উৎপলদা, বলুন।'

উৎপলেন্দু বললেন, 'আমি এখান থেকে আর বাড়ি ফিরব না। রাস্তায় কোথাও খেয়ে নেব। এখন বাস না ধরলে আজ আর পাতাঝোরা যাওয়া হবে না।'

দীপক বললেন, 'এখানে তুলি রইল, তিথির বন্ধুরা রইল। অন্য আত্মীয়রাও তো আছে। তারা দিদির দেখাশোনা করতে পারবে। এইমাত্র ঋভুর সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম। ও একটা বাসে চেপেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলে আসবে। আপনি পাতাঝোরায় গিয়ে কী সিচুয়েশনের মধ্যে পড়বেন কে জানে। আমি আপনার সঙ্গে যাব?'

উৎপলেন্দু দৃঢ় গলায় বললেন, 'তার প্রয়োজন নেই দীপক। আমার শরীরের কোনও সমস্যা নেই। আমার মানসিক শক্তিও খুব কম নয়। তা ছাড়া এখানে তোমার চেনাজানা আছে। তুমি এখানে থেকে এদিকটা একটু দেখো। তাহলে মিমিকে নিয়ে আমার ভাবনা থাকবে না।'

দীপক একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। বললেন, 'ঠিক আছে উৎপলদা। আপনি পাতাঝোরা পৌঁছে ওখানকার পরিস্থিতি জানিয়ে আমাকে ফোন করুন। তিথির সত্যিই কোনও বিপদ ঘটে থাকলে আমাকে ডেকে নিন। পুলিশমহলেও আমার জানাশোনা আছে। দরকার পড়লে পুলিশ নিয়ে পৌঁছে যাব আপনার কাছে।'

২৬

জলপাইগুড়িতে ব্যাটারিচালিত টোটো গাড়ি হয়েছে গাদাগুচ্ছের। অথচ শহরে নির্দিষ্ট কোনও স্ট্যান্ড নেই। ফলে শহরের ব্যস্ত ট্রাফিকের গ্যাঞ্জাম চারগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এরা। তার উপর গোদের উপর বিষফোড়ার মতো আছে বাস, মিনিবাস, ম্যাক্সি-ট্যাক্সির পাশাপাশি ব্যক্তিগত টু-হুইলার ফোর হুইলারের অত্যাচার। আজ আবার কোনও অজ্ঞাত কারণে ঢুকে পড়েছে একটা মালবোঝাই লরি। আটকে পড়েছে অজস্র গাড়ি। ক্রমাগত বেজে চলেছে এত যানবাহনের অধৈর্য হর্ন। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে যেন। এত কিছুর মধ্যে উৎপলেন্দুর রিকশা জ্যাম কাটিয়ে এগচ্ছে শামুকের গতিতে। চোখে চশমা, ছেঁড়া পোশাক, ষাটোর্ধ্ব রিকশাওয়ালা তার দুর্বল শরীরের সমস্ত শক্তি পায়ে নিয়ে এসে প্যাডেলে চাপ দিচ্ছে। কিন্তু চাকা যেন সামনের দিকে এগতেই চাইছে না। বারবার ঘড়ি দেখছেন উৎপলেন্দু। দেরি হয়ে

যাচ্ছে। এর পর পাতাঝোরা যাবার বাস পাওয়া গেলে হয়।

শান্তিপাড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে ডুয়ার্সগামী সব বাস ছাড়ে। বাস স্ট্যান্ডে যখন উৎপলেন্দু পৌঁছলেন, তখন ধীরে ধীরে দুপুরের রং সোনালি হতে শুরু করেছে। বেশ কিছু ছোট-বড় বাস দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যান্ডে। একজন হকার লটারির টিকিট বিক্রি করছিল। রংচটা জিন্স আর খয়েরি জামা। কাচের বোতলের তল যেমন হয়, তেমন হাই পাওয়ারের চশমা, রোগা ডিগডিগে চেহারা। সেই লোকটাকে ডেকে উৎপলেন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'পাতাঝোরা যাওয়ার বাস...।'

উৎপলেন্দুর কথা শেষ হবার আগেই লজ্ঝড়ে একটা বাসের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখাল লোকটা। তারপর 'ভুটান বাম্পার' বলে হাঁক দিতে দিতে চোখের সীমার বাইরে চলে গেল। বাসটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন উৎপলেন্দু। উইন্ডো গ্লাসে পাতাঝোরার নাম লেখা নেই কোথাও। শিড়িঙ্গে চেহারার ড্রাইভার নিজের জায়গায় বসে মৌজ করে সিগারেট খাচ্ছে। উৎপলেন্দু বললেন, 'এই বাস কি পাতাঝোরা যাবে?'

লোকটা একদলা থুতু জানালা দিয়ে বাইরে ফেলল, 'আধ ঘণ্টা বাদে বাস ছাড়বে। কনডাক্টরকে বলে রাখুন। সে জায়গামতো আপনাকে নামিয়ে দেবে।'

বাসে উঠে রুমাল দিয়ে একটা জায়গা রাখলেন উৎপলেন্দু। খিদে পেয়ে গিয়েছে জোর। জানলা দিয়ে দেখলেন একটা দোকানে রুটি-সবজি বিক্রি হচ্ছে। প্রচুর লোকজন ভিড় করে রয়েছে সে দোকানে।

ঘুপচিমতো দোকানঘরের কাঠের বেঞ্চে দুটো রুটি খেয়ে নিলেন উৎপলেন্দু। সবজিটা জঘন্য। মুখে দেওয়া দুষ্কর। তবুও খিদে বড় বালাই। খেয়ে উঠে খাবারের টাকা মিটিয়ে বাইরে বেরলেন তিনি। বাস স্ট্যান্ডে পান-সিগারেটের দোকান রয়েছে। একটা দোকান থেকে একটা জলের বোতল কিনে নিলেন উৎপলেন্দু।

বাস ভরতি হয়ে গেল দেখতে দেখতে। এক সময় চলতে শুরু করল বাস। শহর ছাড়তে ছাড়তেই বসা প্যাসেঞ্জারের থেকে দাঁড়ানো প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা বেশি হয়ে গেল। শহর ছাড়িয়ে তিস্তা ব্রিজের উপরে চলে এল বাসটা। বাইরের দিকে কিশোরের বিস্ময় নিয়ে তাকালেন উৎপলেন্দু। বহু বছর বাদে ডুয়ার্সের দিকে যাচ্ছেন উৎপলেন্দু। ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গিয়েছে। ডুয়ার্সের রাস্তার অবস্থা যে এতটা খারাপ, সেটা জানা ছিল না।

জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রাস্তা মাঝে দীর্ঘ সময় ধরে খারাপ ছিল। পঞ্চাশ মিনিটের পথ দু'ঘণ্টা লাগত যেতে। তবুও সাধারণ মানুষ নির্বিকার। যেন এটাই নিয়তি এভাবে মেনে নিয়েছিল ব্যাপারটা। উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি বড় কোমল। তাই এদিকের মানুষের স্বভাবও বোধ হয় নরম-সরম। শত অভাব অসুবিধাতেও রা কাড়ে না কেউ। মুখ বুজে সব সহ্য করে যায়। এটা দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলা হলে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠত।

বাস এগচ্ছে। উৎপলেন্দুর চোখে পড়ছে, পথের ধারে রাস্তার মোড়ে, ফুটপাথে, বাস বা অটো স্ট্যান্ডে গজিয়ে উঠেছে ছোট-বড় সব মন্দির। উৎপলেন্দুর ফ্ল্যাটের সামনেও আছে এমন একটি দেবতাগৃহ। তিথি-নক্ষত্র মেনে সেখানে পুজোর ব্যবস্থা হয়। সঙ্গে চলে গান- বাজনা আর প্রসাদ বিতরণের জাঁকজমক। উৎপলেন্দুর সহযাত্রীটি ঘেমো শরীর নিয়ে ঝুঁকে পড়ল তাঁর গায়ের উপর। জানলা দিয়ে প্রায় মুখ বার করে কপালে আর বুকে ঠেকাল হাত।

মনে মনে হাসলেন উৎপলেন্দু। এ যেন রোডসাইডে স্ন্যাক্সে পেট ভরানোর মতো পথে চলতে চলতে 'একটু ধর্ম করে নেওয়া'। এই যে ফুটপাথ-মন্দিরের জন্য যে পরিসর ব্যবহার করা হচ্ছে তা মোটেই 'ধর্ম করার' জন্য নয়। কেননা প্রত্যেকটি নির্মাণই বেআইনি। সুপ্রিম কোর্ট এর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু ভারতে ধর্ম এক অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গা। পথচারীর মূত্রত্যাগ রুখতে দেয়ালের গায়ে সাঁটিয়ে দেওয়া হয় দেবদেবীর ছবি। গাড়ি ব্যাক করার সময় বাজে ধর্মীয় গানের সুর, মোবাইলের রিংটোনে উচ্চারিত হয় গায়ত্রী মন্ত্র। গতকাল পর্যন্ত গলিতে পড়ে থাকা যে পাথরে লোকে হোঁচট খেত, সেটিকেই আজ ভগবান বলে গাছের তলায় বসিয়ে, ধূপধুনো দিয়ে পুজো শুরু করে দিলে, লোকে সেই পাথরের সামনে মাথা নোয়াবে। 'দেবতার জন্ম' এভাবেই হয়। আসলে গোড়া থেকেই ধর্মের সঙ্গে সবকিছু এক করে দেখা হয়েছে ভারতে। দর্শন বলতে এ দেশে লোকে এখনও ধর্ম বোঝে। নাম করা বুকস্টোরে ফিলসফি সেকশনে সার দিয়ে থাকে ধর্মের বইপত্র।

চোখ বুজে ঠায় বসে ছিলেন উৎপলেন্দু। একটু ঝিমুনিমতো এল। নার্সিং হোমে প্রথমবার দেখা সদ্য জন্ম নেওয়া তিথি, মন্তেসরি স্কুলের তিথি, স্কুলের ইউনিফর্ম পরা তিথি, শাড়ি পরে কলেজ যাওয়া তিথি— বিভিন্ন বয়সের তিথির স্পষ্ট-অস্পষ্ট মুখ লুকোচুরি খেলতে শুরু করল তাঁর সঙ্গে। তিনি টের পেলেন, অগোচরে কেমন একটা দমচাপা অস্বস্তি বাসা বেঁধেছে তাঁর বুকের গোপন কুঠুরিতে। তিথিকে একবার দেখার জন্য ছটফট করতে শুরু করেছেন তিনি।

উৎপলেন্দুর পাশের সিটের লোকটি উঠে গেল। সেখানে জিন্স আর টপ পরা সুশ্রী দেখতে একটা মেয়ে বসেছে। তিথির বয়সি হবে। সেলফোনে গান শুনছে গাঁক গাঁক করে। বিরক্ত হলেন উৎপলেন্দু। হেডফোন কানে দিয়ে শুনলেই তো পারে, তাহলে অন্যের বিরক্তি উৎপাদন হয় না। তিথি হলে কি এমন করত? অসম্ভব। তেমন শিক্ষা পায়নি তিথি।

অনেক বাড়ির লোকের অভ্যেস থাকে ভলিউম বাড়িয়ে টিভি দেখার। কোন সময় তাঁদের বাড়িতে কী অনুষ্ঠান চলছে, সেটা পাড়া-প্রতিবেশী বিলক্ষণ জানতে পারেন। এঁরা টিভি 'দেখেন' না, 'শোনেন'। দেখা ও শোনার মধ্যে প্রয়োজনীয় সাম্য এঁরা রাখেন না। দেখার চেয়ে শোনার বা শোনানোরই যেন আড়ম্বর বেশি। এই মেয়েটি কি তেমন কোনও বাড়ি থেকেই এসেছে? শিক্ষাদীক্ষা-ভদ্রতা কিছুই কি শেখেনি? মেয়েটিকে জরিপ করলেন উৎপলেন্দু। মুখে কিছু বললেন না। বস্তুত কোনও সহযাত্রীই কিছু বলল না।

অবশেষে সেই বাস তাঁকে নামিয়ে দিল নির্জন একটা জায়গায়। বাস স্ট্যান্ড বলতে কদম গাছের নিচে একটা টিনের শেড। ওদিকে একটা ভাঙাচোরা চায়ের দোকান, একটা একচিলতে সেলুন, একটা পিসিও, তার পাশে একটা গালা মালের দোকান। ব্যাস, আর কিছু নেই সেখানে। দেখেই বোঝা যায় এই বাস স্টপে লোকজন বড় একটা নামা-ওঠা করে না। ব্যথায় টাটানো কোমর টানটান করতে করতে উৎপলেন্দু ভাবলেন, এই জায়গাটাই তবে পাতাঝোরা!

একটাই ভ্যান রিকশা দেখা গেল। বিড়িতে সুখটান দিচ্ছিল বয়স্ক লোকটা। ঢিলঢিলে একটা ফুলপ্যান্ট আর গোলগলা গেঞ্জি পরা লোকটা অপাঙ্গে দেখছিল তাঁকে। উৎপলেন্দু চেপে বসলেন ভ্যানে। বললেন, 'সুমন রায়ের বাড়ি যাব। প্রাইমারি স্কুলের টিচার। চেনো বাড়ি?'

বিড়িটা ফেলে দিয়ে লোকটা বলল, 'উঠে বসুন। দশ টাকা লাগবে।'

ভ্যান রিকশা চলছে। দু'দিকে মনোযোগী চোখে তাকিয়ে আছেন উৎপলেন্দু। চাকরি জীবনের শুরুতে মাসের বেশির ভাগ দিন ফিল্ডে যেতে হত। তখন গ্রামে বহু রাত কাটিয়েছেন। কিন্তু আজকাল সে অভ্যাস আর নেই। আকাশের দিকে তাকালেন উৎপলেন্দু। দূরে একসারি তাল গাছের উপর ঘন কালো মেঘ ঝুঁকে আছে। বেশ একটা হাওয়া দিচ্ছে ফুরফুর করে। উৎপলেন্দু বললেন, 'তোমাদের এদিকে তেমন গরম নেই দেখছি!'

ভ্যানের চালক প্যাডেলে চাপ দিয়ে বলল, 'এই গেরামে আগে কখনও বুঝি আসেননি কত্তা?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'না, এই প্রথম।'

ভ্যানচালক বলল, 'রোদটা পড়ে যাক, আরও ঠান্ডা পড়বে। আপনি তো শহরের লোক, রাত্তিরে একটা পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে শুতে হবে দেখবেন।'

কতদিন বাদে তিনি এলেন কোনও গ্রামে! বহুদিন আগে দেখা একটা ভাল লাগা সিনেমা আবার নতুন করে দেখলে যে অনুভূতি হয়, অনেকটা তেমন লাগছিল উৎপলেন্দুর। সেই সবুজ ঢালা ল্যান্ডস্কেপ। সেই বহু পরিচিত ঝোপঝাড়, গাছপালা, জলাজঙ্গলে ভরা একটি গ্রাম। এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া হাড়পাঁজর বার করা নদীর উপর বাঁশের সাঁকো, ধানখেতের উপর দিয়ে চলে যাওয়া দীর্ঘ আলপথ, পুকুরের উপর ঝুঁকে পড়া তাল-সুপারি-নারকেল গাছের সারি, ছুটকোছাটকা ছাগল ছানা খেলে বেড়াচ্ছে মাঠে, একটি দেশি কুকুর শুয়ে আছে চুপটি করে, মাঠে চরছে পাটকিলে রঙের গোরু।

ভ্যান রিকশা একটা টিনের চাল দেওয়া দু'কামরার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির সামনে বেশ কিছু লোকজনের একটা জটলা চোখে পড়ল তাঁর। কেমন গোঙানিমতো একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে না দূর থেকে? বুকটা কেমন যেন দুলে উঠল উৎপলেন্দুর।

যত গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছেন, তত মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হতে শুরু করেছে উৎপলেন্দুর। কেমন আছে তিথি? তাঁকে দেখে কি অবাক হয়ে যাবে সে? মনটা আবার কু-ডাক ডাকল। আচ্ছা, সত্যি সত্যিই কিছু হয়নি তো মেয়েটার? নিজেই নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন, না না, তা হতে পারে না।

দুলতে দুলতে ভ্যান চলেছে। নানারকম চিন্তা উঁকি দিচ্ছে উৎপলেন্দুর মনের মধ্যে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, তাঁকে আর মিমিকে মান-অভিমান ভুলিয়ে এখানে টেনে আনার জন্যেই এমন একটা অদ্ভুত প্ল্যান করেছে তিথি? তিথি যেমন মেয়ে, তাতে এমন একটা কিছু নেহাত অসম্ভব নয়।

যত সময় গড়ায়, তত বুকের মধ্যে দ্রিম দ্রিম বাড়তে থাকে। ঘড়ির কাঁটা যত এগতে থাকে, তত ভেতরে ভেতরে অধৈর্য হতে থাকেন উৎপলেন্দু। একটার পর একটা ঢেউ যেন এসে লাগছে পাড়ের মাটিতে। বুকের মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ যেন নিজের কানে শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

উৎপলেন্দু বললেন, 'প্রায় আধ ঘণ্টা তো হয়ে গেল। আর কত পথ বাকি?'

ভ্যানচালক আশ্বাস দিল, 'এই তো এসেই পড়েছি প্রায়।'

উৎপলেন্দু তবুও নিশ্চিত হবার জন্যে বলেন, 'তুমি সুমন রায়ের বাড়ি চেনো তো?'

ভ্যানচালক একটু হেসে বলল, 'চিনি কত্তা চিনি। সুমন দাদাবাবুকে এই গেরামে কে না চেনে! যেমন সুন্দরপানা চেহারা, তেমনি মিষ্টি স্বভাব। পেরাইমারি ইশকুলের মাস্টার। বিয়ে করেছে এক বছরও হয়নি।'

উৎপলেন্দু কৌতূহল দেখিয়ে বললেন, 'তুমি দেখেছ সুমনের বউকে?'

ভ্যানচালক মুখ ফিরিয়ে দাঁত বার করে হাসল, 'দেখেছি। বউদিমণিও খুব সুন্দর দেখতে। সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী।'

উৎপলেন্দুর মুখে আলটপকা এসেই গেল কথাটা, 'আমি সেই দিদিমণির বাবা।'

ভ্যানচালক লোকটি মুখ ফিরিয়ে উৎপলেন্দুকে আবার দেখল। এবার অন্য চোখে। খুশি আর বিস্ময় যেন মিলেমিশে গেল তার গলায়। অবাক হয়ে বলল, 'তা-ই নাকি?'

উৎপলেন্দু হাসলেন একটু। অপরিচিত লোকটাকে ভাল লেগে গেল তাঁর।

সূর্য ডুবছে। চাষিরা ফিরে আসছে আলপথ দিয়ে। গলায় ডুংডুং ঘণ্টার শব্দ তুলে গোরু-মোষ ঢুকে যাচ্ছে খোঁয়াড়ে। এদিকে প্রচুর সবুজ গাছপালা। সাধারণ আম-জাম-কাঁঠালের বাইরেও অচেনা অনেক রকম গাছ। সারাদিন উড়ে বেড়াবার পর পাখিরা ফিরে আসছে নিজের নিজের বাসায়। গায়ে কাঁটা দিল উৎপলেন্দুর। যত দিনের আলো কমে আসছে তত গরমটা কমে আসছে।

ভ্যান রিকশা একটা টিনের চাল দেওয়া দু'কামরার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির সামনে বেশ কিছু লোকজনের একটা জটলা চোখে পড়ল তাঁর। কেমন গোঙানিমতো একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে না দূর থেকে? বুকটা কেমন যেন দুলে উঠল উৎপলেন্দুর।

ভ্যানচালক বকর বকর করছিল এতক্ষণ। এবার হঠাৎ চুপ। বাড়িটার সামনে এসে থমকে গেলেন উৎপলেন্দু। বুকের ভেতরটা যেন ছলাৎ করে উঠল তাঁর।

সাদা চাদরে ঢাকা কারও মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়েছে একটা ভ্যানে। বাড়ির উঠোনে তুলসীতলার সামনে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে সেই শব। কান্নার রোল উঠেছে। ইনিয়েবিনিয়ে বিলাপ করছে কয়েকজন মহিলা। উৎপলেন্দু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সেখানে। সারা শরীর সাদা কাপড়ে ঢাকা। তবে মুখটি উন্মুক্ত। তিথি যেন ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট একটি নিষ্পাপ শিশুর মতো।

কেউ একজন তাঁকে দেখেছে। একটা ছোট মোড়া এনে দিল। তার মধ্যে বসে পড়লেন উৎপলেন্দু। শরীর ছেড়ে দিয়েছে তাঁর। ফ্যালফ্যাল করে উৎপলেন্দু তাকিয়ে আছেন মেয়ের মুখের দিকে।

শান্ত মুখ-চোখ তিথির, মৃত্যুযন্ত্রণার লেশমাত্র নেই সে মুখে।

২৭

শোকতাপের বাড়িতে মুরুব্বি গোছের এক-আধজন থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। লোকটা পাতাঝোরার সম্পন্ন চাষি। নাম সমীর বর্মন। গলায় মোটা সোনার চেন, কপালে রসকলি আঁকা। কথাবার্তা, হাঁটাচলার মধ্যে একটা সবজান্তা ভঙ্গি। বিড়িতে টান দিতে দিতে বলছিল, পঞ্চান্ন বছরের জীবনে একশোবার নাকি গিয়েছে শ্মশানে। ভারী গৌরব বা কৃতিত্বের কথা জাহির করছে এমন একটা ভাব।

উৎপলেন্দু লোকটাকে দেখছিলেন আর তাঁর মধ্যে বিবমিষা তৈরি হচ্ছিল। লোকটা উৎপলেন্দুর পাশে এসে বলল, 'আপনিই তো সুমনের শ্বশুরমশাই।'

উৎপলেন্দু ঘাড় নাড়লেন।

সমীর বর্মন গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'বলছিলাম যে সাপে কাটা শব। আপনাদের শহরে কী নিয়ম বলতে পারব না, তবে এই গ্রামের নিয়ম আলাদা। সাপে কাটা বডি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়াই উচিত। গত বর্ষার সময় নরেন ঘোষ মারা গেল কেউটের কামড়ে। কলা গাছ দিয়ে ভেলা বানিয়ে তাকে নদীতেই ভাসানো হয়েছিল।'

আরও দু'-একজন লোক সায় দিয়ে বলল, 'আমাদের গ্রামগঞ্জে সাপে কাটা মড়া তো নদীতেই ভাসিয়ে দেওয়া হয়।'

উৎপলেন্দু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন লোকগুলোর দিকে। এই অজ গ্রামে মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার যে কী তা নিয়ে ভাবার মতো শক্তি নেই তাঁর এখন। ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁর মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

উৎপলেন্দু কিছু বলার আগেই তাঁর পাশ থেকে সুমন শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল, 'না। নদীতে শব ভাসানো হবে না। শ্মশানেই দাহকাজ হবে।'

সুমনের রুদ্রমূর্তি দেখে সমীর বর্মন যেন একটু নিবে গেল। গজর গজর করতে করতে চলে গেল অন্য দিকে। যাবার আগে বলে গেল, 'আমরা আর কী বলব। তোমার বউ যখন, তখন যা ভাল বোঝো করো।'

বাড়ির তুলসীমঞ্চের সামনে শুইয়ে রাখা তিথির মুখে চরণামৃত আর তুলসীপাতা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে জনা চল্লিশেক লোকের দলটা তিথির মৃতদেহ নিয়ে রওনা হল শ্মশানের দিকে। নিশি পাওয়া মানুষের মতো সেই দলের পিছন পিছন চললেন উৎপলেন্দু।

গ্রাম থেকে আধ ঘণ্টা হাঁটাপথের শেষে স্বচ্ছ জলের পাতাঝোরা নদী। তার ধারে জনহীন শ্মশান। একটা কুঁড়েঘরের মতো আস্তানায় ডোমের বাড়ি। লোকজন গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল। মদ খেয়ে চুর হয়ে সে এল টলতে টলতে।

শ্মশানের মধ্যে একটা শেড করা, তার নিচে একটা কালীমূর্তি রয়েছে। পাশে একটা করে রক্তজবা আর স্থলপদ্ম গাছ। বিরাট চত্বরে ঘোড়ানিম, বট, অশ্বত্থ আর যজ্ঞডুমুর যেমন আছে, টগর গাছও রয়েছে কয়েকটা। ফুলগাছে ফুটে আছে একটা-দুটো। কিন্তু সব ফুলই মলিন, অনুজ্জ্বল। বড় গাছগুলোর পাতাগুলোও ম্রিয়মাণ। শ্মশানের ফুলগাছ বলেই কি এমন?

আসার সময় গোলা থেকে কাঠ কিনে নিয়ে আসা হয়েছিল। শ্মশানে সাজানো হল চিতা। শ্মশানের অধিকারী একজন ব্রাহ্মণ থাকলেন সঙ্গে। তাৎক্ষণিক তুলসীমঞ্চ তৈরি করা হল তাঁর তত্ত্বাবধানে। সুমন নিজে হাতে হবিষ্যান্ন রেঁধে

নিবেদন করল সেই তুলসীমঞ্চে।

উৎপলেন্দু দেখছিলেন আর ভাবছিলেন, এটাই বোধহয় মৃতদেহের উদ্দেশ্যে প্রথম পিণ্ডদান। একটু পরে সিঁদুরে লাল হয়ে যাওয়া দগদগে সিঁথি, লাল টুকটুকে আলতা পরা পা। ঘুমন্ত তিথি যখন একটু একটু করে আগুনের রাজ্যে ঢুকে গেল, তখন উৎপলেন্দুর সারা শরীর তোলপাড় করে উঠল। মনে হল, এই মুহূর্ত বুঝি সত্য নয়। যেন কোনও ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখছেন তিনি।

শ্মশান থেকে দাহকার্য সেরে ফেরার সময় উৎপলেন্দুর মনে হল, তাঁর শরীরে আর এক বিন্দু জোর অবশিষ্ট নেই। সুমনের দিকে এক ঝলক তাকালেন তিনি। সুমনের দশাও তাঁর মতোই। সে-ও যেন তার শরীরটাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটা ছোট ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে উৎপলেন্দুকে। গ্রামের বাড়ি। সিলিং নেই, উপরে টিনের চাল। ঘরে আসবাব তেমন কিছু নেই। একটা সাদামাটা খাট, একটা পুরনো আলমারি, একটা ছোট টেবিল। আলমারি খুলল সুমন। একটা সাদা পাজামা-পাঞ্জাবির সেট বার করে উৎপলেন্দুর হাতে দিল। বলল, 'এই পাজামা-পাঞ্জাবিটা ধোয়া। আপনি পোশাকটা পালটে নিন। মুখে-চোখে একটু জল দিয়ে আসুন। একটু ভাল লাগবে।'

উৎপলেন্দু পোশাক পালটে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে এলেন। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন একটুক্ষণ। বললেন, 'এই পাতাঝোরা গ্রামে বেশির ভাগ বাড়িতেই ইলেকট্রিসিটি নেই, তা-ই না?'

সুমন সায় দিয়ে বলল, 'বেশি দিন হয়নি এই গ্রামে আলো এসেছে। দু'-চারটে বাড়িতে শুধু কারেন্ট আছে। আমাদেরও তো বাড়িতে লাইট ছিল না। তিথি এ বাড়িতে আসার পর লাইটের কানেকশন নিয়েছিলাম। গরমে ওর অসুবিধে হবে ভেবে একটা সিলিং ফ্যানও কিনেছিলাম...।'

দেয়ালে তিথির একটা হাসিমুখের ফোটো। বিয়ের পর পর তোলা। উৎপলেন্দুর বুকে আবার একটা দোলা লাগল। কথা ঘোরাবার জন্যে বললেন, 'তোমার স্কুল এখান থেকে কত দূরে?'

সুমন বলল, 'এই তো, কাছেই। সাইকেলে আধ ঘণ্টাখানেক লাগে।'

যোগমায়া একটা প্লেটে রুটি-সবজি নিয়ে এসেছেন। সেটা টেবিলের উপর রাখলেন। বললেন, 'দাদা, এটুকু খাবার কষ্ট করে খেয়ে নিন। তারপর শুয়ে পড়ুন তাড়াতাড়ি। আপনার উপর দিয়ে খুব ধকল গিয়েছে আজ।'

এপাশ-ওপাশ করে একরকম জেগেই সারাটা রাত কাটালেন উৎপলেন্দু। শরীর আর মনের উপর দিয়ে যা ধকল গেছে, তাতে অবশ্য ঘুম হবার কথাও নয়। আসলে গতকাল খবরটা শোনার পর থেকেই তিনি আর নিজের ভেতর ছিলেন না। বাসে এতক্ষণ ধরে ঠায় বসে আসার সময় ছায়া ছায়া একটা বিষণ্ণতা আরও ঘন হয়ে জমাট বেঁধেছিল বুকের ভেতর। হৃদ্‌যন্ত্রের লাব-ডুব বাড়ছিল, যত এগচ্ছিলেন গন্তব্যের দিকে। তিথির নীল হয়ে যাওয়া মৃতদেহ দেখার পর কেমন এলোমেলো হয়ে গেল সব। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি।

উৎপলেন্দুর পিতামহ-পিতামহী চলে গেছেন বার্ধক্যজনিত অসুখে। উৎপলেন্দু তখন ছোট, সব কথা ভাল করে মনেও নেই। তাঁর বাবা-মা-ও চোখ বুজেছেন পরিণত বয়সে। সেই বিয়োগব্যথা তবু সহনীয়। কিন্তু একমাত্র সন্তানের আকস্মিক মৃত্যু যে বিপুল শূন্যতা বয়ে আনল তাঁর ভেতর, সেই আদিগন্ত শূন্যতার সামনে দাঁড়িয়ে কেমন শীত শীত করছিল তাঁর। তিথিকে দাহ করে আসার পরেও সেই বিহ্বল ভাবটা যায়নি। লম্বা একটা নির্ঘুম রাত গিয়ে সকাল এসেছে, এখনও নিজেকে স্থিত করে উঠতে পারেননি উৎপলেন্দু।

সুমন এসে বসেছে তাঁর বিছানার পাশের চেয়ারে। রাতে বোধহয় ঘুমায়নি, তাই এলোমেলো হয়ে আছে এক মাথা চুল। গায়ে একটা চাদর জড়ানো, তার নিচে একটা ফতুয়া আর পাজামা পরে আছে সুমন। গালে দু'দিনের না-কাটা দাড়ি। মুখে জড়িয়ে আছে বিষাদ।

উৎপলেন্দু সুমনকে ভাল করে দেখছিলেন। এই জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত দেখেছেন তিনি। এই পরিণত বয়সে এসে তিনি ভাল করেই জানেন, শোক প্রাথমিকভাবে তার সমস্ত অভিঘাত নিয়ে মানুষকে বিধ্বস্ত করলেও জীবনের নিজস্ব নিয়মে সেখান থেকে একটা সময়ের পর একটু একটু করে বেরিয়ে আসে মানুষ।

নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন উৎপলেন্দু, আচ্ছা, তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এমন হলে কী করতেন তিনি? মিমি যদি সহসা চলে যেত তাঁকে ছেড়ে, এমনকি তিথি জন্মাবারও আগে, তবে কী করতেন যুবক উৎপলেন্দু? মিমির স্মৃতিকে সম্বল করে কি থেকে যেতেন বাকি জীবন? বলা মুশকিল।

উৎপলেন্দু মনে মনে উত্তর হাতড়াবার চেষ্টা করলেন। এর পর কী করবে সুমন, আবার কি বিয়ে করবে? আবার বিয়ে করলে একটা খচখচানি কি তাকে জ্বালাবে না ভেতরে ভেতরে? আর মিমি? মিমি কি এত সহজভাবে মেনে নিতে পারবে সুমনের এই সিদ্ধান্ত? অসম্ভব!

সুমন আড়ষ্টভাবে বলল, 'আপনার রাতে ঘুম হয়েছিল?'

উৎপলেন্দু সে কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললেন, 'ফুল স্পিডে ফ্যান চালিয়ে শুয়েছিলাম। একটু ঠান্ডা লেগে গিয়েছে বোধহয়। গলাটা ব্যথা ব্যথা করছে। কাছাকাছি ওষুধের দোকান আছে?'

সুমন বলল, 'তিথির মুখে শুনেছি আপনি হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের উপর বেশি আস্থা রাখেন। পাতাঝোরা বাজারে মাধবকাকুর হোমিয়োপ্যাথির দোকান আছে। ভদ্রলোক ভাল ওষুধ দেন। আপনি এই কাগজটায় লিখে দিন, আমি একটু পরে গিয়ে আপনার জন্য নিয়ে আসব।'

বাড়ির বাইরে এলে উৎপলেন্দুর কনস্টিপেশনের সমস্যা হয়। তখন নাক্স ভমিকা খেলে উপকার হয়। সামান্য গা ম্যাজমেজে ভাবের জন্য ব্রায়োনিয়াও ভাল কাজ করে। উৎপলেন্দু একটা কাগজে খসখস করে নিজের জন্য ওষুধ লিখলেন। সুমন কাগজটা নিয়ে হাতে রাখল।

উৎপলেন্দু সুমনকে জরিপ করছিলেন। অল্পবয়সি একটা টগবগে ছেলে। সেই ছেলেই কেমন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। প্রগাঢ় শোকের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে, যা যে কোনও মানুষের মুখের হাসি শুষে নিতে পারে। পৃথিবীর কোনও ব্লটিং পেপারের বুঝি এমন ক্ষমতা নেই!

বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার দিকে চোখ পড়েছে। এই আসবাবটি কোন আদ্যিকালে যে তৈরি হয়েছিল কে জানে! উৎপলেন্দু পারা-ওঠা আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। অবিন্যস্ত চুলে আর বাসি দাড়িতে কেমন অচেনা লাগছে নিজের প্রতিকৃতিটাকে। তাঁর অফিসের লোকেরা তাদের বড়সাহেবকে এমন গণ্ডগ্রামে এই উদ্‌ভ্রান্ত দশায় যদি দেখত একবার!

যোগমায়া এক কাপ চা নিয়ে এসেছেন। বিছানার পাশের টেবিলটায় রাখলেন এসে। বললেন, 'দাদা, হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিন। একটু ভাল লাগবে।'

সুমন এল ঘরে। একটা দাঁত মাজার ব্রাশ আর পেস্ট নিয়ে এসেছে হাতে করে। প্যাকেট খুলে ব্রাশটা উৎপলেন্দুর হাতে দিল। নরম গলায় বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে। আপনাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিই।'

সুমনের পেছন পেছন বাথরুমে এলেন উৎপলেন্দু। বাথরুম বলতে যা বোঝায়, এ তা নয়। সুমনদের তিন কামরায় ঘরের সঙ্গে লাগোয়া এই ছোট্ট ঘুপচিমতো স্নানঘরটিতে আলোর ব্যবস্থা নেই, রানিং ওয়াটার নেই, বেসিন-টেসিনেরও কোনও পাট নেই। উপরে একটুখানি ঘুলঘুলির মতো করা। নিচে এক কোণে একটা প্লাস্টিকের বালতির মধ্যে জল রাখা আছে। একটা ছোট মগ ঝুলছে বালতির গায়ে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে উৎপলেন্দু তাকিয়ে থাকলেন সামনের দিকে। সামনে বেশ বড়সড় নিকনো উঠোন। একদিকে মরশুমি ফুল রয়েছে কিছু। একটা পেয়ারা গাছ তার পাশে। ওদিকে একটা রান্নাঘর। টিনের চাল। মাটির দাওয়া। টিন দিয়ে ঘেরা দেওয়া। পোড়া মোবিল দিয়ে কালো রং হয়েছে সেই টিনে। রান্নাঘরে দু'-একজন মহিলা রান্নার কাজ করছে। সুমনের মাকেও দেখা যাচ্ছে ছাপা শাড়ি পরে উবু হয়ে বসে বঁটিতে সবজি কুটছেন।

উঠোনের ওদিকটায় আকন্দ আর আসশ্যাওড়ার ঝোপ। সেই ঝোপের ওধারে অযত্নের কিছু কামিনী গাছ জঙ্গল বানিয়ে রেখেছে। তার ওপাশটায় একটা স্যানিটারি পায়খানা নজরে এল। ছাই রঙের একটা বিড়াল নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে উঠোনে। কুচকুচে কালো একটা মুরগি তারস্বরে চেঁচিয়ে ডেকে যাচ্ছে তখন থেকে।

উঠোনের দিকে তাকিয়ে আছেন উৎপলেন্দু। ঠিক কোন জায়গাটায় তিথি মাড়িয়ে দিয়েছিল সাপটাকে? আস্‌শ্যাওড়ার ঝোপের ওখানটাতেই কি? সাপটা কি ওখানটাতেই লুকিয়ে আছে এখনও?

উৎপলেন্দুর সারা গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল।

২৮

দাঁত মেজে মুখে-চোখে জল দিয়ে ঘরে ফিরেছেন উৎপলেন্দু। দু'-তিনজন লোক বসে রয়েছে ঘরটায়। নিচু স্বরে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। ফুলপ্যান্ট আর নীল হাফহাতা পাঞ্জাবি পরা লোকটি মাঝবয়সি। মাথায় ঘন চুল, গালে দু'দিনের খড়কাটা দাড়ি। পোড়খাওয়া মুখ-চোখ। উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে সালাম জানিয়ে বলল, 'আমি পঞ্চায়েতপ্রধান ইয়াসিন রসুল। আপনিই তো সুমনের শ্বশুরমশাই।'

উৎপলেন্দু হাত জড়ো করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই তিথির বাবা।'

মকবুল খইনি বানাচ্ছিল এতক্ষণ। খইনিপাতার গুঁড়ো মুখের ভেতর পুরে জিব দিয়ে যথাস্থানে রেখে মুখবিকৃতি করল। বলল, 'ইয়াসিনভাই মানুষের সঙ্গে থেকে, মানুষের মধ্যে মিশে কাজ করে। শুধু পাতাঝোরা পঞ্চায়েত নয়, আশপাশের দু'-দশটা গ্রামের মানুষ ইয়াসিনভাইকে এক ডাকে চেনে।'

ইয়াসিন হাত তুলে থামতে বলল মকবুলকে। পাশ থেকে লেদু পোঁ ধরল, 'কলকাতার নেতারা ইয়াসিনভাইকে ভালবাসে। এই তল্লাটে এলে একবার ইয়াসিনভাইয়ের সঙ্গে দেখা না করে যায় না কেউ।'

ইয়াসিন তার দুই শাগরেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এ হল মকবুল আর এ লেদু। দু'জনেই পার্টির হোলটাইমার। ওদের মতো ছেলেদের উপর ভর করেই তো পার্টি চলছে। আমাকে নানা কারণে জেলায় যেতে হয় প্রায়ই। মকবুল আর লেদু মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনে। নিজেরা সমাধান করতে না পারলে আমাকে জানায়।'

মকবুল বলল, 'পার্টির একটা প্রোগ্রাম ছিল জলপাইগুড়িতে। ইয়াসিনভাইয়ের সঙ্গে আমরাও গিয়েছিলাম। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। এসে শুনলাম ঘটনার কথা। ইয়াসিনভাই বলল, এত রাত করে শোকতাপের বাড়ি যাওয়া ঠিক হবে না। সে জন্য আজ সকালে এলাম আমরা।'

উৎপলেন্দু অনাগ্রহী স্বরে বললেন, 'ও।'

ইয়াসিন বলল, 'জলপাইগুড়িতে ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিল আমাদের দল। কলকাতা থেকে জাঁদরেল দু'জন নেতা এসেছিল। খবরের কাগজে পরদিন ছবি সমেত খবরও দিয়েছিল। দেখেননি?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'না, কাগজ পড়িনি। তবে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করার জন্য ইদানীং রাজনৈতিক নেতারা ইফতার পার্টি নামে একটা জিনিসের রেওয়াজ যে শুরু করেছেন, সেটা জানি।'

ইয়াসিন বলল, 'জানি। সেই দোয়ায় বলা হয়— হে আল্লাহ, আমি তোমার জন্য রোজা রাখিয়াছি এবং তোমার এই রুজি প্রদানের উপর নির্ভর করিয়াছি। হে পরম দাতা, তোমারই অনুগ্রহে ইফতার করলাম।'

উৎপলেন্দু বললেন, 'একদম ঠিক। আচ্ছা, ভোরবেলা যখন খাওয়া হয়, তখন নির্দিষ্ট প্রার্থনা করে উপবাস শুরু করতে হয়। সেই প্রার্থনাটা জানেন?'

ইয়াসিন বলল, 'সে সময় বলা হয়— হে আল্লাহ, আমি তোমার খুশির জন্য পবিত্র রমজান মাসের আগামীকাল রোজা থাকিব বলিয়া নিয়ত করিলাম। ইহা তোমার আদেশ বা ফরজ। অতএব, আমার রোজা কবুল করো। নিশ্চয় তুমি মহাজ্ঞানী, তুমি সবকিছু শুনতে পাও।'

ইয়াসিনের পোশাক দেখে, কথাবার্তা শুনে যতটা গেঁয়ো আর অশিক্ষিত বলে উৎপলেন্দুর মনে হচ্ছিল, এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না। আমজনতার সঙ্গে সহজে মেশার জন্য চলনে-বলনে একটা গ্রাম্যতা বোধহয় ইচ্ছে করেই আরোপ করে রেখেছে ইয়াসিন। রাজনীতির ব্যাপারীদের মধ্যে অনেকেই যেমন হয়।

ইয়াসিন বলল, 'রোজা সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে— হে বিশ্ববাসীগণ, তোমাদের জন্য সিয়াম বা রোজার বিধান দেওয়া হল। যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পারো নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্য।'

উৎপলেন্দু বললেন, 'যে মানুষ পড়াশোনার চর্চা করে, তার সঙ্গে কথা বলার মধ্যে সুখ আছে। যে কথা বলছিলাম, রোজা একান্ত ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। সেখানে ধুমধাম করে এই ব্যাপারটাকে উৎসবে পরিণত করে ইফতার পার্টির আয়োজন করে রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু সেটা কি ইসলাম অনুমোদন করে? শুধু তা-ই নয়, যাঁরা উপবাস করেননি, তাঁদের ইফতারে যোগদান করা কি ইসলামের অনুমোদনযোগ্য?'

ইয়াসিন নিরুত্তর। মকবুল আর লেদুও তাকিয়ে আছে উৎপলেন্দুর দিকে।

উৎপলেন্দু বললেন, 'যেসব ইফতার অনুষ্ঠান আমরা আজকাল দেখি, তাতে ক'জন আল্লাহর আদেশ পালন করে যোগদান করছেন বলুন? হজরত মহম্মদ বলেছিলেন— বিদ্যাশিক্ষা প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে আবশ্যিক। আমার মনে হয় কী জানেন তো, রাজনৈতিক দলনেতারা যদি ইফতার পার্টিতে অর্থব্যয় না করে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করেন তাহলে তাঁরা বলতে পারবেন, আমরা মহানবীর পথ অনুসরণ করেছি। ইফতার পার্টিতে যোগদান করে তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে হবে না।'

ইয়াসিন মাথা ঝুঁকিয়ে আছে। কিছু বলছে না। সুমন এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল উৎপলেন্দুর বিশ্লেষণ। এবার নিচু গলায় বলল, 'রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের খুশি করার জন্য এক অলিখিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সব জায়গায়।'

উৎপলেন্দু বললেন, 'গান্ধিজি মারা যাবার সময় দিল্লির রাজপথে সংখ্যালঘু মানুষ বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আমরা একজন অভিভাবককে হারালাম। মৌলানা আজাদ যখন মারা যান, তখনও দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ প্রিয়জন হারানোর শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিল। অথচ গান্ধিজিকে কেউ টুপি পরে ইফতার পার্টি করতে দেখেনি কোনও দিন। মৌলানা আজাদকেও পূজা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখেনি কেউ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আমাদের রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের ব্যাপারেও সেটা বলা যেতে পারে। তাঁকেও ঘটা করে পুজোআচ্চা করতে দেখিনি আমরা।'

সুমন স্থির চোখে দেখছে উৎপলেন্দুকে। কাল সন্ধেবেলা যে মানুষটাকে সুমন দেখেছিল তা ছিল একমাত্র মেয়ের মৃত্যুতে ভেঙে পড়া একজন বাবার মূর্তি। গতকালের সেই দুর্বহ শোকের ভার সময়মতো খানিকটা সরিয়ে নিয়েছে উৎপলেন্দুর উপর থেকে থেকে। তাতে স্পষ্ট হচ্ছে মানুষটার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব।

একটা শ্বাস ফেলল সুমন। তিথিও তো এমন ছিল। বন্ধুদের সঙ্গে যখন তর্ক হত, তখন তিথির বুদ্ধির দীপ্তি ঝলসে উঠত বারবার। এর নামই কি তাহলে জিন? বাপের ক্রোমোজোম তাহলে সত্যিই বহতা হয়ে চারিয়ে যায় তার সন্তানের মধ্যে?

ইয়াসিন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে কদমবুসি করল উৎপলেন্দুকে। গাঢ় স্বরে বলল, 'আপনার মতো একজন শিক্ষিত মুক্তমনা মানুষের সঙ্গে আলাপ হল, খুব আনন্দ পেলাম। আপনার কথা আমি কখনও ভুলব না। আপনার কোনও সাহায্যে যদি কখনও আসতে পারি তাহলে ধন্য মনে করব নিজেকে।'

উৎপলেন্দু বললেন, 'আমারও আপনার

ইয়াসিনের পোশাক দেখে, কথাবার্তা শুনে যতটা গেঁয়ো আর অশিক্ষিত বলে উৎপলেন্দুর মনে হচ্ছিল, এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না। আমজনতার সঙ্গে সহজে মেশার জন্য চলনে-বলনে একটা গ্রাম্যতা বোধহয় ইচ্ছে করেই আরোপ করে রেখেছে ইয়াসিন।

কথা মনে থাকবে। জলপাইগুড়িতে কখনও এলে আমার বাড়িতে আসবেন।'

ইয়াসিন ঘাড় নাড়ল। তারপর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে মকবুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গোখুরটা আশপাশে আছে কোথাও। তোকে বলেছিলাম না খালপাড়ের ন্যাদনকে এত্তেলা দিতে? কী হল, খবর দিয়েছিস?'

মকবুল বলল, 'তুমি একটা কাজ করতে বলেছ, আর সেটা করিনি এমন হয়েছে কখনও? ন্যাদনকে খবর পাঠিয়েছি।'

লেদু পাশ থেকে বলল, 'ন্যাদনের সঙ্গে আমারও কথা হয়েছে। দশটা-সাড়ে দশটার মধ্যেই এসে যাবে বলেছে।'

ইয়াসিন বলল, 'সরকার থেকে স্নেকবাইট ডেথ কেসে এক্সগ্রাশিয়া গ্র্যান্ড এখন বাড়িয়ে দিয়ে দু'লক্ষ টাকা করে দিয়েছে। আমি মকবুল আর লেদুকে বলে দিয়েছি ব্যাপারটা দেখার জন্য। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, পুলিশ রিপোর্ট ওরাই জোগাড় করে রাখবে। ত্রাণ স্থায়ী সমিতির একটা মিটিং ডাকা হয়েছে কাল দুপুরে। সেখানে একটা রেজোলিউশন করিয়ে নিয়ে সুমনকে লিগাল এয়ার দেখিয়ে দেব।' উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে ইয়াসিন বলল, 'আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'না, আপত্তি থাকবে কেন?'

ইয়াসিন বলল, 'জেলা অফিসে প্রোপোজাল পাঠিয়ে দেব এই সপ্তাহের মধ্যেই। মকবুল আর লেদুই মাঝেমধ্যে জেলা সদরে যাবে খবর নিতে। অ্যালটমেন্ট থাকলে দু'-চার মাসের মধ্যেই টাকা পেয়ে যাবে সুমন। ফান্ড না থাকলে বড় জোর ছ'মাস অপেক্ষা করতে হবে।'

সুমন বলল, 'ঠিক আছে।'

ইয়াসিন নড়েচড়ে বসে বলল, 'আচ্ছা, সে দিন ঘটনাটা ঘটল কীভাবে? হেল্‌থ সেন্টার থেকে কোনও অ্যান্টিভেনম দেয়নি?'

বহুজন এই এক প্রশ্ন করেছে কাল থেকে। এক উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত লাগছে তার। তা ছাড়া কাল সন্ধের কথা মনে করতে গেলে বুকটা ভার হয়ে আসছে। সুমন বলল, 'ক'দিন ধরেই তো বৃষ্টি হচ্ছিল প্রচুর। জল জমে গিয়েছিল উঠোনটায়। কাল সন্ধের দিকে রান্নাঘরে যাচ্ছিল তিথি। একটা গোখরো যে উঠোনে শুয়ে আছে, সেটা দেখতে পায়নি। সাপের লেজের উপর পা দিয়ে ফেলেছিল ভুল করে। বেশিক্ষণ সময় পাওয়া যায়নি। হেল্‌থ সেন্টার অবধি পৌঁছতে পারিনি। তার আগেই...'

ইয়াসিন চুকচুক করে একটা শব্দ করে বলল, 'শ্রাদ্ধের জন্য পুরুতকে খবর দেওয়া হয়েছে তো?'

সুমন বলল, 'নিবারণ চক্রবর্তীকে বলা হয়েছে। একটু পরেই উনি আসবেন কথা বলতে।'

ইয়াসিন বলল, 'তাহলে তো সব ঠিকই আছে। কোনওরকম সাহায্য লাগলে আমাকে বোলো।'

ইয়াসিন উঠল। লেদু আর মকবুলও গাত্রোত্থান করল। ইয়াসিনদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে সুমন বলল, 'ভেবেছিলাম তিথির মা আপনাদের সঙ্গে আসবেন। উনি এলেন না? ওঁর শরীর ঠিক আছে তো?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'মিসফরচুন নেভার কাম অ্যালোন। দুর্ভাগ্য সব সময়েই সঙ্গীসাথি নিয়ে আসে। আজ সকালে তিথির খবরটা যখন তুমি আমাকে ফোনে দিয়েছিলে, তখন মিমি রান্নাঘরে ছিল। ঠিক সে সময়েই মিমির একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল।'

সুমন শুকনো মুখে বলল, 'সর্বনাশ!'

উৎপলেন্দু বললেন, 'সঙ্গে সঙ্গে নার্সিং হোমে ভরতি করা হয়েছে। তবে ইনিশিয়াল ক্রাইসিস থেকে অনেকটা রিকভার করে গেছে।'

সুমন বলল, 'তিথির কথাটা উনি জানেন?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'আমি ঠিক শিয়োর নই। তবে স্পষ্ট করে কিছু না জানলেও বিপদ যে কিছু একটা হয়েছে, সেটা মনে হয় মিমি আঁচ করেছে। নার্সিং হোম থেকে বাড়িতে ফিরে এলে আমাকেই খবরটা দিতে হবে। তখন আবার একটা সংকট তৈরি হবে।'

সুমন বলল, 'এখন কেমন আছেন উনি?'

উৎপলেন্দু পকেট থেকে সেলফোন বার করে চিন্তিত গলায় বললেন, 'জানি না। তোমাদের এখানে তো মোবাইলের সিগনাল আসে না। দীপক-তুলির সঙ্গে, তিথির বন্ধুদের সঙ্গে, জলপাইগুড়ির কারও সঙ্গেই তো কথা হয়নি এখানে আসার পর থেকে। তোমার সময় হলে কোনও ফোন বুথে নিয়ে যেয়ো আমাকে।'

সুমন বলল, 'এখান থেকে দশ মিনিট হাঁটলেই ফোন বুথ। নিন, চা শেষ করে নিন। তারপর চলুন, একটা ফোন করে নেবেন বাড়িতে।'

২৯

জীবনে প্রথমবার মিমি সমুদ্র দেখেছিলেন পুরীতে। বাইশ বছর আগে। উৎপলেন্দুর সঙ্গে হানিমুনে গিয়ে। তখন সাদামাটা একজন ফিল্ড ওয়ার্কার ছিলেন উৎপলেন্দু। কতই বা রোজগার। কিন্তু মধুচন্দ্রিমা বলে কথা, সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলের ডাবল বেডরুমে উঠেছিলেন দু'জনে। হোটেলে চেক-ইন করে ব্যাগপত্তর গুছিয়ে রেখে জানালা দিয়ে তাকাতেই বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন মিমি। গোটা দিগন্তরেখা জুড়ে শুধু অনন্ত জলরাশি। স্থির হয়ে রয়েছে নীলচে ধূসর জলের রেখা। একটা জেলেডিঙি মাঝসমুদ্রে মোচার খোলার মতো ভাসছে। যত ঢেউ, সব নাকি পাড়েই এসে ধাক্কা খায়। মাঝসমুদ্রে ঢেউ নেই খুব একটা। যত গভীরের দিকে যাওয়া যায়, তত স্থির হতে থাকে সমুদ্রের এই উদ্দামতা।

পরদিন যখন সমুদ্রস্নানে নামলেন, সেই অনুভূতিটার কথাও মিমির স্পষ্ট মনে আছে আজও। আঙুলগুলো বাঁকিয়ে ব্যালান্স করে করে হাঁটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন উৎপলেন্দু। সেভাবে হাঁটতে গিয়ে মিমির পায়ে কেমন একটা তিরতিরে অনুভূতি।

ভারী মজা লাগছিল হাঁটতে। নিজের চপল কৈশোরে ফিরে যাচ্ছিলেন মিমি। গোড়ালির কাছে এসে ঢেউগুলি ফেনার কুলকুচি তুলে বারবার লুটিয়ে পড়ছিল। পায়ের নিচে বালি শুধু সরে সরে যাচ্ছিল। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

কাল সকালে যখন সুমনের ফোনটা এসেছিল, তখন কিচেনে ব্যস্ত ছিলেন মিমি। উৎপলেন্দু ফোনটা ধরে যখন বিভ্রান্ত গলায় 'তিথি আর নেই' কথাটা উচ্চারণ করলেন, তখন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল বুকের মধ্যে। এক অসীম শূন্যতার মধ্যে যেন তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল কেউ। এক সমুদ্র জলরাশি তার গগন-ছোঁয়া ঢেউ নিয়ে এসে আছাড়িপিছাড়ি খেতে শুরু করল পাঁজরের মধ্যে। একটা কষ্টের ভাঙচুর চলছিল ভেতরে ভেতরে, সেটা মনে আছে। আর কিছু মনে নেই।

ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে মাঝসমুদ্রে চলে গিয়েছিলেন মিমি। নীলচে মায়াবী আলোতে স্নান করছে দিক্‌চক্রকালব্যাপী স্তব্ধ সমুদ্র। মাথার উপর পাক মারছে সিন্ধুসারসের ঝাঁক। কানে আসছে পাড়ে ঢেউ লাগার গম্ভীর মন্দ্র আওয়াজ। নীল জলের মধ্যে লাট খাচ্ছে কালো একটা জেলেডিঙি। সেই ডিঙিতে সওয়ার হয়েছেন তিনি নিজে।

যেদিকে দু'চোখ যায়, কেউ নেই কোথাও। একটু একটু করে নিঃসঙ্গ মিমি এগচ্ছেন দিগন্তরেখার দিকে। মাথার উপর দিয়ে চক্কর কেটে যাচ্ছে অজস্র সিগাল। ঢেউয়ের পর ঢেউ তাঁকে নিয়ে চলেছে আরও গভীর, আরও অনিশ্চিতের দিকে।

জ্ঞান ফিরে এল নার্সিং হোমের কেবিনে। অস্পষ্ট দেখলেন উৎপলেন্দু, দীপক, তুলিরা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। উদ্বিগ্ন মুখে উৎপলেন্দু বলছিলেন, 'তোমাকে খুব সময়মতো নিয়ে আসা হয়েছে নার্সিং হোমে। আমার তো টেনশনে হাত-পা কাঁপছিল। দীপকই অ্যাম্বুলেন্স-নার্সিং হোমের সব ব্যবস্থা করল। আর একটু দেরি হয়ে গেলে কী যে হয়ে যেত কে জানে!'

এত জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যেও হাসি পেল মিমির। এখানে ভরতি করতে দেরি হলে কী হত? মরে যেতেন তিনি, এই তো? একদিন তো সকলেই চিরঘুমে ঘুমিয়ে পড়বে। সে নিয়ে এত ভাবনার কী আছে? মৃত্যু হল শেষ। আছে থেকে নেই হয়ে যাওয়া। অস্তি থেকে নাস্তি। যার শুরু আছে, তার শেষও আছে। যে কোনও মানুষের মৃত্যু হল স্বাভাবিক এক পরিণতি। একজন মানুষ কতদিন বাঁচবে, তার আয়ুষ্কাল কত, সেটা নিশ্চিত নয়। কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য। তাকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য নেই কারও।

উৎপলেন্দুর মুখ থেকে উচ্চারিত 'তিথি আর নেই' বাক্যবন্ধটা আবার ফিরে এসে ঘুরপাক খেতে লাগল মস্তিষ্কে। সুমন যে খবরটা দিয়েছিল, সেটা কি সত্যি নাকি মিথ্যে? মিথ্যে

‘জলপাইগুড়ি দিন দিন তার চেহারা বদলাচ্ছে। পপুলেশন বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির সংখ্যাও বাড়ছে। গাছপালা কমছে শহরে, বাড়ছে কংক্রিটের জঙ্গল।’

হবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু যদি সত্যি হয়? অজানা এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় সারা শরীর কেঁপে উঠল মিমির।

পিছনের দিকে ঘুরে তাকাচ্ছিল মিমি। উৎপলেন্দুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে। তিথিকে গর্ভে ধারণ করা। সদ্যোজাত শিশু থেকে একরত্তি মেয়ের একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠা। জীবনে যা ঘটে, তার সেই পল-অনুপলের আর বিনির্মাণ চলে না। ফিরে যাওয়া যায় না ফেলে আসা ক্ষণে।

কিন্তু মন কি আর সেসব বোঝে! বুড়ো অজগর যেমন পাক খায়, তেমনি করে মিমির মনের মধ্যে নাড়া দিয়ে উঠল ফেলে আসা কিছু মুহূর্ত। তিথি যে দিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, সেই মুহূর্তটা যদি আর একবার ফিরে পাওয়া যেত। যদি তিথিকে আঁকড়ে ধরে বাধা দিতে পারতেন মিমি। নতুন করে যদি সব শুরু করা যেত!

বিমলেন্দু আর মাধবী এসেছিলেন দিল্লি থেকে। সিকিম ঘুরতে এসে ঢুঁ দিয়েছিলেন সহোদর উৎপলেন্দুর বাড়িতে। তিথির ঘটনা সব শুনে ফ্লাইটের টিকিট ক্যানসেল করে যেতে চেয়েছিলেন পাতাঝোরায়। চাইছিলেন একটা মধ্যস্থতা করতে।

উৎপলেন্দুও অরাজি ছিলেন না। কিন্তু মিমি পারলেন না নিজের জেদের কাছে নতিস্বীকার করতে। কী যে এক অহংবোধ মাথায় চেপে বসল, মিমি পাতাঝোরায় নিজেও গেলেন না, উৎপলেন্দুদেরও যেতে দিলেন না। স্পষ্টতই ক্ষুণ্ণ বিমলেন্দু-মাধবী ফিরে গেলেন দিল্লিতে।

মিমির উপর হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন উৎপলেন্দুও, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতেন না। তবে এক ছাদের তলায় বাস করার ফলে মিমি টের পাচ্ছিলেন, তিথির ঘটনাটা কত কষ্ট দিচ্ছে উৎপলেন্দুকে। মুখে তিথিকে নিয়ে একটা কথাও বলতেন না।

কিন্তু মিমি জানেন, মেয়েকে প্রতি মুহূর্তে কতটা অনুভব করছেন উৎপলেন্দু। এদিকে চাকরিতেও একটা প্রোমোশন হল এর মধ্যে। দায়িত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপ বাড়ল। অফিস থেকে ফিরতে রাত হত প্রায়ই। বাড়িতে এসেও গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হত এক-একদিন। নম্র ভদ্র উৎপলেন্দু খিটখিটে হয়ে পড়ছিলেন। সবকিছুর পরিণতিতে যত দিন যাচ্ছিল, উৎপলেন্দু একটু একটু করে অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়ছিলেন।

কিছুদিন আগে এক সন্ধেবেলা মিমি টিভি দেখছিলেন ড্রয়িং রুমে। হঠাৎ শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেন উৎপলেন্দু টলমল পায়ে চলে এসেছেন তাঁর কাছ। পাশে বসে জড়ানো গলায় বলেছিলেন, ‘মিমি, একটা কাজ করলে কেমন হয়? একদিন দুম করে পাতাঝোরা চলে যাই চলো।’

মিমি ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন উৎপলেন্দুর দিকে, ‘কেন?’

উৎপলেন্দু মিমির কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, ‘তিথি কেমন সংসার করছে দেখে আসতে ইচ্ছে করে না তোমার?’

মিমি রুক্ষভাবে জবাব দিয়েছিলেন, ‘না, করে না। পাতাঝোরা যেতে হয় তুমি যাও। মরে গেলেও আমি ওই চাষার ঘরে যাব না।’

উৎপলেন্দু নির্জীব গলায় বলেছিলেন, ‘এতটা জেদ ভাল নয় মিমি। পরে একদিন আপশোস করতে হবে।’

উৎপলেন্দুর গলার মধ্যে এমন একটা বিষণ্ণতা ছিল যে, মিমির মনের মধ্যে সহসা ভাঙচুর।

কী বোঝাবেন তিনি উৎপলেন্দুকে? তিথি কি তাঁর আত্মজা নয়? তাঁর নিজের একটা টুকরোই তো তাঁর মেয়ে। তিথিকে কি তিনি দশ মাস পেটে ধরেননি? তিথির জন্য কি তিনি কম ত্যাগ স্বীকার করেছেন?

উৎপলেন্দুর তখন সামান্য মাইনে, বেবি ফুড কেনার ক্ষমতা নেই। বাজার থেকে দু’-এক টুকরোর বেশি মাছ কেনার বেশি সচ্ছলতা নেই। সে সময় নিজে না খেয়ে মেয়েকে খাইয়েছেন মিমি। জ্বরজারি হলে উদ্বিগ্ন হয়ে সারারাত হাতপাখা দিয়ে বাতাস করেছেন। দুশ্চিন্তায় জেগে কাটিয়েছেন। সেই তিথি যে সামান্য একটা ছেলের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, সেটা কি কস্মিনকালেও ভেবেছিলেন তিনি? ভাবেননি। মনে করেছিলেন মেয়ে আবার ফিরে আসবে তাঁর কাছে। কিন্তু তা আর হল না। এখন কী থেকে যে কী হয়ে গেল...।

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হল। উৎপলেন্দুর পর এক এক করে বিদায় নিল তিথির বন্ধুরা। তারপর গেল দীপক আর তুলি। তাঁকে ছেড়ে চলে গেল সবাই।

সকলে চলে যাবার পর এখন কেবিনে পড়ে রইলেন মিমি। মাঝসমুদ্রে জেলেডিঙির মতো নিঃসঙ্গ। একা।

৩০

একদিকে পুকুর, ধানি জমি। অন্য দিকে টুকরোটাকরা কাঁচা বসতবাড়ি। সকালের কাঁচা রোদে উৎপলেন্দু হাঁটছেন সুমনের সঙ্গে। ঝুপ্পুস ঝুপ্পুস গাছ থেকে কাক, শালিক, ছাতারের কিচিরমিচির ভেসে আসছে কানে। কী করে আসল কথায় আসবেন, সেটা ঠিক করতে একটু সময় নিলেন উৎপলেন্দু। মুখে বললেন, ‘প্রচুর গাছপালা আর পাখি আছে তো এদিকে!’

সুমন সায় দিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ তা আছে। দুধরাজ, ভীমরাজ, সয়ালি, বাঁশপাতির মতো অচেনা পাখি যেমন পাতাঝোরায় আছে, তেমনি আছে দোয়েল, মাছরাঙা, ঘুঘু, ফিঙে, পায়রা, বুলবুলির মতো চেনা পাখি। আমাদের এদিকটায় তো বেশির ভাগই ফলের গাছ। কিছু মানুষজন লাগিয়েছে, কিছু নিজে থেকেই হয়ে গেছে। আম, জাম, লিচু, আতা, ফলসা, কামরাঙা, জামরুল, আঁশফল— আরও কত কী।’

উৎপলেন্দু বললেন, ‘ফলের গাছ থাকলে তো পাখি আসবেই। তাদের টেনে আনবার জন্যই তো প্রকৃতির এত আয়োজন। আমাদের ওখানে আগে অনেক পাখি দেখতাম। আজকাল আর দেখি না।’

সুমন বলল, ‘জলপাইগুড়ি দিন দিন তার চেহারা বদলাচ্ছে। পপুলেশন বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির সংখ্যাও বাড়ছে। গাছপালা কমছে শহরে, বাড়ছে কংক্রিটের জঙ্গল।’

উৎপলেন্দু বললেন, ‘জলপাইগুড়িতে ছোটবেলায় দেখতে পেতাম কতরকম পাখি। দুপুরবেলা জামরুল গাছে ঝুলে থাকত কাঠবেড়ালি, কানে ভেসে আসত কাঠঠোকরার ঠকাস ঠকাস শব্দে গাছ ঠোকরানোর আওয়াজ। বাদামি মেছো পেঁচা দেখেছি অনেকবার। আজকাল আর চোখে পড়ে না।’

সুমন বলল, ‘পাখি বলতে মানুষ বোঝে সামান্য একটা প্রাণ। তা কিন্তু নয়। পাখি হল সত্যিকারের বৃক্ষবন্ধু। কেননা পাখি কেবল বীজ ছড়ায় তা তো নয়, সে ফুল থেকে ফুলে পরাগমিলন ঘটায়। গাছের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড়ও খেয়ে ফেলে পাখি।’

উৎপলেন্দু বললেন, ‘পাতাঝোরা জায়গাটা বেশ লাগছে আমার। কাছেই মসজিদ আছে কোথাও। আজ ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছে মসজিদ থেকে ভেসে আসা আজানের শব্দে। এমন করে আগে কখনও আজান শুনিনি। আজানের শুরুতেই আকাশ-বাতাস জাগিয়ে দেয় যে সুর, সেটা আসলে ডাক। আহ্বান। আল্লাহর প্রার্থনায় এসে যোগ দাও তোমরা। যিনি ডাক দেন, তাঁকে বলা হয় মুয়াজ্জিম। সকলে এলে তারপর শুরু হয় ফজরের নমাজ।’

সুমন বলল, ‘এত কিছু জানতাম না।’

উৎপলেন্দু বললেন, ‘সুললিত মুক্তছন্দে আরবি ভাষায় এই আবৃত্তি সহজ কাজ নয়। এটা সবাই করতে পারেন না। তবে পাতাঝোরা মসজিদের ইমাম পারেন। যেমন পারেন পণ্ডিত ভীমসেন জোশি, তাঁর অনবদ্য ভৈরোঁ রাগ গেয়ে। পারেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মহালয়ার সকালে। স্বরের অমোঘ গমক দিয়ে তৈরি করে দেন এক আশ্চর্য ম্যাজিক।’

সুমন হাসল।

উৎপলেন্দু জিজ্ঞেস করলেন, ‘জানি তুমি এক কথা বলে বলে ক্লান্ত। তবু জানতে চাইছিলাম, দুর্ঘটনাটা ঘটল কীভাবে?’

সুমন ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে রেখে থাকল

একটু। বলল, 'আমাদের বাড়িতে রান্না একবেলাই হয়। রাতের ভাতটুকু মা-ই করে নেয়। সন্ধেবেলা তিথি বলল, রাতে গরম গরম খিচুড়ি হলে কেমন হয়? আমিও নেচে উঠে বললাম, হয়ে যাক তবে। খিচুড়ি রাঁধতে রান্নাঘরের দিকে যখন যাচ্ছে তিথি, তখনই ঘটল দুর্ঘটনাটা। সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেলল ভুল করে।'

উৎপলেন্দুর হাঁটার গতি শ্লথ হল। বুকের মধ্যেটা কেমন যেন করতে শুরু করল। একটা তীব্র উথালপাথাল সারা শরীর জুড়ে।

সুমন নিচু স্বরে বলল, 'তিথি নিজেও প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। সাপটা কামড়ে দিয়েই ওর চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছিল। তিথি আমার কাছে এসে যখন ওর পা-টা দেখাল, তখন দেখলাম পাশাপাশি দুটো জায়গা গাঢ় লাল রক্তের ফোঁটা।

উৎপলেন্দুর শরীর একটু শক্ত হয়ে উঠল। মনের চোখ দিয়ে দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি। একটা বিশাল পাখি যেন পাখসাট মারছে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে।

সুমন বলল, 'প্রথম দু'-তিন সেকেন্ড আমিও কিছু বুঝিনি। কিন্তু তারপর বুঝলাম। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝেই আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। তিথিও ভয় পেয়ে গেল খুব। আমার দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কী হবে এখন?'

উৎপলেন্দু চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন। ছোট থেকেই তিথি একটু ভিতু। বাথরুমে আরশোলা কিংবা মাকড়সা দেখলে চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করত। সেই মেয়ে নিজের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে সামনাসামনি দেখে কতটা ভয় পেয়েছিল কে জানে!

সুমন যেন ফিরে গেছে সেই সময়টায়। হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলল, 'তখন আমার গেঞ্জিটা খুলে শক্ত করে ওর উরুর মধ্যে বাঁধন দিয়ে একটা ভ্যান রিকশায় ওকে নিয়ে ছুটেছিলাম হেল্‌থ সেন্টারে। রাস্তার মধ্যেই ওর কথা জড়িয়ে আসছিল, একটু একটু করে আচ্ছন্ন হয় পড়ছিল তিথি।' হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল সুমন, 'হেল্‌থ সেন্টার অবধি যেতে পারিনি। আমার হাতেই শেষ শ্বাস ফেলল তিথি।'

উৎপলেন্দুর শরীরটা অবসন্ন লাগছে। হাঁটার যেন শক্তি নেই শরীরে। অশক্ত বয়স্ক মানুষের মতো করে হাঁটছেন। চৌরাস্তা এসে গেল একটু বাদে। মোড়ের মাথায় গুটিকয়েক দোকান।

টিনের চাল দেওয়া ফোন বুথ ফাঁকাই ছিল। ডায়াল করতেই ওপাশে দীপক। উৎপলেন্দু উদ্‌গ্রীব গলায় বললেন, 'দীপক, মিমি কেমন আছে?'

দীপক এক নিঃশ্বাসে বললেন, 'দিদির অক্সিজেন খুলে দিয়েছে আজ সকালে। ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুয়িড আজ বিকেলে বন্ধ করে দেবে। ডায়েটও অনেকটা নর্মাল হয়ে এসেছে। সব ঠিকঠাক চললে দু'-একদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে দিদিকে।' দীপক এক নিঃশ্বাসে বললেন, 'ওদিকের খবর কী? তিথি ভাল আছে তো?'

উৎপলেন্দুর সারা শরীর জুড়ে অবসাদ। ভেঙে পড়েছেন ভেতরে ভেতরে। কোনওমতে বললেন, 'তিথি... তিথি আর নেই দীপক। সাপের কামড়ে...। পাতাঝোরা শ্মশানেই দাহ হয়েছে কাল রাতে। সে সময় আমিও ছিলাম সুমনদের সঙ্গে।'

দীপক চিৎকার করে উঠেছেন, 'মানে?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'মিমিকে এখনই কিছু বলতে যেয়ো না। ওর শরীরটা এমনিতেই ভাল নয়। তুলিকেও কিছু বোলো না। আমি আগে যাই। তারপর...।'

দীপক স্তম্ভিত হয়ে থেকে বললেন, 'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

উৎপলেন্দু মৃদু গলায় বললেন, 'অপঘাতে মৃত্যু, তাই তেরাত্রিতে কাজ। কাল দুপুরের মধ্যে শ্রাদ্ধশান্তির কাজ মিটে যাবে। বিকেলের বাসেই ফিরে আসছি আমি।'

দীপক বললেন, 'আপনি কোথায় উঠেছেন? ওই গ্রামে কোনও হোটেল আছে?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'আমাকে নিয়ে ভেবো না। আমি সুমনদের বাড়িতেই আছি। এই তো তোমাকে ফোন করতে এসেছি। সুমনই নিয়ে এসেছে আমাকে।'

দীপক হতভম্বের মতো চুপ করে থাকলেন কয়েক সেকেন্ড। বিড়বিড় করে বললেন, 'আপনার কথার মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারছি না উৎপলদা।'

উৎপলেন্দু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সুমনকে একবার দেখে নিলেন। তারপর গলাটা খাদে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সুমন ছেলেটা মন্দ নয় দীপক। তিথির দুর্ঘটনায় ওর কোনও দোষ নেই। ফিরে গিয়ে সব বলব।'

বিল মিটিয়ে ফিরছিলেন উৎপলেন্দু। সুমন বলল, 'আপনার হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে নিই চলুন।'

হোমিয়োপ্যাথ মাধব বসেছেন ছোট্ট দোকানে। সুমনকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। নরম গলায় বললেন, 'তিথি মায়ের ঘটনাটা সব শুনেছি। কী বলে যে তোমাকে সান্ত্বনা দেব সুমন। এত অল্প বয়স তোমার... শেষে তোমার ভাগ্যেই এমন বিপর্যয়!'

সুমন ম্লান মুখে বলল, 'আমার বাবা যখন মারা যান, তখন আমার বয়স অল্প। সকলে বলে, তাঁর মতো মানুষ ছিল না পাতাঝোরা গ্রামে। যাঁরা ঈশ্বরের প্রিয়জন, তাঁদের মনে হয় তিনি তাড়াতাড়িই টেনে নেন।'

মাধব ঘাড় নাড়লেন, 'ঈশ্বরের মতিগতি বোঝা ভার। শবদেহ বহন করার জন্য শববাহক থাকে। কিন্তু শোক বহন করতে হয় শুধু কাছের মানুষকেই। শবদেহের ভারের চাইতে শোকের ভার অনেকগুণ বেশি।'

উৎপলেন্দুর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে মাধব বললেন, 'এই ভদ্রলোককে তো চিনলাম না।'

সুমন বলল, 'ইনি তিথির বাবা। পাতাঝোরায় এসে ওঁর একটু ঠান্ডা লেগে গেছে। ওষুধ নিতে এসেছি আপনার কাছে।'

হাত জড়ো করলেন উৎপলেন্দু। মাধব পালটা নমস্কার করে বললেন, 'আপনি এই চেয়ারে এসে বসুন।'

উৎপলেন্দুর ব্লাড প্রেশার মাপলেন মাধব। স্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করে বললেন, 'আপনার হার্টে একটু সমস্যা আছে। বাড়ি ফিরে গিয়েই একটা ইসিজি করিয়ে ভাল একজন কার্ডিয়োলজিস্ট দেখিয়ে নেবেন। একটা লিপিড প্রোফাইলও করা দরকার। আপনার ডায়াস্টলিক প্রেশারটা সামান্য বেশি। আপনার রক্তে কোলেস্টেরল বা ট্রাইগ্লিসারাইড একটু বেশির দিকে হলে আমি অবাক হব না।'

উৎপলেন্দু ম্লান হেসে বললেন, 'আপনি একদম ঠিক ধরেছেন, আমার ইসকিমিক হার্ট আছে। কোলেস্টেরলও একটু বেশির দিকে থাকে। আমি জ্ঞান হবার পর থেকে কখনও অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন খাইনি। হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধেই আমার আস্থা। ওদিকে একজন হোমিয়োপ্যাথ আমার চিকিৎসা করছেন। ফিরে গিয়ে ওঁকেই দেখাব।'

মাধব ওষুধ বাড়িয়ে এনে বললেন, 'এই দু'রকম ওষুধ দিলাম। চার-পাঁচটা করে দানা দিনে তিনবার করে খাবেন। আশা করি উপকার পাবেন। কেমন থাকেন কাল আমাকে একবার জানাবেন।'

সুমন স্মিতমুখে বলল, 'তাহলে আসছি মাধবকাকু?'

মাধব বললেন, 'তোমার মনের অবস্থা আমি জানি সুমন। তুমি এখন চেষ্টা করো যে কোনও কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে। সময় পেলে চলে এসো আমার এখানে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে।'

বেরলেন দু'জন। একটা বন্ধ দোকানের দিকে নির্দেশ করল সুমন, 'ওই জেরক্সের দোকানটা গত বছর ভাড়া নিয়েছি।'

উৎপলেন্দু তাকিয়ে দেখলেন একটু। বললেন, 'এখানে আর ফোটোকপির দোকান নেই বুঝি?'

সুমন বলল, 'এই তল্লাটে ওই একটাই। একটা মেশিন কিনেছিলাম ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে। দোকানটা ভাড়া নিয়েছিলাম অল্প টাকায়। এখন অল্প অল্প করে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যবসাটা। একটা ছেলেকে রেখেছি। তাকে মাসোহারা দেবার পরেও সংসার খরচের অনেকটাই উঠে আসে দোকানটা থেকে।'

উৎপলেন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'এত কিছু থাকতে হঠাৎ জেরক্সের দোকান করতে গেলে যে?'

সুমন বলল, 'আমাদের গ্রামে দুটো প্রাইমারি স্কুল তো ছিলই, একটা জুনিয়র হাই স্কুলও হল গতবার। এখন তো স্টুডেন্টরাই জেরক্সের দোকান বাঁচিয়ে রাখে। আগে এখানকার লোকজনকে জেরক্স করাতে শহরে যেতে হত। এখন ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে আমাদের গ্রামে। তিথিই বুদ্ধিটা দিয়েছিল আমায়।'

উৎপলেন্দু হাসলেন, 'দোকানের নাম "তিথি" রেখেছ।'

সুমন বলল, 'প্রথমে কোনও নাম ছিল না দোকানের। কয়েক মাস বাদে যখন ব্যবসাটা একটু গুছিয়ে নেওয়া গেল, তখন তিথির নামেই দোকানটার নাম দিয়ে ফেললাম। তিথি খুব পয়মন্ত মেয়ে।'

উৎপলেন্দু হাসলেন। মিমিকে বিয়ে করার পর দু'জনে মিলে কী কষ্টের জীবন কাটিয়েছেন একটা সময়। তারপর তিথি এল। মেয়ে জন্মাবার পর থেকেই তো আমার কর্মজীবনে হাউইয়ের মতো উত্থান। সাধারণ একটা ফিল্ড ওয়ার্কার থেকে কতজনকে টপকে তাঁদের নামী ফিনান্স কোম্পানির উঁচু জায়গায় পৌঁছেছেন তিনি। তিথি যে কতখানি পয়মন্ত মেয়ে, সেটা তাঁর চাইতে ভাল আর কে জানে!

৩১

নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে বাড়ি ফিরছেন উৎপলেন্দু আর সুমন। ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর বসেছেন কি বসেননি, যোগমায়া ব্যস্ত হয়ে এলেন ঘরে। হাতে একটা প্লেটে আলু-কুমড়োর ছেঁচকি আর রুটি। ছোট টেবিলটার উপর খাবারটা রাখলেন। গলায় ভর্ৎসনা মিশিয়ে বললেন, 'তুই কী রে! সকাল থেকে ভদ্রলোক খালি পেটে আছেন। কোথায় নিয়ে গিয়েছিলি ওঁকে?'

সুমন বলল, 'তিথির মা অসুস্থ। নার্সিং হোমে ভরতি করা হয়েছে। ওদিকের খবর নেওয়ার জন্য ফোন বুথে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

যোগমায়া থতমত খেয়ে বললেন, 'কী হয়েছে ওঁর?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। চিন্তার কিছু নেই। এখন ভাল আছে মিমি। যা শুনলাম, ওকে ছেড়ে দেবে কাল-পরশুর মধ্যেই।'

যোগমায়া বললেন, 'খারাপ খবরটা শুনেই কি হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল ওঁর?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'তিথির খবরটা ও শুনেছে কি না আমি জানি না। আমি অফিস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আমি যখন সুমনের ফোনটা ধরি, তখন মিমি রান্নাঘরে ছিল। তবে মেয়ের যে কিছু একটা হয়েছে, সেটা বোধহয় মিমি আঁচ করেছে। হয়ত মায়েদের জন্মগত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে।'

সুমন বলল, 'নার্সিং হোমে তিথির মাকে দেখার জন্য আত্মীয়স্বজনরা রয়েছেন তো?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'মিমির ভাই দীপক আছে ওখানে। দীপক একটু ডাকাবুকো টাইপ। পার্টি-ফার্টি করে, পাড়ার চেনা-অচেনা যে কোনও লোকের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে বরাবর। এটা ওর একরকম নেশাও। নিজের দিদির বেলাতেও নাওয়া-খাওয়া ভুলে পড়ে রয়েছে ও। দীপক আছে বলেই অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি আমি।'

যোগমায়া বললেন, 'আপনি নিজেও এ সময় একটু সাবধানে থাকবেন। আপনার শরীর খারাপ হলে দিদির কী অবস্থা হবে ভেবেছেন!'

যোগমায়ার গলায় আন্তরিকতা ছিল। উৎপলেন্দুর ভেতরে কোথাও সেটা নাড়া দিয়ে গেল।

উৎপলেন্দু ভালো করে তাকালেন সুমনের মায়ের দিকে। বৈশিষ্ট্যহীন খয়াটে মুখ, তেল দেওয়া চুপচুপে টিকটিকির লেজের মতো চুল, আঁচলে হলুদের ছোপ। এমনকি আঙুলের নখেও হলদে দাগ। সুমনের মায়ের পাশে মনে মনে মিমিকে রাখলেন উৎপলেন্দু। মাঝেসাঝে কমলার মাকে সরিয়ে মিমি কিচেনে ঢোকে শখের রান্না করতে। হলুদের দাগছোপ যাতে নখে না লাগে, সে জন্য রান্নার পর লেবু দিয়ে ঘষে নেয় হাতের নখগুলো। সুমনের মায়ের হাতের নখগুলো দেখে মনে হল, ইনি এসব জানেন না।

একটা শ্বাস ফেললেন উৎপলেন্দু। 'আসলে সবই নিয়তি। নিয়তিকে খণ্ডায় কার সাধ্য!'

যোগমায়া বললেন, 'আমি তো রান্নাঘরে আসতেই বারণ করেছিলাম, কিন্তু তিথি শুনত না। রান্না করতে গিয়ে আগুনের ছ্যাঁকা খেয়েছে হাতে। তারপরেও কী উৎসাহ মেয়ের! একটা রান্নার বই কিনে এনেছিল। সেখান থেকে দেখে দেখে নতুন নতুন সব পদ রান্না করত।'

উৎপলেন্দু বললেন, 'মিমি কখনও মেয়েকে রান্নাঘরের ছায়া মাড়াতে দেয়নি। আমি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আমাদের একরত্তি মেয়েটা বিয়ের পর এসব শিখে নিল কেমন করে?'

যোগমায়া একটা শ্বাস ফেলে বললেন, 'দাদা, এটুকু খাবার কষ্ট করে খেয়ে নিন। দুপুরের খাবার তৈরি হতে হতে বেলা হয়ে যাবে।'

রুটি ছিঁড়লেন উৎপলেন্দু, সবজি মাখাচ্ছেন রুটিতে। ভেতরের উঠোন থেকে একটা ঝটাপটির আওয়াজ এল। উঠোনের দিক থেকে কেউ সুমনকে উঁচু গলায় ডাকল। যোগমায়ার উত্তেজিত গলাও শোনা গেল যেন।

শব্দের উৎস ধরে ভেতরের উঠোনে এল সুমন। পেছন পেছন এলেন উৎপলেন্দু।

উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না। হাঁটু পর্যন্ত গোটানো প্যান্ট আর একটা ময়লা গেঞ্জি পরে আছে। একটুও মেদ নেই শরীরে, সাঁতারুদের মতো চেহারা। তার ঘামে ভেজা মুখে বীরের হাসি। এক হাতে একটা বিরাট গোখরো সাপের গলা। অন্য হাতে লেজ। প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা সাপটা তার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য ছটফট করছে।

সুমন বলল, 'কী রে ন্যাদন, তুই সাপটাকে পেলি কোথায়?'

ন্যাদন এক গাল হেসে বলল, 'ওই যে আসশ্যাওড়ার ঝোপের ওদিকটায় একটা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ছিল গোখুরটা। শেকড়ের গন্ধে যে মুখ বার করেছে, অমনি ব্যাটাকে খপ করে ধরে ফেলেছি।'

কথা বলতে বলতেই ঝুড়িটা বার করে তার ভেতর সাপটাকে সাবধানে ঢুকিয়ে ঝপ করে ঝুড়ির মুখটা বন্ধ করে দিল ন্যাদন।

উৎপলেন্দু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এত সহজে সাপটাকে ধরলে কী করে?'

ন্যাদন বলল, 'এই সাপটার একটা চোখ জখম হয়েছে, সে জন্য ওটার নড়াচড়া ঠিক ছিল না। সে জন্য ধরতে কষ্ট করতে হয়নি। সুমনদা, আমি তবে এটাকে নিয়ে যাই?'

সুমন বলল, 'এটা নিয়ে কী করবি তুই?'

ন্যাদন চোখ গোল গোল করে বলল, 'তুমি শোনোনি? বিহার থেকে আদিবাসী বেদেনিরা এসে ঘাঁটি গেড়েছে শিমুলতলায়। ভরা পূর্ণিমায় সদ্য ডিম পাড়া কেউটে ধরতে এসেছে ওরা। বাজারে এসব কেউটের চাহিদা সাংঘাতিক। উত্তরবঙ্গ থেকে সাপ ধরে নেপাল আর ভুটানে অনেক দামে পাচার করছে ওরা। আমি সে দিন গেছিলাম ওদের সঙ্গে কথা বলতে। যদি কিছু ধান্দা করা যায়...।'

সুমন বলল, 'ওরা কী বলল?'

ন্যাদন বলল, 'লছমি নামে একজন বেদেনি আছে ওদের দলে। তার সঙ্গে ভাব জমালাম। লছমির মুখ থেকেই শুনলাম, কাউকে যদি বশ করতে হয়, তবে তাজা সাপের দাঁত শরীরে ধারণ করতে হয়। আবার বাতের ব্যথায় যদি কেউ কাহিল হয়ে পড়ে, তখন সাপের দেহ পুড়িয়ে ছাই গায়ে মাখলে বাতের ব্যথা কমে যায়। শুধু তা-ই নয়,

সাপের চোখ যদি তুমি ভিটেতে পুঁতে
দাও তাহলে বাড়ির যত অশান্তি সব দূর
হয়ে যাবে।'

সুমন ঘাড় নেড়ে বলল, 'আমি এসব বিশ্বাস করি না। কিন্তু কথা হল, এভাবে সাপ মারতে থাকলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাতে সব প্রাণীরই ক্ষতি হবে।'

ন্যাদন বলল, 'কী নষ্ট হবে বললে?'

সুমন বলল, 'তোকে ওসব বুঝতে হবে না। তুই সাপটাকে রেখে যা উঠোনে।'

ন্যাদন বিস্মিত হয়ে বলল, 'এত ঝামেলা করে সাপটাকে ধরলাম আর এখন বলছ ওটাকে রেখে যেতে?'

পকেট হাতড়ে দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট বার করল সুমন। টাকাটা ন্যাদনের হাতে গুঁজে দিল। বলল, 'হ্যাঁ বলছি। টাকা নিয়ে এবার বিদায় হ।'

বিস্মিত ন্যাদন টাকাটা প্যান্টের পকেটে ঢোকাল চুপ করে। কিছু না বলে হাতে ধরা বেতের ঝুড়িটা রেখেছে উঠোনে। পাশে পড়ে থাকা একটা বড় ইটের ডুকরো দিয়ে চাপা দিল ঝুড়ির মুখটা। তারপর চলে গেল ধীরে ধীরে।

উৎপলেন্দু বললেন, 'এই উঠোনে মনে হয় এই একটাই বিষাক্ত সাপ ছিল। আরও সাপ থাকলে ন্যাদন টের পেত ঠিক। তা-ই না?'

সুমন বলল, 'হুঁ, আমারও ধারণা সেরকমই। মনে হয় এই গোখরোটাই তিথিকে কামড়েছিল সে দিন রাতে।'

একটা অচেনা ক্রোধ ফণা তুলে উঠেছে উৎপলেন্দুর মস্তিষ্কে। দাঁতে দাঁত পিষে পরম আক্রোশে বললেন, 'সাপটাকে চোখের সামনে মাটিতে ফেলে থেঁতলে থেঁতলে মারতে পারলে মনের জ্বালা মেটে!'

সুমন শান্ত স্বরে এক পশলা বিষাদ মিশিয়ে বলল, 'মারলে তো মারাই যায়। কিন্তু লাভ কী? তিথিকে কি আর ফিরে পাওয়াবে সাপটাকে মারলে?'

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনায়, শারদীয় শুভেচ্ছা জানায়

আসছে পুজোর দিনগুলি আপনাদের ভরে উঠুক আনন্দে

রুমা চট্টোপাধ্যায়
উপ পৌরপ্রধান

আশিস চন্দ্র দত্ত
পৌরপ্রধান

আলিপুরদুয়ার পৌরসভা

ভানুনগরে নেপালি ভোজে

জলপাইগুড়ি শহরের ভানুনগর মূলত নেপালি ভাষাভাষীদের এলাকা। এই শরতের রোদ-বৃষ্টি জড়ানো একদিন 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে আমরা গিয়েছিলাম সেই নগরে খাঁটি নেপালি রান্নার স্বর্গীয় আস্বাদ অনুভব করতে। তিস্তার অনতিদূরে অবস্থিত ওই নগরের শোভা প্রধানের বাড়ির লোকজন তখন অপেক্ষা করছে রান্নার উপকরণ সাজিয়ে। জানলাম, আমাদের জন্য তৈরি হবে সিদ্রার চাটনি, মটর-মুলোর আচার, গুন্দ্রুক, সেল রুটি আর কিনেমা। আমরাও চটপট তৈরি হয়ে নিলাম রান্নার কলাকৌশল শিখে নিয়ে আপনাদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য। সে ভোজের যে কী সুখ, তা জানবেন যদি রেসিপিগুলো পড়ে খাবারগুলোকে বানিয়ে একবার চেখে দেখেন।

সেল রুটি

উপকরণ— চালের গুঁড়ো, ময়দা, আটা, খাবার সোডা, নারকেল কোরা, কিশমিশ, ছোট এলাচ, পাকা চাঁপা কলা, চিনি।
পদ্ধতি— সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে জল দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। তারপর কড়াইয়ে ডুবো তেলে মিশ্রণটিকে হাতে জিলিপির মতো বানিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তৈরি সুস্বাদু সেল রুটি।

গুন্দ্রুক

উপকরণ— রাই শাক (লেটুস শাক), টম্যাটো, রশুন, পেঁয়াজ।
পদ্ধতি— রাই শাকগুলিকে ভালমতো ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে বড় কৌটোয় তিন থেকে চার দিন রাখতে হবে। তারপর রোদে দু'-তিন দিন শুকোতে হবে। তারপর কড়াইতে পেঁয়াজ-রশুন-লংকা ভেজে নিতে হবে। লাল হয়ে গেলেই টম্যাটো দিয়ে একটু ভেজে নিয়ে পরিমাণমতো জল দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে জলটা ফুটে গেলে গুন্দ্রুকটা দিয়ে দিতে হবে। তারপর ফুটে গেলেই নামিয়ে নিতে হবে।

কিনেমা

উপকরণ— পেঁয়াজ, টম্যাটো, ভাটমাস (এক ধরনের ডাল), কাঁচালংকা।
পদ্ধতি— ভাটমাস সেদ্ধ করে রাখতে হবে অথবা বাজারেও সেদ্ধ করা ভাটমাস কিনতে পাওয়া যায়। তারপর সেটি পেঁয়াজের সঙ্গে কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে ভাজতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে সেটির মধ্যে টম্যাটো, পেঁয়াজ, কাঁচালংকা দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

সিদ্রার চাটনি

উপকরণ— টম্যাটো, রশুন, কাঁচালংকা, পুঁটি-শুঁটকি মাছ।
পদ্ধতি— শুঁটকি মাছ আর টম্যাটো পুড়িয়ে নিতে হবে প্রথমে। তারপর বেটে কাঁচা রশুন, লংকা ও পরিমাণমতো নুন দিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে সিদ্রার চাটনি।

মটর-মুলোর আচার

উপকরণ— মটর, মুলো, পোস্ত, পেঁয়াজ, লংকা, টম্যাটো, আদা।
পদ্ধতি— প্রথমে মটরগুলি ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর কড়াইয়ে পেঁয়াজ ভেজে কাঁচালংকা কুচি দিয়ে মটর-মুলো (কুচি করে কাটা) ও আদা দিতে হবে। নামাক্ষ্নোর আগে পোস্ত বাটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই তৈরি হয়ে যাবে মটর-মুলোর আচার।

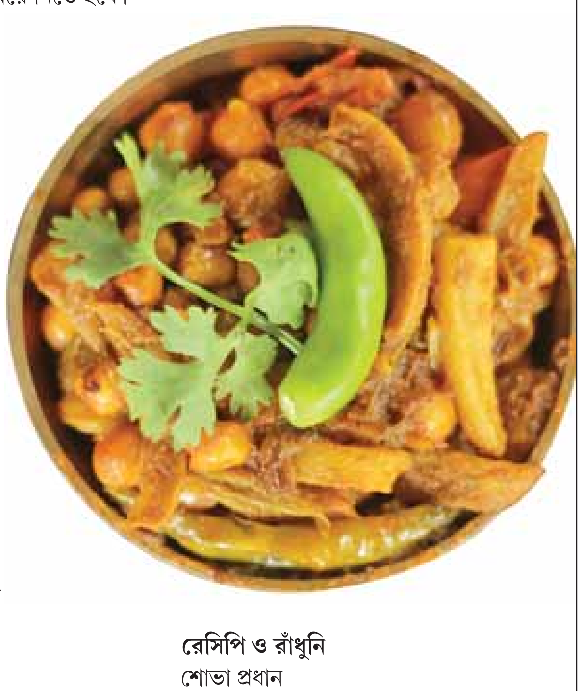

রেসিপি ও রাঁধুনি
শোভা প্রধান

বিশেষ সহযোগিতা
নিঝুম ঠাকুর, উইনি রায়

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি- ০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস- ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক- ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস- ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর- ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
মালবাজার
ভবতোষ রায়চৌধুরী- ৯৮০০৩০৬৫২৭
চালসা
দিলীপ সরকার- ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল- ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা- ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায়- ৯৯৩২৫৪৬৩২০
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট- ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে- ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল- ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড়- ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস- ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা- ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা- ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি- ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি- ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার- ৯৪৩৪৪২৩৫২২

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

উৎসবের ডুয়ার্সে চিলাপাতা গ্রিন

এ সময়টাই বোধহয় সুন্দরী ডুয়ার্স তার রূপের আগল খুলে দেয়। এতদিন শুনে আসছিলাম, এবার তা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ মিলল। ছোটখাট একটা দায়িত্ব সামলানোর জন্য হঠাৎ করেই ডুয়ার্স দেখবার একটা অযাচিত সুযোগ মিললেও খুব যে উল্লসিত বোধ করছিলাম তা নয়। তার মূল কারণই হল এই ক'টা মাস জঙ্গলগুলি যে বন্ধ থাকে সেটা মাথায় ছিলই। আর এটাও বলাই বাহুল্য যে জঙ্গল বাদ দিয়ে ডুয়ার্স ভাবা যায় না।

কিন্তু ডুয়ার্সে এসে আমার এতদিনের সযত্নে লালিত ধারণা প্রথম আঘাত পেল যখন এখানে এক বন্ধু সান্ধ্য আড্ডায় এক অভাবনীয় প্রস্তাব রাখলেন— দাদা যে কাম নিয়া আইছেন এহন ধরেন গিয়া আরও তিন চাইর দিন তো লাগবই, তা এই শনি-রবি করবেনটা কী? চলেন জঙ্গলে একটা ভাল রিসর্টে ঘুইরা আসি। আমি তো শুনে অবাক হয়ে ওনার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার পরের কথোপকথনে ছবিটা পরিষ্কার হল— প্রথমত, জঙ্গলে ছুটি কাটানো মানে তো যে সব সময় জঙ্গলের ভেতরের কোনও বনবাংলোয় থাকতে হবে বা বাঘভালুকের দর্শন মিলতেই হবে তার কোনও মানে নেই। জঙ্গল লাগোয়া জমিতে আইন মেনে যেসব ইকো রিসর্ট গড়ে উঠেছে সেগুলিতে দুর্দান্ত ছুটি কাটানো যায় এবং তা বছরের যে কোনও সময়েই হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ডুয়ার্সের

যেসব বন্যপ্রান্তে প্রাকৃতিক শোভা এসময় অতুলনীয় এবং যেখানে রুচিসম্পন্ন থাকা-খাওয়ার আয়োজন থাকে তার মধ্যে উল্লেখ করবার মতো জায়গা হল চিলাপাতা। বলা নিস্প্রয়োজন আমাদের উইকএন্ড গন্তব্য এবার চিলাপাতা।

এর আগে এই চিলাপাতা জঙ্গলের ভেতরের রাস্তা দিয়ে কোচবিহার গিয়েছি বারকয়েক, শুনেছি এই প্রাচীন অরণ্যের ইতিহাসকথা। রাত্রিবাস হয়নি কারণ থাকবার ব্যবস্থা তখন সেরকম ভাল ছিল না। এবার আমাদের ঠিকানা রিসর্ট চিলাপাতা গ্রিন। জঙ্গলের সীমানা বরাবর ধুলোকাদামাখা

পাথুরে পথ এখন মসৃণ পিচঢালা রাস্তা। দূর থেকে রিসর্টের দেখা মিলতেই মনে পুলক জাগল। লম্বা লম্বা ঠ্যাংওয়ালা সারিবদ্ধ সুদৃশ্য কটেজগুলি ঘাসজমি-গাছপালার ওপর দিয়ে মাথা তুলে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। গেটেই মিলল সাদর অভ্যর্থনা। আর সিঁড়ি বেয়ে কটেজে ঢুকতেই মন ভরে গেল। প্রশস্ত এসি ঘরের চারদিকেই বলা চলে খোলা, ভারি পর্দা সরিয়ে কাচের ওপারে অবারিত সবুজ। ঘরের একদিকে বিছানা, অন্যদিকে

সোফা, একদিকে পেল্লায় টিভি তো অন্যদিকে বাথরুম, বেসিন এবং ড্রেসিং স্পেস। নিরিবিলি ছুটি কাটাবার যাবতীয় আয়োজন হাতের মুঠোয়।

ব্যালকনিতে আসতেই মনে ভরে গেল। দুচোখ যতদূর যায় ঘন সবুজের একাধিপত্য। মাথার ওপরে নীল আকাশে মেঘেদের অবাধ বিচরণ।

রেস্তোরাঁয় বসে তোর্সা নদীর ছোট ছোট মাছের অপূর্ব স্বাদ নিতে নিতে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে সেরে নিলাম এলাকা সম্পর্কে প্রাথমিক ওয়াকিবহাল হওয়ার পালা। তিনি জানালেন এখানে থেকেই ঘুরে নেওয়া যায় গোটা ডুয়ার্স।

প্রথম দিন চিলাপাতার জঙ্গল ঘুরে দ্বিতীয় দিন যাওয়া যেতে পারে জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক, টোটোপাড়া এবং সেই সঙ্গে বক্সা-জয়ন্তী। আরও একটা দিন পাওয়া গেলে ফুন্টশোলিং কিংবা রসিকবিল আর তার সঙ্গে কোচবিহার। চতুর্থ দিন অবশ্যই গরুমারা, চাপড়ামারি, ঝালং-বিন্দু কিংবা সুনতালেখোলা। এবার পুজোয় সপরিবারে আসছি ডুয়ার্স।

তীর্থঙ্কর পাল

ভালবাসা থেকেই শুরু

জঙ্গল বড্ড প্রিয় ছিল সেই ছেলেবেলা থেকেই। ডুয়ার্সের মাটিতে বড় হওয়ার মধ্য দিয়েই সেই ভালবাসা আরও যেন তীব্র হল। সেই অরণ্যপ্রেম অন্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত হোক এটাই সবসময় চাইতেন মনে মনে। আর সেই আকাঙ্খা পূরণ করবার জন্যই জঙ্গলের গা ঘেঁষে এরকম চমৎকার একখানা রিসর্ট বানিয়ে ফেলেছেন সুব্রত পোদ্দার। কোচবিহারের একজন সফল উদ্যোগপতি সেইসব গল্পই শোনালেন নিজের অফিসে বসে। আফ্রিকা বেড়াতে গিয়েই প্রথম জঙ্গলে ভাল একটি রিসর্ট তৈরির ভাবনা আসে সুব্রতবাবুর। তার সঙ্গে জঙ্গল প্রেম তো ছিলই। তাঁর মতে ডুয়ার্সের রূপ ঠিকঠাক উপভোগ করতে হলে চাই প্রকৃতির মধ্যেই ভাল থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত। তাঁর সাধের রিসর্ট চিলাপাতা গ্রিন অতিথিদের সেইসব চাহিদা পূরণ করে বলেই জানালেন। সেই সঙ্গে সামনের উৎসব মরসুমে এই চিলাপাতা গ্রিন থেকেই ডুয়ার্স ঘুরে দেখার জন্য সবাইকে আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন তিনি।

নিজস্ব প্রতিবেদন

এক সময় বাউন্ডুলে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অতি প্রিয় জঙ্গল ছিল চিলাপাতা। যাঁরা বিশুদ্ধ অরণ্য ভালবাসেন তাঁদের জন্য এই জঙ্গল আদর্শ। খোলা জিপে, পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ঘুরে দেখা যায় চিলাপাতার বন্য সৌন্দর্য। চলার পথে যে কোনও মুহূর্তে রোমাঞ্চ জাগিয়ে আপনার সামনে হাজির হতে পারেন যে কোনও বন্য প্রাণ। এছাড়াও রয়েছে রাভা বস্তি, তোর্ষার চরে সিসি লাইনস, মেন্দাবাড়ি এবং কাছে পিঠেই জলদাপাড়া, বক্সা এবং ভুটান। চিলাপাতার জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই চলে গিয়েছে পিচ ঢালা পথ।

Lets start our Dooars Trip from Chilapata

Jaldapara National Park | Totopara | Buxa & Jainti | Phuntsholling | Rasik Bil | Coochbehar Palace
Gorumara | Chapramari | Jhalang-Bindu-Paren | Samsing-Suntalekhola

RESORT
CHILAPATA (GREEN)

LODGING | FOODING | PACKAGE TOUR

• Comfortable Rooms (AC/Non-AC) • Running Hot & Cold Water
• Multi Cuisine AC Restaurant for 40 Heads • Conference Hall for 80 Heads

Resort Address:
Uttar Chakowakheti, Chilapata, Dist. Alipurduar
Phone: 9679602505, 8116319879, 03582-222689
Mail: resort_chilapatagreen@rediffmail.com
www.resortchilapatagreen.com

পুজোয় সুস্থ থাকার কিছু ডাক্তারি পরামর্শ

ভোরের ঠান্ডা থেকে সাবধান

শরৎ মানে ঠান্ডা-গরমের খেলা। আপনারা বুঝতেই পারবেন না কখন কী আবহাওয়া থাকে। কখনও দমকা হাওয়া, কখনও প্রখর রোদ, কখনও বৃষ্টি। এই সবকিছু মিলিয়ে শরৎকাল বেড়ে ওঠে। এ সময় কীভাবে ভাল থাকবেন তা পুরোপুরি নিজেদের উপরে। বাইরের আবহাওয়াকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ঘরের মধ্যেকার আবহাওয়া। খুব রোদে অবশ্যই পাখার হাওয়া আরামদায়ক, হালকা বাতাস বইলে কিন্তু নিয়ন্ত্রণে থাকবেন। যখন-তখন স্নানঘরে গিয়ে গা ভেজাবেন না, এতে সর্দি বসে যেতে পারে। ভোরের দিকে ঠান্ডায় শিহরন জাগে সারা শরীরে। সে সময় পাখা না চালানোই ভাল অথবা চাদর জড়িয়ে নেবেন। সন্ধের দিকে হালকা ঠান্ডা বাতাস বইলে ফুলহাতা জামা পরাটাই ভাল, আর কান ও গলার আবরণ কিন্তু অনেকটা ভাল থাকতে সাহায্য করে।

ডাঃ দেবাশিস হালদার, কোচবিহার

শরৎকালীন আমাশা ভোগাতে পারে

শরৎকালে যেমন চারদিকে পুজো পুজো গন্ধ, শরৎকাল তেমনি ভাল থাকারও একটা গণ্ডি। সেই গণ্ডি পেরলেই শারীরিক কিছু সমস্যা চলে আসে, যা সহজে নিরাময় হয় না। আসলে সকলের শরীর তো সমান না, তাই আজকাল কখন কার কী হয় তা বলা মুশকিল। এ সময় নিজেকেই নিজের ভালটা বুঝতে হবে— আর অবশ্যই ডাক্তারি পরামর্শে। শরৎকালে মুখ্য সমস্যা যেটা, সেটি হল সবার ঘরে সর্দিকাশি। এছাড়া এই সময় একটি রোগ খুব মারাত্মক আকার ধারণ করে তা হল শরৎকালীন আমাশা। কারণ, এই পুজো মাসে রাস্তার তেলেভাজা, খাবার, ধুলোবালিকে তোয়াক্কা না করেই গোগ্রাসে খাওয়া— এসবই আমাশার কারণ। আর আমাশা হলেই সবার আগে যা করতে হবে তা হল ডাক্তারি পরামর্শ। দোকান থেকে ২টো-৫টা ওষুধ কিনে খেলেই যে নিরাময় হয় না, তা সকলকে বুঝতে হবে। সব থেকে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল, জল বেশি করে খেতে হবে। তাতে শরীর, পেট দুটোই ভাল থাকবে।

ডাঃ পার্থ সরকার, জলপাইগুড়ি

কোল্ড ড্রিঙ্ক-আইসক্রিম থেকে দূরে থাকুন

শরৎ মানে সবার কাছে আনন্দদায়ক একটা সময়, তেমনিই এই মনোরম দিনগুলির মধ্যে লুকিয়ে থাকে নানান অসুখবিসুখ। ভাল থাকার উপায় একটাই— বুঝে-শুনে দিনযাপন। এই সময় সবার ঘরে ঘরে একটাই রোগ— 'ভাইরাল ফিভার' এবং এর সঙ্গী হিসেবে সর্দিকাশি, গলাব্যথা তো আছেই। আর এর থেকে মুক্তি পেতে আমাদের অনেক পানীয় ও খাবার থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন— কোল্ড ড্রিঙ্কস, আইসক্রিম ইত্যাদি ইত্যাদি। গলাব্যথা হলে গার্গল করতে হবে। যাদের হাঁপানি রোগ রয়েছে, তাঁরা বেশি করে সতর্ক থাকবেন এই সময়টা। ফ্রিজের জিনিস না খাওয়াই ভাল অথবা যতটা পারেন তার থেকে বিরত থাকবেন।

ডাঃ সৌম্যজিৎ দত্ত, আলিপুরদুয়ার

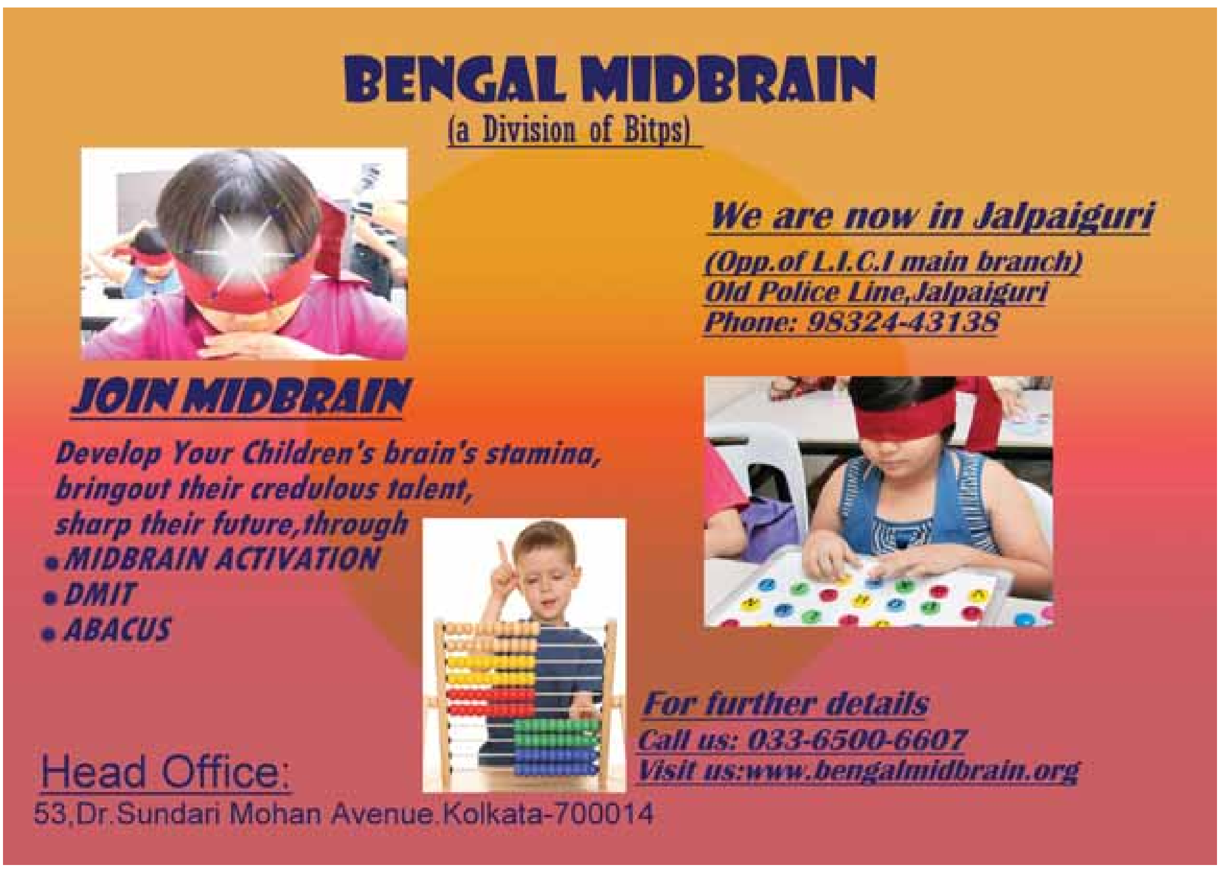

পুজোর আগে ত্বক ও চুলের পরিচর্যা

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান মালা দাস

সকালে জানলা খুললেই ঝলমলে রোদ ও আকাশে পেঁজা তুলোর ভেলা দেখে মনটা মায়ের আগমনী গান গেয়ে ওঠে। মাকে আগমন জানাতে চারদিকে সাজ সাজ রব। কুশ ফুল দিয়ে ধরিত্রীও নিজেকে সাজিয়েছেন।

মাত্র কয়েকটা দিন, সকালে পুজোর পাঁচ দিনের পোশাক-আশাক কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কোন পোশাকে কোনদিন সাজবেন। পুজো মানেই আনন্দ আর খুশির উৎসব— মা দুর্গা সবার মন জুড়ে আনন্দ এনে দেন। পুজোতে সুন্দর করে সাজতে মন তো চাইবেই।

তবে সাজগোজ মানে শুধু পোশাক, জুতো, ব্যাগ নয়, পোশাকের সঙ্গে চাই নানারকম হেয়ারস্টাইল ও মেকআপ পুজোর আগে কীভাবে নিজেকে তৈরি করবেন? সবার আগে ত্বকের যত্ন নিতে হবে, না হলে মেকআপ করলে জেল্লা পাওয়া মুশকিল। তাই রোজ নিয়মিত ক্লিনজিং, টোনিং, ময়েশ্চারাইজিং করুন। ঘরে বাইরে কাজ করতে হয়, তাই ত্বকের প্রতি যত্নবান হতে হবে। মাঝেমধ্যে ত্বক অনুযায়ী ফেস প্যাক লাগাবেন। সানস্ক্রিন লাগাতে ভুলবেন না। পুজোর দিন সকালে ঝকঝকে ত্বকের সঙ্গে নতুন পোশাকে আপনি হয়ে উঠুন অপরূপা। তবে রাতে মেকআপটা গর্জাস করতে পারেন এবং চোখের মেকআপের উপর জোর দিন। ওয়াক্সিং, ম্যানিকিওর, পেডিকিওর করুন এক সপ্তাহ আগে।

পুজোর বিশেষ স্টাইল হল হেয়ারস্টাইল। আপনার মেকওভারের বিশেষ পদক্ষেপ। আপনি হেয়ার স্পা করাতে পারেন। চুলের ধরন ও আপনার

চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে হেয়ারকাট করুন। লেয়ারকাট, ফেদারকাট, বব হেয়ারকাট ৬০, ট্রেন্ডি হেয়ারস্টাইল, ট্রেন্ডি শর্ট ক্রপড, কুল নিউ শর্ট হেয়ারকাট ইত্যাদি। এ ছাড়া নানা রকম হেয়ার কালার করতে পারেন। তবে এগুলো করবার আগে কোনও বিউটি থেরাপিস্টের পরামর্শ নিন। চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষ হেয়ারস্টাইল করতে পারেন, যেমন— স্ট্রেটনিং, আয়রনিং টং, ক্রিম্পিং ও পার্মিং দিয়েও আপনার পুজোর সাজে আমূল পরিবর্তন করে নিজেকে করে তুলতে পারেন অপরূপা। যদি সম্ভব হয় তবে বডি স্পা করে সর্ব অঙ্গের পরিবর্তন আনতে পারেন। পোশাক-আশাকের সঙ্গে তাই হেয়ারস্টাইল ও মেকআপের সঠিক সমন্বয় যেন থাকে, তার দিকে নজর দিতে হবে। তবেই আপনি হয়ে উঠবেন অপরূপা।

পুজোর চার-পাঁচদিন ঠাকুর দেখা, প্যান্ডেল হপিং, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা থাকবে— তাই চাই আলাদা আলাদা সাজ। মনে রাখবেন আপনার সাজগোজ আপনার রুচির প্রতিফলন। তা হলে কোমর বেঁধে নেমে পড়ুন নিজের গ্রুমিং-এ। আর আপনি অপরূপা হয়ে মাকে জানান আগমন।

রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেল আইডি-তে।

মালা দাস, অঙ্গনা বিউটি ক্লিনিক, শিলিগুড়ি

AANGONAA

Ladies Beauty Clinic

Shahnaz Herbal • Aroma Therapy
Lotus Professional • Lotus Ultimo
Cheryl's Cosmeceuticals (Hair & Skin)
Loreal Professional
Schwarzkopf Professional

7 Bagha Jatin Road, Siliguri 734001 **Satyajit Sarani, Shivmandir**

Call : 9434176725, 9434034333

EKHON DUARS, Vol-2, Issue-7, WBBEN/2014/56733, Rs. 20 Only

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.